ভক্ত কবীর

ভক্ত কবীর

অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

নিবেদন

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবীর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি হিন্দীভাষী ছিলেন বলে হিন্দীভাষীদের মধ্যে তাঁর পরিচয় অনেকটা ব্যাপক।

কিন্তু বাঙ্গলাভাষীদের কাছে কবীর তেমন পরিচিত নন। বাঙ্গলা ভাষায় কবীর সম্বন্ধে আলোচনা বেশী হয়নি। আমরা যদ্দূর জানি ১২৯৭ সালে শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম 'কবির' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে "হিন্দী ভাষায় মূল, বাঙ্গলা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহ" ৫৭০টি দোহা ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় কবীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি।

তারপর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় ৪ খণ্ডে 'কবীর' প্রকাশ করেন। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। এই গ্রন্থে আছে বাঙ্গলা অনুবাদসহ ৩৪৩টি পদ। আচার্য সেন শাস্ত্রী মহাশয়ও কবীর সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেন নি।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আণ্ডারহিল সাহেবের সহায়তায় কবীরের একশ'টি পদের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (One Hundred Poems of Kabir—translated by Rabindranath Togore assisted by Evelyn Underhill)। এর পর থেকেই ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট হ'ল কবীরদাসের প্রতি। অবশ্যি হিন্দী ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা আগেও হয়েছিল। কিন্তু এবার ইংরেজি-জানা হিন্দীভাষী মনিষীরাও কবীরদাসকে নিয়ে গবেষণা-আলোচনা স্থুরু করলেন।

শান্তিনিকেতন হিন্দী ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের বর্তমান কর্তা সুহৃদ্বর ডক্টর হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী এই সব মনিষীদের অন্যতম। পণ্ডিতজী হিন্দী জগতে কবীর সম্বন্ধে অন্যতম প্রামাণিক পণ্ডিত ব'লে পরিচিত। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় কবীর নিয়ে বাঙ্গলায় কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করবার জন্য বর্তমান

লেখকের এই প্রয়াস। পণ্ডিতজীর সহায়তা না পেলে কবীর-দাসের দুরূহ পদগুলি অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না। কাজেই এই গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব অনেকখানি পণ্ডিতজীরই। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই বন্ধু-ঋণ শোধ করা যায় না।

যাঁর বিশেষ আগ্রহে ও উদ্যোগে ভক্ত কবীর প্রকাশিত হ'তে পারল তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তিনি হ'লেন শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও ভারত সরকারের বহির্বিভাগ-দপ্তরের বর্তমান উপমন্ত্রী অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ মহাশয়।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির সত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয়ের প্রতি। প্রহ্লাদবাবু দুঃসাহসী মানুষ। সেইজন্য, গল্প নয়, উপন্যাস নয়, এমন কি রম্য রচনাও নয়, শুধু ভক্ত কবীরের মত একজন সন্ত সম্বন্ধে লেখা বইও তিনি প্রকাশ করতে পারলেন।

এই বই লেখার কাজে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি রইল। বিশেষ করে মনে পড়ছে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের কথা। গোসাঁইজী আলোচনা করে, পরামর্শ দিয়ে, নানাভাবে আমাদের সব সময়েই উৎসাহিত করেছেন।

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নবনীতা মজুমদার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

আমাদের মত আনাড়ীর উপর ছিল প্রুফ দেখার ভার। ফলে, আন্তরিক চেষ্টাযত্ন সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে তার জন্য মাপ চাইছি।

আর একটিমাত্র কথা। কবীরদাসের পদে যেখানে অন্তস্থ ব (व) অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে আমরা বাঙ্গলায় 'ৱ' এই হরফটি ব্যবহার করেছি।

শান্তিনিকেতন
দীপান্বিতা, ১৩৬৯ } উপেন্দ্রকুমার দাস

ভক্ত কবীর

কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, সন্তদের মধ্যে মণ্ডলেশ্বর-স্বরূপ। কবীরদাসের পরবর্ত্তী উত্তর-ভারতের সকল সংস্কারমুক্ত ভক্তসম্প্রদায়ই কোনো না কোনো ভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই সব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষাৎভাবে কবীরদাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত।

হিন্দীভাষী জনসাধারণের উপর কবীরদাসের প্রভাব অসাধারণ। একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাস ব্যতীত এদিক দিয়ে আর কারুর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। হিন্দীতে একটী কথা আছে—

ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড।

দ্রাবিড় দেশে উৎপত্তি হ'ল ভক্তির। তাকে নিয়ে এলেন রামানন্দ, আর কবীরদাস প্রকাশ করে দিলেন সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে, (অর্থাৎ সারা দুনিয়ায়)। এর থেকেই বোঝা যায়, হিন্দীভাষী জনসাধারণের কাছে ভক্তির ক্ষেত্রে কবীরদাসের স্থান কত উচ্চে।

কবীরদাসের আবির্ভাব-কাল সঠিক জানা যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে ইং ১৩৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে কবীরদাসের জন্ম হয়। কবীর কসৌটী গ্রন্থে আছে কবীরদাসের মৃত্যু হয় ১৫১৮ খৃঃ এবং তিনি ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন। সেই হিসাবে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম হয়।[১] কিন্তু অনেকে বিশেষ করে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এটী সত্য বলে মানেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের ইতিহাস-সম্মত জন্মকাল ইং ১৪৪০ সাল।[২] তবে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সাহেবদের এই মত স্বীকার করেন না। ১৩৯৮ খৃঃ কবীরদাসের জন্ম হয় এই মতটিই তাঁরা সত্য মনে করেন। ভারতব্রাহ্মণে আছে, কবীরদাসের জন্ম হয় ১৩৯৮ খৃঃ ও ১৪৯৮ খৃঃ তিনি দেহরক্ষা করেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন ডাঃ ফ্যুরের উত্তর-পশ্চিম

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬২-৬৩

২ Kabir and his Followers P. 27

প্রদেশ ও অযোধ্যার শিলালেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করে ভারত-ব্রাহ্মণের মতই সমর্থন করেন।[১]

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে। সাধারণ মত —এক গরীব মুসলমান জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নীরু আর মায়ের নাম নীমা।

কিন্তু কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যেরা এই মত মানেন না। কবীরের মত এত বড় মহাপুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জোলার ঘরে জন্মাবেন এ কথা তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের জন্ম হয় অলৌকিক উপায়ে। তিনি গুরু রামানন্দের জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যার সন্তান। তিনি জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন এই মাত্র। নীরু আর নীমা তাঁর আসল পিতামাতা নয়। কবীরদাস তাদের কুড়ানো ছেলে। তাঁকে তারা শুধু পালন করেছিল।

কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনী এই ঃ[২]

গুরু রামানন্দের একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য একদিন তাঁর বালবিধবা কন্যাকে নিয়ে স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করতে যান। মেয়েটি প্রণাম করলে রামানন্দ তাকে সুপুত্র লাভ কর বলে আশীর্ব্বাদ করেন। মেয়েটি যে বিধবা তা তিনি জানতেন না। এখন উপায়? সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ত ব্যর্থ হতে পারে না। বাপ ও মেয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন গুরুর পায়ে। গুরু বললেন—আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হতে পারে না। তবে ভয় নেই তোমাদের। আমার বরে পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীতই এই কন্যা পুত্রলাভ করবে। জগতের পরিত্রাণের নিমিত্ত এর গর্ভে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। অলৌকিক হবে এর সন্তানের জন্ম। সে মায়ের হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে মেয়েটি লোকনিন্দার ভয়ে তাকে চুপি চুপি লহর তালাও-এ একটি পদ্মফুলের উপর রেখে দিয়ে আসে।

ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পায় জোলা নীরু আর তার স্ত্রী নীমা। এমন সুন্দর ছেলে, না জানি কোন্ অভাগিনী ফেলে দিয়ে গিয়েছে! ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ-সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে অনেক পরামর্শ

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৩

২ Kabir and his Followers P. 10

হ'ল। তাদের নিজেদের কোন ছেলে ছিল না। তাই শেষ পর্য্যন্ত তারা স্থির করল ঈশ্বরই ছেলেটিকে তাদের দিয়েছেন। তারা ছেলেটিকে নিয়ে এসে নিজের সন্তান বলেই পালন করতে লাগল।

আর একটি গল্প।[১] একদিন গুরু রামানন্দের শিষ্য গোঁসাই অষ্টানন্দ দেখতে পেলেন স্বর্গ থেকে একটি অদ্ভুত আলো নেবে এল লহর তালাও-এ। সেই আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল। তিনি এই অদ্ভুত আলোর কথা স্বীয় গুরুদেবকে জানালেন। রামানন্দ বললেন—ঐ আলো সাধারণ আলো নয়। একজন মহাপুরুষ ঐ আলোর আকারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'লেন। লহর তালাও-এ একটি পদ্মের উপর শিশু হয়ে আছেন তিনি। সময়ে এই শিশুর আলোয় সারা দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

গল্পের এর পরের অংশ আগের গল্পের মতই। শুধু একটু পার্থক্য আছে। নীমা আর নীরু যখন ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ সম্বন্ধে পরামর্শ করছিল, তখন ছেলেটি নিজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দেয়। সে নীমাকে বলে, পূর্ব্বজন্মে তুমি বিশেষ সেবা করেছিলে, তাই এবার আমি তোমাদের ঘরে ছেলে হয়ে এসেছি। আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করে দেব।

ক্রমে ছেলেটি বড় হ'তে লাগল। সময় এল তার নামকরণের। নীরু তখন একজন কাজিকে ডেকে নিয়ে এল নাম ঠিক করে দেবার জন্য। কাজি নাম বাছবার জন্য খুললেন কোরাণ। যে পাতা বেরুল তাতে এই ক'টি নাম পাওয়া গেল—কবীর, আকবর, কিবরা, কিবরিয়া। সব ক'টিরই অর্থ এক; একই মূল তাদের, যার অর্থ 'মহৎ'। শব্দগুলি খোদার সম্পর্কে প্রযোজ্য। কাজি ত অবাক্। বই বন্ধ করে আবার খুললেন, এবারও সেই নাম ক'টাই বেরুল। কাজির বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি বার-বার চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন কিন্তু সেই ক'টি নাম ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। ভয় পেয়ে তিনি চলে গেলেন। এই অদ্ভুত খবর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুনে অন্যান্য কাজিরাও এলেন নীরুর বাড়ীতে। কিন্তু তাঁরাও কোরাণ থেকে সেই চারটে নাম ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারলেন না। তখন কাজিরা নীরুকে বললেন, এ অতি অলক্ষুণে ছেলে। একে মেরে ফেল; নৈলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে।

১ Kabir and his Followers P. 9

তাঁদের কথায় নীরু ছেলেটির বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাতে শিশুর কিছুই হল না; এক ফোঁটা রক্ত পর্য্যন্ত বেরুল না। এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে নীরু অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তখন শিশুটি একটি দোহা বললে। তার মানে হল—'রক্ত-মাংসে গড়া নয় আমার দেহ, এ বিশুদ্ধ আলো।' তখন ওরা এই অদ্ভুত শিশুর নাম রাখল কবীর।

কবীরদাসের সারা জীবনকে নিয়েই এমনি ধরণের বহু অলৌকিক কাহিনী জমে উঠেছে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। এটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়। সকল দেশেই অসাধারণ মানুষদের নিয়ে বিশেষ করে ধর্মগুরুদের নিয়ে তাঁদের অনুগামী বা ভক্তরা নানা অলৌকিক কাহিনী রচনা করে থাকে। এই সব কাহিনী থেকে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভবই বলা চলে। কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়েছিল কি না নিশ্চয় করে বলা না গেলেও তিনি যে জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন আর তার নামটাও যে মুসলমানী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কাজেই কবীরদাসের পরিচয় পেতে হ'লে, তাঁর বাণী বুঝতে হ'লে আগে এই জোলা জাতির একটি মোটামুটি পরিচয় লওয়া আবশ্যক। কেন না, এঁদের ঐতিহ্য, এঁদের মধ্যে প্রচলিত মত, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বভাবতই কবীরদাসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলা জোলা শব্দের মূল ফার্সী জোলাহা শব্দ। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, জোলাহা শব্দটি ফার্সী হলেও সস্কৃত পুরাণে জোলা জাতির উৎপত্তির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।[১] ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) পিতা আর কুবিন্দ (শিল্পকার জাতিবিশেষ) মাতা থেকে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়। পৌরাণিক বিবরণগুলির সঙ্গে প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের মিল পাওয়া যায় না। জোলা জাতির উৎপত্তির এই পৌরাণিক বিবরণও ইতিহাসের দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য মনে হয় না, দ্বিবেদীজীও এই পৌরাণিক মত সমর্থনযোগ্য মনে করেন না।[২]

---

১ কবীর পৃঃ ১

২ কবীর পৃঃ ২

জোলারা মুসলমান। তাঁত বোনা এঁদের ব্যবসায়। এঁরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে[১] দেখিয়েছেন যে, জোলারা মুসলমান হ'লেও অন্য মুসলমানের সঙ্গে এঁদের মৌলিক ভেদ আছে। এঁরা যেখানে থাকেন এক চাপে থাকেন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার আর বাঙ্গলাদেশেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। দ্বিবেদীজী বলেন[২] উত্তর-পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গলার ঢাকা ডিভিসন পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মধ্যযুগে এই নাথপন্থী যোগীদেরই অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এঁরাই জোলা।[৩]

নাথধর্ম পৌরাণিক হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্ম। নাথধর্মের সাধনা যোগ-মার্গের সাধনা। "নাথ-সিদ্ধাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল 'কায়া সাধনের' দ্বারা 'জীবন্মুক্তি' লাভ।"[৪] কায়া-সাধনই এই ধর্মের প্রধান কথা আর কায়া-সাধন করতে হ'লে প্রয়োজন হঠযোগের। এই জন্যই নাথপন্থীরা হঠযোগ সাধন করতেন। আর সেই কারণে তাঁদের বলা হ'ত যোগী। হিন্দু তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে নাথপন্থীদের সাধনার যথেষ্ট মিল থাকলেও নাথপন্থী যোগীরা হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র মান্‌তেন না। দীর্ঘকাল তাঁরা প্রবল হিন্দুধর্মের সমক্ষে নিজেদের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার মান্‌তেন না, "বর্ণাশ্রম মান্‌তেন না, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করতেন না;" তাঁদের মধ্যে নিরাকারভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

এই যোগী সম্প্রদায়কে হিন্দুরা অত্যন্ত হেয় মনে করতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

যোগীদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান হ'লেন না, তাঁরা ক্রমে হিন্দুধর্ম মেনে নিলেন এবং বিরাট হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। তবে বহু কাল পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বজায় ছিল।

যোগীরা একে ছিলেন সমাজের নিম্নস্তরে, তার উপর ছিলেন বড় গরীব। তাঁত বোনা ছিল তাঁদের জাত-ব্যবসায়। মুসলমান হওয়ার পরও তাঁদের

---

১ কবীর পৃঃ ৩
২ কবীর পৃঃ ৪
৩ আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত 'ভারতমে জাতিভেদ' পৃঃ ১৪৪
৪ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' পৃঃ ৫১

অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হ'ল না। আর্থিক অবস্থাও ভাল হ'ল না; সামাজিক মর্য্যাদাও বাড়ল না। নতুন ধর্মও তাঁদের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে প্রথম প্রথম পারে নি। তাঁরা নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন। পূর্ব্বেকার অনেক ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাস এমন কি আচার-অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

এমনি একটি জোলা-পরিবারে কবীরদাস জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন। তখন জোলারা মনে হয় সবে মাত্র, হয়ত এক-আধ পুরুষ ধরে, মুসলমান হয়েছেন।[১] কাজেই তাঁদের মধ্যে পুরোনো সংস্কার, ঐতিহ্য প্রভৃতি পুরো মাত্রায়ই বজায় ছিল। এই সবের মধ্যেই কবীরদাস মানুষ হন। সেইজন্য তাঁর জীবনের উপর এইগুলির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

কবীরের শৈশব বা বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে তখন লেখাপড়া শেখেন নি এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ, কবীরদাস নিরক্ষর ছিলেন। তিনি "মসী কাগদ্ ছুআ নহী"[২] অর্থাৎ কাগজ আর কালি ছুঁননি।

আমাদের দেশে গরীব শিল্পজীবী পরিবারে যা হয় ছেলেরা অল্প বয়স থেকেই জাত-ব্যবসায় শিখে এবং পিতার কাজে সাহায্য করে। তারপর ১৩।১৪ বছর বয়স থেকে বা তারও আগে থেকে তারা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মত কাজ করতে থাকে। অনুমান করা যায়, কবীরদাসের বেলাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। তিনিও জাত-ব্যবসায় শিখেন এবং তাঁত বুনেই জীবিকা অর্জন করতেন।

কবীরদাস বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন কিনা, এ নিয়েও কথা উঠেছে। সাধারণ লোক জানে কবীরদাস সংসারী ছিলেন। তাঁর মুসলমান শিষ্যেরাও তাই বলেন। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লুই। তাঁর একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও ছিল। ছেলেটির নাম কমাল, মেয়েটির নাম কমালী।

কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যেরা এ সব বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, কবীরদাস কখনও বিয়ে করেন নি। লুই বলে যে কেউ ছিলেন এ কথাও তাঁরা অনেকেই স্বীকার করেন না। আর যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও

১ কবীর পৃঃ ৪

২ কবীর পৃঃ ১৪

বলেন, লুই ছিলেন কবীরদাসের শিষ্যা। কমাল ও কমালীকেও তাঁরা কবীরদাসের শিষ্য বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ওরা ঠিক শিষ্য নয়, পালিত পুত্র-কন্যা।

এ সম্বন্ধে কাঁদের কথা যে ঠিক বলা কঠিন। কেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় থেকে বিশেষ করে শঙ্করাচার্য্যের সময় থেকে ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীরা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। বৈদিক ও পৌরাণিক কয়েক জন বিখ্যাত ঋষি ছাড়া ভারতবর্ষের বড় বড় ধর্মগুরুরা প্রায় সবাই সন্ন্যাসী। লোকের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সন্ন্যাসী না হ'লে কেউ বড় রকমের সাধু-সন্ত হ'তেই পারে না। কাজেই কবীরদাসের মত এত বড় একজন সিদ্ধ সন্ত, এত বড় একজন ধর্মগুরু সন্ন্যাসী ছিলেন না, এ কথা তাঁর হিন্দু শিষ্যদের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন। এই জন্যই তাঁরা নানা ভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কবীরদাস সংসারী ছিলেন না। এ অবস্থায় এঁদের মত সহসা মেনে নেওয়া যায় না।

কবীরদাস সংসারী ছিলেন কি না এ নিয়ে পাদ্রী কি (Keay) সাহেব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কবীরদাসের পদ থেকে এ সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যা পাওয়া যায় বিশেষ করে তা' বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, কবীরদাস সংসারী ছিলেন।[১] আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদেরও তাই মত।[২]

তবে সংসারী হলেও কবীরদাস সাধারণ লোক সংসার বলতে যা বোঝে সে রকম সংসার করেন নি কোনো দিনই। তাঁর সংসার ছিল সন্ন্যাসীর সংসার। তিনি ছিলেন স্বভাব-উদাসী মানুষ। বিষয়-চিন্তার চেয়ে ভগবদ্-চিন্তাই তিনি বেশী করতেন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় ও সাধুসঙ্গ করতে।

কবীরদাস ছিলেন আমরণ দরিদ্র। ধনী হবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাঁর হয়নি কখনো। কেন না, ধনৈশ্বর্য্যকে তিনি ভগবদ্-ভক্তির পরিপন্থী মনে করতেন। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু না হ'লে নয় তিনি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। সেই জন্য বিষয়-কর্মও যেটুকু না করলে নয় তাই করতেন।

---

১ Kabir and his Followers P. 36

২ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৫

এর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে, কবীরদাস শ্রমবিমুখ ছিলেন বা সাধু হ'লে কাজকর্ম করা দরকার নেই মনে করতেন। তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—

কহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ,
আপ জীয়ৈ ঔরনকো দীজৈ ॥[১]

কবীর বলছে, এমনি উদ্যম করবে যাতে করে নিজের জীবিকা চলে আর অন্যকেও কিছু দিতে পার।

কবীরদাস নিজেও যতটা সম্ভব তাই করতেন। তবে সব বিষয়েই তাঁর ছিল ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর। পরিবার প্রতিপালনের ভারও তিনি ঈশ্বরের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি চমৎকার পদ পাওয়া গেছে—

দীন দয়াল ভরোসে তেরে
সভ পরৱারু চঢ়াইআ বেড়ে।[২]

হে দীনদয়াল! তোমার উপরই আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু পরিবারের অন্য লোকেরা ত আর কবীরদাসের মত ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিল না। তারা যখন দেখত কবীরদাস কাজকর্মে অবহেলা করছেন এবং ফলে তাঁদের অন্ন-সংস্থানই ভার হয়ে উঠেছে তখন তারা, বিশেষ করে কবীরদাসের মা, এ নিয়ে খুব দুঃখ করত এমন কি কান্নাকাটিও করত। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে—

মুসি মুসি রোৱৈ কবীর কী মায়,
ঐ বারক কৈসে জীৱহি রঘুরায়।
তননা বুননা সম তজ্যো হৈ কবীর,
হরি কা নাম লিখি লিয়ো শরীর।[৩]

দুঃখ করে করে কাঁদতে লাগল কবীরের মা! হে রঘুরায়, এবার কেমন করে বাঁচব। কবীর শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাম আর তানা দেওয়া, কাপড় বোনা সব ছেড়ে দিয়েছে।

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৮
২ আদি গ্রন্থ, গৌরী, ৬১
৩ ঐ পৃঃ ২৮৫

এর থেকে বোঝা যায়, কবীরদাসের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না। পারিবারিক অশান্তির আর একটি কারণও ছিল। কবীরদাস মুসলমান-পরিবারের লোক হয়ে হিন্দু গুরু রামানন্দের শিষ্য হন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। স্বভাবতঃই তাঁর পরিবারের সবাই এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাদের সেই ক্ষোভও পরিবারের শান্তি নষ্ট করে। এই পারিবারিক অশান্তির ফল এই হ'ল যে, যতই অশান্তি বাড়ত ততই কবীরদাস ঈশ্বর-প্রসঙ্গে আরও গভীরভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন।[১]

যদি কমালকে কবীরদাসের ছেলে বলে স্বীকার করা হয় (আর নিরপেক্ষ লোকেরা তা করেও থাকেন[২]), তাহ'লে কবীরদাসের পুত্রভাগ্যও ভাল ছিল মনে হয় না। অন্ততঃ ছেলেকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারেন নি। হিন্দীতে একটি বহুল-প্রচলিত কথা আছে—"ডুবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল।"—পুত্র কমালের জন্ম হওয়ায় ডুবল কবীরের বংশ।

এর থেকে মনে হয়, পিতার পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। পুত্র পিতার আধ্যাত্মিক সাধনা গ্রহণ করেননি। কারো কারো মতে কমাল বড় হ'য়ে পিতার মতের বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ অবশ্যি এসব কথা বিশ্বাস করেন না। উল্লিখিত দোঁহাটিরও তাঁরা অন্য রকম ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন,[৩] "কমাল একজন ভক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পর যখন কমালকে সবাই বলিল, তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তোলো। তখন কমাল বলিলেন, আমার পিতা চিরজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সত্যকে হত্যা করা হইবে। ইহা একপ্রকার পিতৃহত্যা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তখন অনেকে বলিলেন ডুবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল"। প্রকৃত প্রস্তাবে কি যে ঘটেছিল তা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

তবে যা-ই ঘটুক না কেন, কবীরদাসের পারিবারিক জীবন যে সুখের ছিল না একথা অনেকটা নিশ্চয় করেই বলা যেতে পারে।

যারা ভগবানকে চায় তাদের ভাগ্যে বোধ হয় এমনি ঘটে। তাদের

---

১ Kabir and his Followers P. 33.

২ ঐ পৃঃ ৩৫

৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৫

জাগতিক সুখ-শান্তি ভগবানই বুঝি হরণ করে নেন। নৈলে, তারা যে অনন্যমনা হয়ে ভগবানকে চাইতে পারে না। আর অনন্যমনা হয়ে ভগবানকে না চাইলে তাঁকে ত পাওয়া যায় না? সাধুদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে—ভগবান বলছেন—'যে করে আমার আশ তার করি সর্বনাশ, তবু যদি না ছাড়ে আশ আমি হই তার দাসের দাস।' তাই বোধ হয় কবীরদাসও পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি পাননি।

তবে দুঃখ, অশান্তি কিছুই কবীরদাসকে বিচলিত করতে পারেনি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ সবের দরুণ বরং তাঁর ঈশ্বরানুরাগ আরও গভীরতর হয়েছিল। কবীরদাস ছিলেন স্বভাবউদাসী 'মস্ত' মানুষ। হিন্দীতে 'মস্ত' বলে তাকেই, যে আপন-ভোলা মানুষ সব সময়ই কোনো ভাবে বিভোর হয়ে থাকে, সংসারের ভাবনা যে একটুও ভাবে না, অতীতে কি করেছে না করেছে তার হিসাব রাখে না, বর্তমানে কি করছে না করছে তা নিয়েও মাথা ঘামায় না, আর ভবিষ্যতের কোনো ধারই ধারে না।[১]

এমনি ধরণের ব্যোমভোলা সদানন্দ মানুষ ছিলেন কবীরদাস। কিন্তু তাই বলে তাঁর মধ্যে কোনো রকম ভাববিহ্বলতা বা দুর্বলতার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। অতি স্থির ছিল তাঁর বুদ্ধি। অনমনীয় ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি একবার যা বিশেষ বিবেচনার পর সত্য বলে গ্রহণ করতেন, কিছুতেই কোনো কারণেই তার থেকে বিচ্যুত হতেন না। সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও নয়। আর একটা কথা। কবীরদাস ছিলেন বিশেষ বিচারশীল মানুষ। কোনো কিছুই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করতেন না। "তিনি সত্যকে পরখ করিয়া লইতেন।"[২]

কবীরদাস ছিলেন ভক্ত আর ভক্তজনোচিত বিনয়ও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু একটি জায়গায় সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে তাঁর একটি মস্ত বড় পার্থক্য ছিল। তিনি নিজেকে কখনো হীন পতিত মনে করতেন না।[৩] কবীরদাসের আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। নিজের সম্বন্ধে বা নিজের গুরু সম্বন্ধে বা নিজের সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব জাগে নি কোনো দিন। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী

১ কবীর পৃঃ ১৫৭

২ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৭১

৩ কবীর পৃঃ ১৬৯

বলেন—কবীর ছিলেন বীর সাধক, তাঁর এই বীরত্বের মূল হ'ল তাঁর অটুট আত্মবিশ্বাস।

কবীরদাস সাধনাকে একটি সংগ্রাম মনে করতেন। তিনি যে প্রভুর সাধনা করতেন তাঁকে ত এমনি এমনি পাওয়া যায় না, প্রাণ দিয়ে তাঁকে পেতে হয়।[১]

কবীরদাস ছিলেন খাঁটি মানুষ। তাই, সকল রকমের মিথ্যাচার, সকল রকমের ভণ্ডামিকে তিনি কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। তিনি জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে। সেইজন্য, মানুষের হাতে মানুষের কি পরিমাণ লাঞ্ছনা, কি পরিমাণ অপমান হ'তে পারে, মানুষ মানুষকে কতদূর ঘৃণা করতে পারে তা সাক্ষাৎভাবে জান্তে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায়, যে-প্রথা মানুষকে বিনা দোষে এমনি হীন পতিত করে দেয়, যে-প্রথা মানুষে মানুষে এমন দুল'ঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে, কবীরদাস সেই জাতি-ভেদ প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

প্রচলিত ধর্মের ও সমাজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত প্রচণ্ড সাহস ও শক্তি ছিল কবীরদাসের আর ছিল মানুষের মহত্ত্বের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই, তিনি যা সত্য বলে' মনে করেছেন তা প্রচার করেছেন নির্ভীকভাবে।

ডাঃ দ্বিবেদী বলেন, কবীরদাস ছিলেন এক জন যুগাবতার। যুগাবতারের বিশ্বাস ও শক্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর ছিল যুগ-প্রবর্তকের দৃঢ়তা, আর তিনি যুগ-প্রবর্তনও করেছিলেন।[২]

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, মহাপুরুষেরা তাঁদের সমসাময়িক লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। লোকে তাঁদের কথা বুঝতে পারে নি বা ভুল বুঝেছে। এই জন্যে প্রাণপণে তাঁদের বিরুদ্ধতা করেছে, এমন কি অনেক সময় তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিনাশ করবার চেষ্টা করেছে। কবীরদাসের বেলাও তাই হয়েছিল। তাঁর শত্রু ছিল অসংখ্য।

কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকেই অর্থাৎ তাদের বাহ্যানুষ্ঠানকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বেদ-কোরাণ, পুরোহিত-মোল্লা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রতোপবাস-রোজা, সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ কিছুই মানতেন না। এ সমস্তই নিরর্থক মনে করতেন। এই জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই

১ কবীর পৃঃ ১৬০
২ ঐ পৃঃ ১৬৯

তাঁর উপর খড়্গাহস্ত হয়ে উঠে। তারা নানা ভাবে কবীরদাসকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে থাকে, এমন কি তাঁর নামে অত্যন্ত জঘন্য রকমের কলঙ্ক পর্যন্ত রটায়। কিন্তু তাতেও কবীরদাস ভয় পান নি। এদের এই হীন আক্রমণেও তাঁর চরিত্র-মহত্ব খর্ব হ'ল না। পাহাড়ের মত অটল রইলেন কবীরদাস আপন চরিত্র-মাহাত্ম্যে।

কবীরদাসকে এমনি জব্দ করতে না পেরে শেষে হিন্দু-মুসলমানে মিলে বাদশা সিকন্দর লোদীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তার সব কটির'ই সার কথা এই—মুসলমান বললে—জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করল। হিন্দুও করল সেই অভিযোগ। সব শুনে বাদশা হুকুম দিলেন, কবীরকে হাজির কর দরবারে। হুকুম তামিল হ'ল। কবীরদাস এলে বাদশার সঙ্গে তাঁর অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হ'ল। কবীরদাসের কড়া কড়া কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাদশা। কবীরদাসের হল প্রাণদণ্ড। কিন্তু বাদশা তাঁকে বধ করতে পারলেন না। জলে ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে কত ভাবেই না চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে বাদশার চোখ ফুটল। কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন বাদশা।

কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে পাওয়া যায়, তিনি নানা ভাবের সাধু সন্তদের সঙ্গে মিলনের জন্য বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। 'কবীর-মন্‌শূর' প্রভৃতি গ্রন্থমতে সুদূর মক্কা, বাগদাদ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি দেখা করেছিলেন।[১]

কাহিনীগুলি বলে, এই ভ্রমণের সময় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে করে কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকে তাঁর শরণ নিয়েছে। এই সময়েই যোগী গোরখনাথ এবং সর্বানন্দ নামে 'সর্বজিৎ' উপাধিধারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে কবীরদাসের বিচার হয় এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির কাছে তাঁদের পরাজয় হয়।[২]

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের সঙ্গেও কবীরদাসের সাক্ষাৎ হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে।

কবীরদাসের শিষ্যকরণ সম্বন্ধেও নানা গল্প শোনা যায়। বিশেষ করে সমাজের

---

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৭০

২ Kabir and his Followers P. 18

উচ্চস্তরের যে সব ব্যক্তি কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোনো না কোনো কাহিনী অবশ্যই শোনা যায়। রাজা বীরসিংহ, কবীরদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য ধর্মদাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিষ্য। কবীরদাসের সম্বন্ধে আর একটি মজার গল্প শোনা যায়। সিদ্ধ সাধু হিসাবে যখন কবীরদাসের নাম ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। এরা সাধুর কাছে ভগবানের কথা শুনবার জন্য আসত না, এরা আসত ধন, পুত্র, রোগের ঔষধ এই সব চাওয়ার জন্য। জ্বালাতন হ'লেন কবীরদাস ; তাঁর সাধন-ভজন সব মাথায় উঠল ; কি করে এ সব লোকদের হাত এড়ানো যায় তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ভেবে ভেবে শেষে এক অদ্ভুত উপায় বের করলেন। কবীরদাস সুরু করলেন বেশ্যাসক্ত মাতালের অভিনয়। মাতালের মত টলতে টলতে একটি বেশ্যার কণ্ঠলগ্ন হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সহরে। লোকে দেখে ছি-ছি করতে লাগল, যা মুখে আসে তাই বলে' কবীরদাসকে গালাগাল দিতে লাগল। কবীরদাস যে একটি এক নম্বরের ভণ্ড এ বিষয়ে আর কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না। কবীরদাসের কাছে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কবীরদাসের উদ্দেশ্য সফল হ'ল।[১]

কবীরদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ১১৯ বছর ৫ মাস ২৭ দিন বা মতান্তরে ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। কবীর-কসৌটী নামক গ্রন্থ অনুসারে ১৫১৮ খৃঃ মঘর নামক স্থানে কবীরদাস দেহত্যাগ করেন।[২] ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন[৩] প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা ১৪৯৮ খৃঃ কবীরদাস দেহত্যাগ করেন বলে 'ভারতব্রাহ্মণে' যে উল্লেখ আছে তাই সমর্থন করেন, এ কথার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই মঘর বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার গোরখপুরের নিকট একটি জায়গা। কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে যেমন সব অলৌকিক কাহিনী রয়েছে তেমনি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধেও অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কবে সংসার ছেড়ে যাবেন তা তাঁরা আগে থেকেই জানতে পারেন। কবীরদাসও

---

১ Kabir and his Followers P. 19.

২ ঐ পৃঃ ২৩।

৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৩।

জানতে পেরেছিলেন। তাই দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কাশী ছেড়ে মঘরে চলে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। লোকের বিশ্বাস, কাশীতে যে মরে সে স্বর্গে যায় আর মঘরে যে মরে সে গাধা হয়। সেই জন্য কবীরদাসের ভক্ত অনুরাগী প্রভৃতি সবাই মিলে মঘরে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য গুরুর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কবীরদাস কিছুতেই মত বদলালেন না। তিনি বললেন, স্থান-বিশেষে মরলে মানুষের বিশেষ কোনো গতি হবে এ সব কোনো কাজের কথা নয়। আসল কথা হ'ল, যার হৃদয়ে রাম রয়েছেন যেখানেই মরুক না কেন সে-ই পাবে মুক্তি। নৈলে মুক্তি মিলবে না আর কিছুতেই। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে। (অনূদিত পদ ৫৮)।

কবীরদাস কাশী ছেড়ে মঘরে যাচ্ছেন এ খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে শেষ বারের মত দর্শন করবার জন্য সহরের লোক ভেঙ্গে পড়ল। সবার চিত্ত ব্যথাতুর। কবীরদাসের প্রায় হাজার দশেক শিষ্য ও অনুগামী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল মঘরে।

মঘরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছিল অমী নদী। তার তীরে ছিল এক সাধুর ভজন-কুটীর। তখন কুটীরখানি শূন্য ছিল। কবীরদাস গিয়ে আসন বিছালেন সেই কুটীরে। শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা আমার জন্য কিছু শাদা পদ্মফুল আর দু'খানা শাদা চাদর নিয়ে এস। একটু সময়ের মধ্যেই এক রাশ পদ্মফুল আর চাদর দু'খানা শিষ্যেরা নিয়ে এল।

গুরু দেহরক্ষা করবেন খবর পেয়ে কবীরদাসের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান শিষ্য মঘরে সমবেত হ'ল। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলেন রাজা বীরসিংহ, এঁকে বলা যায় হিন্দু দলের নেতা। আর এলেন সসৈন্যে বিজলী খাঁ। ইনি মুসলমান দলের নেতা।

কবীরদাসের সময় হয়ে এল। তিনি এবার সবাইকে ডেকে বললেন,—তোমরা আর এখন এখানে ভিড় করো না, আমি একটু ঘুমুব। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোমরা সব চলে যাও।

রাজা বীরসিংহ বুঝলেন এই গুরুজীর শেষ নিদ্রা। তিনি তখন এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বললেন, গুরুজী, কৃপা ক'রে অনুমতি করুন, সত্যলোকে আপনার প্রয়াণের পর আপনার পবিত্র দেহ নিয়ে গিয়ে আমি বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথা অনুসারে তার সৎকার করব। একথা শুনে প্রবল আপত্তি জানালেন বিজলী

খাঁ। বললেন, এ কখনো হ'তে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান মতে কবর দেব।

কবীরদাস দেখলেন, উভয় পক্ষের সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত, তাঁর নশ্বর দেহকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তপাত অনিবার্য্য। তিনি উভয় পক্ষকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ—তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা করতে পারবে না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না। গুরুর আদেশ যে পালন করে কল্যাণ হয় তার।

দুই দলই এই আদেশ মাথা পেতে নিল। এবার ভিড় সরে গেল। কবীরদাস তখন শেষ বারের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। শিষ্যেরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভিতর থেকে কেমন এক রকম শব্দ শোনা গেল। শিষ্যেরা অঝোরে কাঁদতে লাগল আর গুরুজীর জয়ধ্বনি করতে লাগল। গুরুজী সত্যলোকে প্রয়ান করলেন।

এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটল। তার পর দরজা খোলা হ'ল। ভিতরে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কোথাও দেহ নেই। আছে শুধু দু'খানা চাদর আর প্রত্যেক চাদরের উপর একরাশি করে পদ্মফুল।

এমনি করে কবীরদাস হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। রাজা বীরসিংহ একখানা চাদর ও তার উপরকার ফুলগুলি কাশীতে নিয়ে গিয়ে যথারীতি দাহ করলেন, তার পর চিতাভস্ম নিয়ে বর্ত্তমানে যাকে 'কবীর চৌরা' বলে সেই জায়গায় প্রোথিত করলেন।

এদিকে বিজলী খাঁ তাঁর অংশ মঘরেই কবর দিলেন। শেষে অবশ্যি হিন্দু-মুসলমান উভয় দল মিলে মঘরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

---

১ Kabir and his Followers P. 25

ডাঃ স্যার আর জি ভাণ্ডারকারের মতে ভক্তিভাবের বীজ ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়।[১] আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনও বলেন, "বেদে বশিষ্ঠাদির মন্ত্রে বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তবে ভক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।"[২] উপনিষদের যুগে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এই ভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ডাঃ ভাণ্ডারকার বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমের নিদর্শন পেয়েছেন। কঠোপনিষদে ত স্পষ্টই বলা হয়েছে, পরমাত্মার প্রতি যার ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে তার প্রতিই পরমাত্মা প্রসন্ন হন, সে-ই জিজ্ঞাসা আদি দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হয়।[৩] এই জন্যে ভক্তেরা দাবী করেন বেদান্তে যাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলা হয়েছে তা আসলে ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪] আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে প্রেমভক্তির ভাব মিলেছে।[৫]

এই ভক্তিভাব সম্ভবতঃ মনোধর্মী আর্য্যেরা হৃদয়ধর্মী অনার্য্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন ; অথবা ভাবটি হয়ত স্বাধীন ভাবেই আর্য্য-অনার্য্য উভয়ের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল। তবে মনে হয় আর্য্যদের ক্ষেত্রে জোর পেয়েছিল অনার্য্যদের সংস্পর্শ থেকে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "আর্য্যেরা এক দিকে ভক্তি অপেক্ষা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াতেই বা অন্যদিকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেই বেশী অনুরক্ত ছিলেন। আর্য্যদের পূর্ব্ববর্তী দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভক্তির ভাব ছিল বেশি। আর্য্যদের জ্ঞানের সহিত এই ভক্তিবাদ মিশিয়া ভারতে ধর্ম্মভাব গভীর ও উদার হইয়া উঠিতে লাগিল।"[৬] বেদে ও উপনিষদে ভক্তির নিদর্শন থাকলেও ভক্তি কথাটা কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে বাসুদেব যখন অর্জ্জুনের কাছে গীতা প্রকাশ করলেন তখনই ভক্তিধর্ম একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিল।[৭] ভগবদ্‌গীতাই ভক্তিধর্ম বা একান্তিক ধর্ম প্রচারের

১ Vaisnavism, S'aivism and Minor Religious Systems P. 28

২ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ২

৩ Vaisnavism S'aivism and Minor Religious Systems P, 28

৪ ডাঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ১৪৬

৫ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৩

৬ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৩

৭ Vaisnavism, S'aivism and Minor Religious Systems P. 8

প্রাচীনতম নিদর্শন।[১] ভগবদ্‌গীতার রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে উহা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের প্রথম দিককার পরে নয় বলা যায়।[২]

ভক্তির জন্য চাই ভগবানকে। অর্থাৎ বৈয়ক্তিক কোনো দেবতা বা ঈশ্বর না থাকলে ভক্তি সম্ভবে না। কেন না, শুদ্ধ তত্ত্বমাত্রের প্রতি মানুষের প্রেম জন্মে না। এর থেকেই আর একটা কথা এসে পড়ে। ভক্তির জন্য এক দিকে চাই যেমন ভগবানকে তেমনি অন্য দিকে চাই ভক্তকে। প্রেমের রাজ্য দুইয়ের রাজ্য; একাকী প্রেম হয় না। অবশ্যি আত্মরতি সম্ভবপর। কিন্তু তা সম্ভব শুধু তাত্ত্বিক মানুষের ক্ষেত্রে। এ রকম মানুষ অসাধারণ। সাধারণ মানুষের কাছে এ সব কথার বিশেষ মূল্য নেই।

বেদে দেবতারা আছেন। কিন্তু তাঁরা মানুষের কাছে আসতে পারেন নি, যাগ-যজ্ঞের জটিল জালে বাঁধা পড়েছেন। তাঁদের প্রতি মানুষের ভক্তি পরিস্ফুট হয় নি; তাঁদের দ্বারা মানুষের অন্তরের তৃষ্ণা মেটেনি।

উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বমাত্র। এঁকে নিয়ে বুদ্ধিপ্রধান আর্য্য ঋষিদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়ত হয়েছিল কিন্তু সর্ব্বসাধারণের হৃদয়কে ইনি তৃপ্ত করতে পারেন নি। তার প্রমাণ আছে উপনিষদেই। উপনিষদের যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত আধ্যাত্মিক ভাব আত্মপ্রকাশ করে একাধিক ভাবে। তাই দেখি উপনিষদে শুধু নির্গুণব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতবাদই প্রচারিত হয় নি। সগুণব্রহ্মবাদের কথাও এতে আছে। সগুণ ব্রহ্মই ভক্তের ভগবান। অবতারবাদের মূলও উপনিষদেই আছে।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, অদ্বৈতভাব ভক্তির বিরোধী। নারদ ভক্তিসূত্রের সংজ্ঞা অনুসারে ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমকেই ভক্তি বলে নির্দ্দেশ করলে তাই হয় বটে। কিন্তু ভক্তির অন্য সংজ্ঞাও আছে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু বলেন,[৩] 'অন্য অভিলাষশূন্য জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনাবৃত এমন যে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন তাহাই উত্তমা ভক্তি।' নিরুপাধিক স্বরূপেরও

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 14

২ ঐ পৃঃ ১৩

৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৯

এমনি অনুশীলন হতে পারে। কাজেই অদ্বৈতভাব ভক্তির বিরোধী বলা চলে না।[১] তা ছাড়া ভক্তদের মতে অদ্বৈতবেদান্তীরাও ভক্ত। জ্ঞানমার্গী হলেও তাঁরা পরম ভগবৎ-প্রেমেরই সাধক। কেন না বেদান্ত মতে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ নেই। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলে যে মনে হয় তা ভ্রম। এই অভেদের জন্য জীব প্রতিনিয়ত ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার জন্য, স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির জন্য। এই আকর্ষণ পরম প্রেমের আকর্ষণ; ব্রহ্মের প্রতি, আত্মস্বরূপের প্রতি এই প্রেম। কাজেই জ্ঞানমার্গী বেদান্তীরাও প্রেমিক, তাঁরাও ভক্ত।

তবে সাধারণতঃ ভক্তি দ্বৈতবাদীই বটে। সাধারণ মানুষের ভক্তি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৈয়ক্তিক দেবতাকেই খোঁজে। সে ভক্তি এমন এক জন দেবতাকে চায় যিনি ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন, তাদের আপদ-বিপদে রক্ষা করবেন, তাদের সুখ-সম্পদ দেবেন, তাদের দেবেন মুক্তি। এই জন্য মানুষ করেছে একাধিক দেবতার পূজা। এই সব দেবতা যে ভিন্ন নন, একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এ তত্ত্ব উপনিষদেই পাওয়া যায়। আর এই পরমাত্মার প্রতি ঋষিদের প্রেমের তথা ভক্তির পরিচয়ও আছে উপনিষদেই।[২]

এই পরমাত্মাই ভগবান।

'নিদ্দেশ' নামক একখানা বৌদ্ধ-গ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বলদেব, বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেবতা, এমন কি পশুপক্ষীর পূজাও প্রচলিত ছিল।[৩] কালক্রমে সকল দেবতার পূজাকে অতিক্রম করে ভারতের একটি বৃহৎ ভূভাগে বাসুদেব-পূজা প্রবল হয়ে ওঠে।[৩] খৃষ্ট জন্মাবার তিন চারশ বছর আগে থেকেই বাসুদেব পরমেশ্বর-রূপে পূজিত হতে থাকেন।[৪] তাঁর ভক্তদের বলা হত ভাগবত। ভাগবত-ধর্ম ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবল ছিল। এমন কি কোনো কোনো গ্রীসদেশবাসীও এটি গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

---

১ কবীর পৃঃ ১৪৩

২ বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

৩ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 3

৪ ঐ পৃঃ ৪

বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, বিশেষ করে সেই সব যাগ-যজ্ঞে পশুবধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই সম্ভবতঃ বেদবাহ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। আর বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিকদিগের মধ্যে প্রচলিত উগ্র তপশ্চর্য্যারও বিরোধী ছিল। ভক্তিধর্মেরও গোড়ায় আমরা এই দুটি লক্ষণ দেখতে পাই।

মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি অংশের নাম নারায়ণীয় উপাখ্যান। এই নারায়ণীয় উপাখ্যানে উপাখ্যান আকারে ভক্তিধর্মের আলোচনা আছে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভক্তিধর্মকে বলা হয়েছে একান্ত ধর্ম আর ভক্তিকে বলা হয়েছে একান্ত ভাব। পরমাত্মার নাম নারায়ণ বা হরি। ইনিই বাসুদেব।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মভাবের উদ্ভব হয়। সে ভাব অহিংসামূলক। নারায়ণীয় উপাখ্যানের আলোচনা করলে দেখা যায়, এতে এক দিকে যেমন বলা হয়েছে যারা অহিংস এবং একান্তভাবে পরমাত্মাকে ভক্তি করে তারাই তাঁকে পায়, আবার অন্য দিকে যাগ-যজ্ঞের ধারাটাকে একেবারে অস্বীকার না করে তার সঙ্গে ঔপনিষদিক অহিংস-ভাবের সমন্বয় করা হয়েছে। এই উপাখ্যানের বসু উপরিচরের কাহিনী থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানতে পারা যায়। বসু উপরিচর যে যজ্ঞ করেছিলেন তাতে পশুবলি হয়নি। তাঁর যজ্ঞে হোম করা হয়েছিল আরণ্যকের (উপনিষদ এর অন্তর্গত) বিধি অনুসারে। যজ্ঞের প্রধান দেবতা পরমেশ্বর হরি। যাগ-যজ্ঞের দ্বারা এই হরির দর্শন পাওয়া যায় না; যেমন পান নি বৃহস্পতি। কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাও পাওয়া যায় না; যেমন পান নি একত, দ্বিত এবং ত্রিত। শুধু ভক্তিভরে যে তাঁর পূজা করে সেই তাঁর দর্শন পায়; যেমন পেয়েছিলেন বসু উপরিচর।[১]

এর থেকে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। একান্ত ধর্ম্ম এক দিকে শাস্ত্রীয় ধারা মেনে চলেছে আর এক দিকে শুধু ভক্তির উপর জোর দিয়েছে। আমরা দেখতে পাব ভক্তিধর্ম্মের এই দুই দিক—একটি শাস্ত্রানুগ আর একটি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ—এই দুইটিই পরবর্ত্তী কালে সুস্পষ্ট আকার নিয়ে বেড়ে উঠে। নারায়ণীয় উপাখ্যানের এই একান্ত ধর্ম্মেরই ধারা বহন ক'রে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের উদ্ভব হয়।

---

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 7.

...NING COLLEGE ... ২০ ... nipur

ভারতীয় প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট হল বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবতার মধ্যে পরম একের উপলব্ধি ভারতীয় সাধনার এক চরম সিদ্ধি। ভারতীয় দেবমণ্ডলে যত দেবতা আছেন লকলেই ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা ব্রহ্মের রূপবিশেষ। ভারতের এই একের সাধনাই নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই সব ভিন্ন দেবতাকে এক দেবতা করে তুল্‌লে।

অবশ্যি ভারতবর্ষে ও ধর্মের ক্ষেত্রে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তা কখনও ভারতের এই পরম ঐক্যবিধায়িনী মৌলিক সাধনাকে ধ্বংস করতে পারে নি। তাই দেখি, যুগে যুগে এই দেশে এমন সব সাধকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা সমস্ত ভেদ-বিভেদের বাইরে গিয়ে সেই একের কথা বলেছেন।

আরাধ্য দেবতার বিভিন্নতা অনুসারে ভক্তিধর্মের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য এই পাঁচটিই প্রধান। এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রভাব বেশী। বৈষ্ণব ধর্ম প্রাচীনতমও বটে। কেন না, আমরা আগেই বলেছি, ভাগবত ধর্ম বা নারায়ণীয় উপাখ্যানে ব্যাখ্যাত একান্ত ধর্মই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের রূপ নেয়। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার প্রমাণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই পাওয়া যায়।[১]

মানুষ দেখে প্রকৃতির কমনীয় রূপ। যে রূপ দেখে তার চোখ জুড়ায়, তার মন খুশিতে ভরে উঠে; দেখে প্রকৃতির এমন সব কাজ যাতে করে তার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে। সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটতে দেখে যাতে করে তার কল্যাণ হয়। মানুষ এ সব দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমনি দেবতার প্রতি তার মন প্রীতিতে ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই দেবতার পূজা করে সে। তাঁকে ভালবাসে। বিষ্ণু এমনি দেবতা। তাই বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের ধর্ম। আর অতি প্রাচীন কালেই মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির মধ্যে এর উদ্ভব হয়েছিল অনুমান করা যায়।

আবার এই প্রকৃতিরই ভয়ঙ্কর রূপও মানুষ দেখতে পায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, বন্যা, মহামারী, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার মানুষের জীবন বিপন্ন করে, তার মৃত্যু ঘটায়। সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে করে তার জীবনের সুখ-শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সবও সে দেবতার কাজ বলে মনে

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 46

করে। এমনি দেবতাকে মানুষ ভয় করে। তাঁর পূজা করে ভয়ের জন্যই। তাঁকে যে ভক্তি করে সেও ভয়ে ভয়ে। এমনি দেবতা রুদ্র। পরবর্ত্তী কালে ইনিই শিবরূপে পূজিত হন। কাজেই শৈব ধর্মও বৈষ্ণব ধর্মেরই মত প্রাচীন বলা যায়।

আদিতে কল্যাণময়, আনন্দময় দেবতার কল্পনা আর ভীষণ ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী দেবতার কল্পনা পৃথক্ হলেও পরে একই দেবতার আনন্দময় প্রিয় রূপ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপের কল্পনা করা হয়েছে। তাই দেখা যায়, যিনি রুদ্র তিনিই শিব; যিনি সংহারক তিনিই রক্ষক ও পালক; যিনি কালী করালী ভয়ঙ্করী রণচণ্ডী, তিনিই বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। সূর্য্য বৈদিক দেবতা, গণপতিকেও বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে কোনো স্বতন্ত্র প্রবল স্ত্রী-দেবতার কথা পাওয়া যায় না।[১] অনেকে মনে করেন শাক্ত মতের উদ্ভব হয় গৃহ্যসূত্রেরও পরবর্ত্তী যুগে। অবশ্যি গোঁড়া শাক্তেরা এ কথা মানেন না। তাঁদের মতে শাক্ত মত তার চেয়ে অনেক প্রাচীন।

সে যাই হোক, যে মতের যখনই উৎপত্তি হোক না কেন, এ কথা সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় যে. ভক্তির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বৈষ্ণব মতই প্রবল ছিল। অন্যান্য মত সময়-বিশেষে ও স্থান-বিশেষে প্রবল হয়ে আবার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু বৈষ্ণব মত বরাবরই আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। আজও ভক্তির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, তার পর শাক্ত ও শৈব মত। অন্য দু'টি মতের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

মনে হয়, প্রথমে উত্তর-ভারতেই বৈষ্ণব মতের উদ্ভব হয়। কিন্তু দক্ষিণেই হয় এর বিশেষ পরিপুষ্টি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এ রকম সময় বৈষ্ণব ধর্ম তামিল দেশে প্রবেশ করে।[২] তার পর উত্তর-ভারতে বৌদ্ধ-প্লাবনের পরে যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয় তখন আবার তার প্রভাব মারাঠা দেশের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সেখানে হল আলোয়ার বলে পরিচিত ভক্তদের আবির্ভাব এবং তখন থেকেই দক্ষিণে ভক্তিধর্মে বিশেষ জোর বাঁধল।

মোট বার জন আলোয়ারের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে এঁদের জন্ম

---

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, P. 142

২ পৃঃ ৫০।

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 17.6.05
Accn. No. 11421
6241

হয়। এঁদের সঠিক কাল-নির্ণয় কঠিন। তবে এই দ্রাবিড় ভক্তগণ যে একাদশ শতকের পূর্ব্বে জন্মেছিলেন, এ কথা বলা যায়। [১]

আমরা পূর্বেই ভক্তিধর্মের দুটো ধারার কথা উল্লেখ করেছি। একটি শাস্ত্রানুগ, অন্যটি শাস্ত্রের ধার ধারে না, প্রেমভক্তির সহজ পথ ধরে চলে। ভক্তি-ধর্মের এই অশাস্ত্রীয় ধারাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতের স্বকীয় সাধনা। তিনি বলেছেন, [২] "...ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প, বস্তুত, এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজ-শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"

ভক্তদের মধ্যেও তাই দু'টি দল দেখা যায়। এক শাস্ত্র-মানার দল আর এক না-মানার-দল। এদের সব ভারী সুন্দর সুন্দর নাম আছে। প্রথম দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত 'লোকবেদপংথী' অর্থাৎ যাঁরা লোকাচার ও বেদাচার মেনে চলতেন। মুসলমানেরা এঁদের বলেন বা-শরা আর বাউলরা বলেন দীঘলডুরী। দ্বিতীয় দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত 'অনভৌ-সাচ-পংথী'- অর্থাৎ যাঁরা অনুভব-প্রত্যক্ষ সত্য মেনে চলতেন। মুসলমানেরা এঁদের বলেন বে-শরা আর বাউলরা বলেন বেডুরী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। [৩]

দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই দুই দল ছিল। প্রথম দলের ভক্তদের বলা হ'ত আচার্য্য আর দ্বিতীয় দলের ভক্তরা আলোয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। আলোয়াররা প্রেম ও ভক্তির সহজ পথের সাধক। তাঁদের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু নারায়ণ। [৪]

---

১ Vaisnavlsm, Saivism and Minor Religious Systems P. 49

২ আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন কৃত ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারার ভূমিকা।

৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ২৮

৪ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 50

আলোয়াররা ছিলেন সত্য সত্যই 'বে-ডুরী'। তাঁরা সব দিক দিয়েই বন্ধনমুক্ত। শাস্ত্রের বন্ধন, জাতিভেদের বন্ধন, সংস্কৃত ভাষার বন্ধন সব তাঁরা ঘুচিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সমাজের অতি নিম্নস্তরের মানুষ। কিন্তু তাঁদের প্রেমভক্তি, তাঁদের সাধনা, তাঁদের জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবার প্রণম্য করে তুলে।

আলোয়াররা আপনাদের ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তিকে প্রকাশ করেছেন দক্ষিণের জনসাধারণের ভাষা তামিলে। তাঁদের রচনার নাম প্রবন্ধ। সব রচনাই সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীতে প্রেমভক্তি ও আধ্যাত্মতত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব প্রকাশ হয়েছে যে, দক্ষিণে আলোয়ারদের প্রবন্ধগুলিকে বৈষ্ণব-বেদ বলা হয়।[১]

আলোয়ারদের প্রভাবে দক্ষিণে বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রবল হয়ে উঠে এবং সেখান থেকে আবার উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ (একাদশ), মধ্ব বা আনন্দ-তীর্থ (দ্বাদশ), নিম্বার্ক (দ্বাদশ), এই কয় জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এঁরা এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রবর্ত্তন করেন। এঁদের উপর আলোয়ারদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এঁরাও প্রধাণতঃ প্রেম-ভক্তিই প্রচার করেছেন। তবে এঁরা শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন নি। স্ব স্ব মতবাদকে শাস্ত্রানুকূল দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন এবং ভক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানমার্গী শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। 'দীঘলডুরী' আর 'বে-ডুরী' এই দুই মতের একটা সমন্বয়চেষ্টা এঁদের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুত, এই সময়কার দক্ষিণী বৈষ্ণবমতের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়[২] (১) প্রেম-ভক্তির প্রবল ভাব। (২) মায়াবাদের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা।

কবীর প্রভৃতি পরবর্ত্তী ভক্তদের মতবাদেও এই প্রেমভক্তি ও মায়ার কথা বার বার এসেছে।

ধর্মের গোঁড়ামি ও জাতিভেদের কঠোরতা উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতে বেশী, এ কথা মনে করার হেতু আছে। দক্ষিণের পারিয়ার প্রতিকল্প উত্তরে নাই। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কঠোর জাতিভেদের উদ্ভব আর্যেতর সমাজে। হয়ত সেই জন্যই দক্ষিণে জাতিভেদের এত কঠোরতা। আর আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্ভবতঃ বেদবাহ্য ধর্মের

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, P. 50

২ ঐ পৃঃ ৬২

প্রতিকূলতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই বিশেষ করে রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। সে যাই হোক্, এই গোঁড়ামি ও কঠোরতার জন্য 'বে-ডুরী' আলোয়ারদের 'জাতপাত-বিরোধী' প্রেমভক্তির প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও ভক্তিধর্ম একেবারে গোঁড়ামি ছাড়তে পারল না।

আলোয়ার শঠকোপ ও বিষ্ণুচিত্ত ছিলেন অতি নীচবংশীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যদের অগ্রগণ্য আচার্য্য রামানুজ এঁদের উপদেশে পেয়েছেন প্রেম ও ভক্তি।[১] কিন্তু তবু শাস্ত্রের বন্ধন তিনি একেবারে এড়াতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে তাঁকে আপোষ করে চলতে হ'ল।

বৈষ্ণবধর্ম সুরু থেকেই ছিল হিন্দুসমাজে যারা অন্ত্যজ বলে পরিচিত তাদের প্রতি সদয়।[২] আচার্য্য রামানুজ একটা খুব বড় কাজ করলেন। তিনি এই দয়াকে কাজে রূপ দিলেন। অন্ত্যজদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করে তিনি তাদের বৈষ্ণব করে তুললেন, ঘোচালেন তাদের নীচত্ব। দেশীয় ভাষায় রচিত শঠকোপের ভক্তিগ্রন্থ তিরু বায়োমোলি (Tiru Vayamoli) প্রভৃতি আলোয়ারদের গ্রন্থকে তিনি বৈষ্ণববেদ বলে গ্রহণ করলেন।[৩]

ভক্তি দিল সবাইকে মুক্তির অধিকার। কিন্তু ব্রাহ্মণ গুরুরা উচ্চবর্ণের সঙ্গে নীচ-জাতীয়দের সমান অধিকার দেন নি। আমরা আগেই বলেছি, আচার্য্য রামানুজকেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হয়েছিল বা তিনি স্বেচ্ছায়ই চলেছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মণদের জন্য বিধিবিহিত পথ এবং অন্যদের জন্য অন্য পথের নির্দেশ দেন। নীচ জাতের বৈষ্ণবদের জন্য তিনি আলাদা পঙ্‌ক্তিভোজনের ব্যবস্থা করেন।

আচার্য্য রামানুজের পর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'টি দল দাঁড়িয়ে গেল। এক দলের নাম বড়কলই, অন্য দলের নাম তেনকলই। আচার্য্য রামানুজের ব্যক্তিত্ব 'দীঘলডুরী ও 'বে-ডুরী'দের একত্র করেছিল। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর এঁরা আর একত্র থাকতে পারলেন না, কারণ, এঁদের পথ এক নয়। বড়কলইদের মোটামুটি 'দীঘল-ডুরী' বলা যায় আর তেনকলইদের বলা যায় 'বে-ডুরী'। বড়কলইরা উঁচু জাতের সঙ্গে নীচ জাতের সমান অধিকার স্বীকার

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৫০

২ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 66

৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৩২-৩৩।

করেন না। ব্রাহ্মণেতরদের এঁরা 'ওঁ' উচ্চারণ করতে দেন না। এঁরা তাদের শাস্ত্রপাঠেরও অধিকার দেন না; শুধু তাদের মৌখিক উপদেশ দেবার কথা বলেন। এঁরা বৈষ্ণব হ'লেও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রশাসিত বৈষ্ণব। এঁরা গোঁড়া। তেনকলইদের এ সব গোঁড়ামি নেই। তাঁদের মতে সকল বৈষ্ণবের সমান অধিকার। তাঁরা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বাচবিচার না করে সবাইকে 'ওঁ' সহ মন্ত্র দেন।

তেনকলই ও বড়কলইদের মধ্যে আর একটি বিশেষ মতভেদ আছে। তেনকলইদের মতে মুক্তিলাভের মুখ্য উপায় ভগবানের দয়া, প্রপত্তি বা শরণাগতি। অন্য উপায় গৌণ। সকলের আগে প্রপত্তি, তার পর অন্য যা কিছু। জীবের প্রয়াসকে তাঁরা কোনো মূল্য দেন না। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন বিড়ালছানা ও তার মায়ের। বিড়ালছানার কোনো প্রয়াস নাই; মা-ই তাকে মুখে করে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। তেমনি জীবেরও কোনো প্রয়াস নাই। ভগবানই দয়া করে তার মুক্তির উপায় করে দেন। বড়কলইরা কিন্তু ভগবানের দয়ার সঙ্গে জীবের প্রয়াসকেও একটা বিশেষ স্থান দেন। তাঁদের মতে প্রপত্তি মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় বটে তবে একমাত্র উপায় নয়। অন্য উপায়ে না হ'লে তখন এই উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন, বানরছানা ও তার মায়ের। বানরছানার যেমন প্রয়াস করতে হয়, মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হয়, তেমনি জীবকেও প্রয়াস করতে হয়।

এই রামানুজ-সম্প্রদায় দক্ষিণাপথ থেকে ক্রমে উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কাশীতে তাঁদের একটি বড় স্থান ছিল। এখানে এক জন শক্তিশালী মহাপুরুষ এই সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তিনি গুরু রামানন্দ। রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু রাঘবানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১]

গুরু রামানন্দের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মেকলিফ সাহেবের মতে গুরু রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ মত স্বীকার করেন না। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে গুরু রামানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন প্রয়াগের এক কনৌজীয়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে।[১] আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন এ সম্পর্কে রামানুজ-দাস হরিবর কৃত ভক্তিমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকার মত উদ্‌ধৃত

---

১ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious systems Pp. 66, 67.

করেছেন। তাতে আছে, 'রামানন্দ রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য।' [১] আচার্য্য সেন অনুমান করেন, ১৪০০ খৃঃ থেকে ১৪৭০খৃঃ পর্য্যন্ত গুরু রামানন্দের সময়।

সে যা হোক্, রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন সত্য, কিন্তু সম্প্রদায়ের অনেক সব গোঁড়ামি তাঁর বরদাস্ত হ'ল না। অনুমান হয় তাঁর গুরু ছিলেন বড়কলই দলভুক্ত। এঁরা গোঁড়া। রামানন্দ সম্প্রদায়ের অনেক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে গুরুর সঙ্গে তাঁর মতান্তর হ'ল এবং অচিরে গুরু-শিষ্যের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। রামানন্দ নিজেই সম্প্রদায় স্থাপন করলেন। [২]

গুরু রামানন্দ তেনকলইদের মত বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ভেদ ঘুচালেন। তিনি বল্লেন, দীক্ষা নিয়ে যারা বৈষ্ণব হবে তারা সবাই সমান, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ উঁচু-নীচু কোনো ভেদ থাকবে না। কোনো রকম বাচবিচার না করে' সব বৈষ্ণব একত্র পঙ্‌ক্তি-ভোজন করতে পারবে। কারণ, তিনি মনে করতেন, ভক্তেরা যখন ভগবানের আশ্রয় নেন তখন তাঁদের পূর্বপরিচয় সব তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। [১] তখন তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা ভক্ত, তাঁরা বৈষ্ণব।

গুরু রামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত উদারহৃদয় মানুষ। তাঁর মধ্যে কোনো রকম সঙ্কীর্নতা ছিল না। জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কবীর জোলা, রবিদাস মুচি, ধনা জাঠ, সেনা নাপিত।

মতবাদের দিক দিয়েও তাঁর এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের পূর্ণ সমাদর রয়েছে। [৩] গুরু রামানন্দ উদার ছিলেন কিন্তু বিপ্লবী ছিলেন না। নিজের শিষ্যদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ তিনি স্বীকার করেন নি বটে, কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতেন। [৩]

মূর্ত্তিপূজার প্রতিও তাঁর কোনো আস্থা ছিল না মনে হয়। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থ-সাহেবে উদ্ধৃত গুরু রামানন্দের একটী বাণীর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারায়'। তাতে রামানন্দ

---

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৫০।

২ Vaisnavism Saivism and Minor Religious Systems P. P. 66, 67.

৩ ডাঃ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ৯৮।

বলেছেন—"কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয় মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।"[১] তবে তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ও ছিলেন না।

গুরু রামানন্দ জীবে ব্রহ্মে ভেদ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করতেন কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এসব মানতেন না।[২] গুরুর উদার শিক্ষার এটি আর একটি নিদর্শন।

গুরু রামানন্দের শিক্ষা, তাঁর সাধনার প্রধান কথা হল ভক্তি; মুক্তিলাভের ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগতি, অহৈতুক প্রেম, বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ এই ভক্তির লক্ষণ। সাধনার ক্ষেত্রে এই যে ভক্তিকে মুখ্য করে তোলা এইটিই রামানন্দের প্রধান দান।[৩] এই জন্যই বোধ হয় বলা হয়—

"ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড ॥"

দ্রাবিড়ে উৎপত্তি হ'ল ভক্তির, তাকে নিয়ে এলেন রামানন্দ আর কবীর তাকে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রচার করলেন। এর মানে হ'ল, ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করা হয়। রামানন্দ সেই মতটিকে প্রথমে উত্তর-ভারতে প্রচার করলেন আর তাঁর শিষ্য কবীর তাঁকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। গুরু রামানন্দ আর একটি বড় কাজ করেন। আলোয়ারদের মত তিনিও জনসাধারণের ভাষায় তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন।

আচার্য্য রামানুজের উপাস্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও শ্রী। তবে পরবর্তী কালে রামানুজ সম্প্রদায়ে রামও উপাস্য হন। গুরু রামানন্দের উপাস্য রাম। রাম যে নারায়ণ, তিনি যে বিষ্ণুর অবতার এ বিশ্বাস খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকেই প্রচার লাভ করেছিল।[৪] তবে রামের উপাসনা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়।[৪]

আমরা দেখেছি, গুরু রামানন্দের উপাস্য ছিলেন রাম। তিনি দীক্ষা দিতেন রামমন্ত্রে। যে-ভক্তি গুরু রামানন্দের প্রধান দান তা এই রামের

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৫২।

২ ডাঃ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ৯৮।

৩ Kabir and his Followers P. 4.

৪ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems P. 47.

প্রতি ভক্তি। গুরু রামানন্দের আগেও রামকে উত্তর ভারতে বিষ্ণুর অবতার বলে মানা হ'ত। কিন্তু তাকে পরাৎপর পরব্রহ্ম বলে গণ্য করা হ'ত না। রাম যে ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এ কথা গুরু রামানন্দই প্রচার করলেন উত্তর ভারতে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "রামানন্দ যদিও প্রচলিত রাম নাম ব্যবহার করিয়াছেন তবু তাঁর ঈশ্বর এক, প্রেমময়, নিরঞ্জন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন; তিনি মনের মানুষ প্রেমের বন্ধু।"

গুরু রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম কবীরদাস। তিনি গুরুর কাছ থেকে পেলেন এই রামমন্ত্রে দীক্ষা। কবীরদাসের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে যেমন নানা গল্প প্রচলিত হয়েছে তেমনি তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে।

কবীরদাস ছেলেবেলা থেকেই কেমন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সংসারের কাজকর্মে তাঁর মন বসে না। কাশীতে নানা সম্প্রদায়ের বহু সাধুর বাস। কবীরদাস এইসব সাধু-সন্তদের সঙ্গ করে বেড়ান। হিন্দু সাধুদের সঙ্গ করার ফলে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেবেন বলে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কে দেবে তাঁকে দীক্ষা? মুসলমান জোলার ছেলেকে কোন্ হিন্দুগুরু দীক্ষা দেবেন? কবীরদাস ভেবে আকুল হলেন। গুরু রামানন্দের তখন খুব নাম। তাঁর উদারতার কথা সবার মুখেমুখে। কবীরদাস স্থির করলেন গুরু রামানন্দের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবেন। কিন্তু সরাসরি গুরুর কাছে যেতে ভরসা পেলেন না। যতই উদার হোন না কেন গুরুজী, মুসলমানের ছেলেকে দীক্ষা দেবেন এ কথা ভাবতেও সাহস করলেন না কবীরদাস। অথচ দীক্ষা নেবার জন্য তাঁর প্রাণ ছট্‌ফট করছে। দীক্ষা তাঁকে নিতেই হবে, যেমন করেই হোক্ না কেন। নৈলে তিনি বাঁচবেন না। কিন্তু উপায় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে কবীরদাস এক উপায় স্থির করলেন। কৌশলে নিতে হবে দীক্ষা।

রাতের শেষে যখন ভোরের আলো শিউরে উঠে পূব আকাশে তখন গুরু রামানন্দ যান গঙ্গাস্নানে। কবীরদাস গিয়ে তাঁর স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে রইলেন অন্ধকারে। গুরু রামানন্দ প্রতিদিনকার মত নিশ্চিন্ত মনে জলে নাবছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে কিসের উপর পা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অভ্যস্ত ইষ্টনাম—রাম রাম রাম, এ কার গায়ে পা দিলাম গো, আহা বেচারা!

হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন কবীরদাস। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

তিনি পেলেন দীক্ষা। গুরুজীর পায়ের কাছে মাথা রেখে বললেন—প্রভু, আমি আপনার অধম সেবক, আপনি আমার গুরু। আজ আমাকে আপনি কৃপা করে দীক্ষা দিলেন।

বিস্মিত হ'লেন গুরু। বললেন, সে কি বাপু! কবীরদাস বললেন, গুরুজী, আমার অনেক দিনের সাধ আপনার কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মুসলমানের ছেলে আমি। আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন এতটা আশা করতে সাহস হ'ল না। তাই আপনার স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে ছিলাম। মনে আশা ছিল অন্ধকারে আমার গায়ে পা ঠেকলেই আপনার মুখ দিয়ে ইষ্টনাম বেরিয়ে আসবে আর তা হ'লেই আমার আশা পূর্ণ হবে। আপনার পাদস্পর্শে আজ আমি ধন্য হয়েছি। পেয়েছি দীক্ষা। সব শুনে পরম প্রীত হলেন গুরু। কবীরদাসকে শিষ্য বলে স্বীকার করলেন। পণ্ডিতেরা অনেকেই কিন্তু এই গল্প বিশ্বাস করেন না। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন [১] "এ সব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মানিয়া চলেন নাই বলিয়া তাঁর নূতন পন্থের আরম্ভ। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজবিধি অনুসারে বর্জনীয়।"

গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষার গুণে তাঁর শিষ্যদের অনেকের মধ্যেই ধর্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ উদারতা দেখা যায়। অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। অন্য সম্প্রদায়ের এমন কি ভিন্ন ধর্মের সাধু-সন্তদের সঙ্গেও তাঁরা অবাধে মেলামেশা করতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন, আবশ্যক মত উপদেশ গ্রহণ করতেন তাঁদের কাছ থেকে। এ বিষয়ে গুরু রামানন্দ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শিষ্যদের বিশেষ সহায়তা করেছেন। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তাঁর প্রধান বার [২] জন শিষ্যকে নিয়ে তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন, সাধুসঙ্গ করতেন, মায়াবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করতেন এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে মন্ত্র দিতেন। [৩]

---

১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৪, ৬৫।

২ ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে গুরু রামানন্দের প্রধান শিষ্য ১৩ জন। তার মধ্যে একজন নারী, নাম পদ্মাবতী। গুরু ১২ জন পুরুষ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যেতেন। তাঁদের নাম—অনন্তানন্দ, সুরসরানন্দ, সুখানন্দ, নরহরীয়ানন্দ, যোগানন্দ, পীপা, কবীর, ভাবানন্দ, সেনা, ধনা, গালবানন্দ ও রাইদাস।

৩ Vaisnavism, Saivism and Minor Rel'gious Systems P. 67.

কবীরদাস যে জোলাদের মধ্যে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তা ছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই নানা সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তদের সঙ্গ করার ফলে কবীরদাসের মন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছিল। এর উপর, তিনি পেলেন গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষা ও মহৎ সান্নিধ্য। ফলে সকল রকমের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী তিনি অতিক্রম করে গেলেন।

এই জন্য, এক দিকে যেমন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে অনাচারী ধর্মহীন পাষণ্ড বলে গালাগাল দিত, তেমনি অন্য দিকে আবার উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে আপন বলে দাবি করত। কবীরদাসের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে হিন্দুরা যেমন নানা কাহিনী রচনা করেছেন, তেমনি করেছেন মুসলমানেরা।

কবীরদাসের গুরু সম্বন্ধেও হিন্দু মুসলমানের মত ভিন্ন। হিন্দুরা বলেন, কবীরদাস গুরু রামামন্দের শিষ্য আর মুসলমানেরা দাবি করেন সেক তক্কিসাহেব ছিলেন তার পীর।[১] কোনো কোনো পণ্ডিত উভয় মতের সামঞ্জস্য করেন এই ভাবে। তাঁরা বলেন, সম্ভবত যৌবনে কবীরদাসের উপর প্রভাব পড়েছিল গুরু রামানন্দের তার পরে তিনি সেখ তক্কি সাহেবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন।[২] কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই গুরু রামানন্দকেই কবীরদাসের গুরু বলে স্বীকার করেন। আর স্বয়ং কবীরদাসের পদেই এ কথার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অসার বাহ্যাচারসর্ব্বস্বতা, জ্ঞানমার্গীদের শুষ্ক তর্কজাল, যোগপন্থীদের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতা, বিভিন্ন ধর্মের নানা পরস্পরবিরোধী মতবাদ যখন কবীরদাসের সহজেই ভগবদ্‌বিশ্বাসী চিত্তকে দুঃখে দ্বন্দ্বে অভিভূত করে দিচ্ছিল, যখন পথ না পেয়ে তাঁর ভগবদ্‌মুখী হৃদয় যাতনায় ছটফট করছিল তখনই এলেন গুরু রামানন্দ। "কবীর বলছে: রামানন্দকে যেই গুরু পেলাম অমনি সদ্‌গুরুর প্রতাপে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব মিটে গেল, মিটে গেল সব দ্বিধা।"[৩]

তবে গুরু রামানন্দের মত উদার গুরুর শিষ্য এবং স্বয়ং স্বভাব-উদার কবীরদাসের পক্ষে সেখ তক্কি সাহেবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করা খুবই

১ Kabir and his Followers P. 37.

২ ঐ পৃঃ ৩৮।

৩ ডাঃ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ১৪১।

সম্ভবপর। বস্তুতঃ, কবীরদাস যে রকম উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাতে তিনি যে বহু সাধুসন্তের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন তা অনুমান করতে পারা যায়। এটি নিন্দার কথা নয়, গৌরবেরই কথা। মহৎ যাঁরা তাঁরা যাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছুও শিক্ষা করেন তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করেন। ভাগবতের একটি উপাখ্যানে আছে গুরু অসংখ্য। এমন কি বেশ্যা, ইষুকার, মৌমাছি এদেরও গুরু বলে ধরা হয়েছে। কবীরদাসের জীবনেও আমরা এমনি মহত্বের পরিচয় পাই। কথায় আছে, 'গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য না মিলে এক।' কবীরদাস ছিলেন এমনি দুর্লভ শিষ্য। অবশ্য, গুরু রামানন্দও ছিলেন দুর্লভ গুরু। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "তিনি রামানন্দের কাছে নব চেতনা লাভ করিলেন; তাঁর কাছে ধর্ম সাধনা গ্রহণ করিলেন; জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কিছুরই ধার ধারিলেন না। সকল কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।" [১]

[১] ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৪, ৬৫।

কবীরদাস যে সব ধর্মসম্প্রদায় তথা সাধু-সন্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁর রচনায় তাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় নানা ভাবে। হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও নাথ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সাধু, সন্ত, যোগী, গোরখ (গোরক্ষনাথ), পাঁড়ে, অবধূত, পণ্ডিত, মোল্লা, কাজি এঁদের সম্বোধন করে তিনি পদ রচনা করেছেন, এঁদের উল্লেখ করেছেন বহু পদে।

ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন,[১] এই ধরণের এক এক সম্বোধনের এক এক বিশেষ প্রয়োজন বা অর্থ আছে। কবীরদাস যে পদে নিজেকে অথবা সন্ত বা সাধুকে সম্বোধন করেছেন, সেই পদে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত যারা মানত তাদের তিনি সন্ত বা সাধু বলতেন। আর যে পদ তিনি পাঁড়ে, অবধূ, 'জোগিয়া', মোল্লা বা এমনি কাউকে সম্বোধন করে রচনা করেছেন, তাতেই উক্ত ব্যক্তির ভাষায় তারই যুক্তির অনুসরণ ক'রে তার মত খণ্ডন করেছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবীরদাস এই সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কবীরদাস যে জোলা-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন তাঁরা মুসলমান হওয়ার আগে ছিলেন নাথপন্থী। নাথ-ধর্মের প্রধান সাধনা যোগ। যোগ অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে "আর্য্যদের ভারতে আসবার পূর্বে প্রাচীন অনার্য্য ভারতীয়দের মধ্যে যোগ প্রচলিত ছিল। মহেন-জো-দারো ও হারাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে তা প্রমাণ হয়েছে।" [২] ভারতের সব কটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বহিরাগত সুফী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগমত প্রচলিত হয় এবং সম্ভবতঃ মূল এক হওয়ায় সম্প্রদায়ভেদেও এই মতের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

যোগের আছে বিভিন্ন প্রকারভেদ। তবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে যোগটি সাধারণ ভাবে প্রচলিত, তা হঠযোগ। এই হঠযোগই নাথপন্থীদের প্রধান সাধনা। হঠযোগকে সাধারণতঃ রাজ যোগেরই অঙ্গ বলে গণ্য করা

---

১ কবীর পৃঃ ২২

২ ডাঃ শহীদুল্লাহ রচিত প্রাচীন বাংলা লেখকগণ, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুণ, ১৩৫৪

হয়। অবশ্যি, গোঁড়া হঠযোগীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে হঠযোগ স্বতন্ত্র। মনে হয়, গোড়ায় হঠযোগের উদ্দেশ্য ছিল কায়াসাধন অর্থাৎ শরীর ও মনের বিশুদ্ধি। পরে নাথপন্থীরা কায়াসাধনের দ্বারাই মুক্তি হয় মনে করতে লাগলেন। [১] নাথপন্থীদের মতে মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ হঠযোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শাস্ত্রগ্রন্থে সাধারণতঃ প্রাণ-নিরোধ-প্রধান সাধনাকে হঠযোগ বলা হয়।[২] বাচস্পতি-অভিধানের মতে হঠযোগ হ'ল প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়াভ্যাসজাত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হ'লে সমাধি হয়। এইটি হঠযোগের চরমাবস্থা। এই অবস্থায়ই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে। হঠযোগীরা অবশ্য হঠযোগের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন অন্য রকম। নাথপন্থীদের গ্রন্থ 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি' বলেন—

> হকারঃ কথিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
> সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাৎ হঠযোগ নিগদ্যতে॥

সূর্য্যকে হ বলা হয়, চন্দ্রকে ঠ বলা হয়। সূর্য্য আর চন্দ্রের যোগকেই হঠযোগ বলা হয়। এর দু'রকম ব্যাখ্যা আছে। এক—সূর্য্য অর্থ প্রাণবায়ু আর চন্দ্র অপানবায়ু। এই দুয়ের যোগ অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ু নিরোধের নামই হঠযোগ। দুই—সূর্য্য অর্থ ইড়া নাড়ী আর চন্দ্র পিঙ্গলা। এই উভয়কে রুদ্ধ করে সুষুম্না নাড়ী দিয়ে প্রাণবায়ুকে সঞ্চারিত করার নাম হঠযোগ।[২]

যোগসাধনা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হ'লেই যোগীর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতালাভ হয়।

হঠযোগ সাধনা গুরুগম্য। এই জন্য হঠযোগীদের কাছে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ। তাই নাথপন্থীদের কাছেও গুরুর বাড়া কেউ নেই। যোগের আছে পরিভাষা। যাঁরাই যোগ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন, তাঁরাই সাধারণতঃ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এই পরিভাষা সকল সম্প্রদায়েই প্রায় একরূপ। কাজেই এই পরিভাষার সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলে যে-

---

১ কবীর পৃঃ ৪৭

২ ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকৃত নাথসম্প্রদায় পৃঃ ১২৩

কোনো সম্প্রদায়ের যোগের কথা মোটামুটি বুঝার পক্ষে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

মুসলমান হয়ে যাবার পরও বেশ কিছুকাল জোলাদের মধ্যে নাথধর্মের প্রভাব পুরোমাত্রায় ছিল এবং জোলাদের যখন ঐ রকম অবস্থা তখনই কবিরদাসের আবির্ভাব হয়, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই দেখা যায়, কবীরদাস যোগমতের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অবশ্যি এই মতের উপাসক ছিলেন না। তবে পরিবেশের প্রভাব যে তাঁর উপর যথেষ্টই পড়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষা, তাঁর যুক্তি, তাঁর তর্কশৈলী এই সবের উপর যোগমতের প্রভাব স্পষ্ট।[১]

জোলাদের কথা বলার সময় পরোক্ষভাবে যোগীদের কথা খানিকটা বলা হয়েছে। এখানে আমরা এঁদের কথা আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। তার কারণ, কবীরদাসের উপর যে সব সাধুসন্তের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল, তাঁদের প্রধাণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,এক—যোগী, দুই—ভক্ত। কবীরদাস মানুষ হয়েছিলেন যোগমতের পরিবেশের মধ্যে আর স্বয়ং ছিলেন ভক্ত। কাজেই তাঁকে জানতে হলে আগে এঁদের পরিচয় লওয়া দরকার।

যোগীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর একান্ত নির্ভর নিজের উপর, নিজের উপরই তাঁর যত ভরসা। তিনি কঠোর জ্ঞানমার্গী, যুক্তি-তর্কের ক্ষুরধার পথে তিনি চলেন। পিণ্ডকেই মনে করেন ব্রহ্মাণ্ড। দৃঢ় নিঃশঙ্কতা এবং এক বেপরোয়া ভাব যোগীর মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কেন না, যোগের প্রথম কথাই হ'ল 'নির্মমতা' আর 'অমায়িকতা'। প্রেম যোগীর কাছে দুর্বলতা মাত্র। নিজের জ্ঞানের এবং সাধনার গর্ব তাঁর খুবই। জাতিভেদ তিনি মানেন না। তাঁর কাছে মানুষই সকলের বড়। কিন্তু যে সব মানুষ যোগপন্থী নয়, তাদের চেয়ে যোগপন্থীদের তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

যোগের প্রথম সোপান ইন্দ্রিয়-সংযম, নিরাসক্তি ও কামনাহীনতা, সুখে-দুঃখে সমভাব, রাগ-ভয়-ক্রোধহীনতা ও নির্ভীকতা। যোগের পথ কঠিন সাধনার পথ। এই পথে ভাবালুতা অচল, চোখের জল ভীরুতার পরিচায়ক। যোগমতে মুক্তি দুর্লভ, কঠোর সাধনার ধন।

যোগের পথ প্রধানতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের পথ। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এ পথে চলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যোগীদের খুব

১ কবীর পৃঃ ২২

প্রভাব ছিল। তারা যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁদের ভয় করত, শ্রদ্ধা ভক্তি করত, তাঁদের মতের মাহাত্ম্য স্বীকার করত; কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে পারত না। যোগীরা যখন বলতেন, যোগসাধনা ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কথাকে তারা ধ্রুবসত্য বলে মনে করত আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন ভয়ে-নিরাশায় অভিভূত হয়ে পড়ত। যোগসাধনা যখন তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন তারা মুক্তির আর কোনো উপায়ই দেখতে পেত না। যোগ সাধারণের অন্তরে একটা শুষ্কতা, একটা নিরাশার ভাব এনে দিল। এই অবস্থায় অফুরন্ত আশার বাণী নিয়ে এলেন ভক্ত। বললেন, ভয় নেই—কোনো ভয় নেই। মুক্তি তো তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তার জন্য কোনো রকম কৃচ্ছ্রতা সাধনেরও দরকার নেই। শুধু মনে-প্রাণে ভগবানের নাম কর। ব্যস্, তা হ'লেই মুক্তি। কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণনাম বড়, রামের চেয়ে বড় রামনাম। নামই সাধন, নামেই সিদ্ধি। কলিযুগ সকল যুগের সেরা। এ যুগে মুক্তি হয়েছে এত সহজ। ভক্ত গৃহস্থকে করে তুললেন পুরো আশাবাদী।

ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম। তাই ভক্তির প্রভাবে সাধারণের জীবন হয়ে উঠল সরস, আশায় আনন্দে ভরপুর।

ভক্ত চলেন যোগীর উল্টো পথে। ভক্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভগবদ্‌বিশ্বাস, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা। ভগবানের পায়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেন। তাঁর আশা-ভরসা, বলবুদ্ধি সবই ভগবান। ভক্তের পথ প্রেমের পথ। যুক্তি-তর্কের তিনি ধার ধারেন না। নিজের বলতে কিছুই তাঁর নেই, সবই ভগবানের। কাজেই তাঁর কোনো অহংকারও নেই—জ্ঞানের নয়, কর্মের নয়, কিছুরই নয়। বরং তিনি নিজেকে অতিশয় অজ্ঞান মনে করেন আর বিশ্বাস করেন তাঁর দুর্বলতার জন্যই ভগবান তাঁকে কৃপা করবেন। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের জন্য তিনি মাথা ঘামান না; এ ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো অহংকার নেই। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবদ্‌সেবাতেই নিযুক্ত। কাজেই তাদের নিগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

ভক্ত বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ সবই মানেন অথচ শ্রেষ্ঠ বর্ণে জন্মালেও নিজেকে তৃণের চেয়েও নীচ মনে করেন। এই বিনয় ভক্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্ত নিজেকে অতি দীন-হীন পাপী মনে করেন আর তাঁর জন্য কেঁদে-কেঁদে ভগবানকে ডাকেন। বিশ্বাস করেন, চোখের জলে তাঁর সব মলিনতা ধুয়ে

যাবে আর অন্তর্যামী ভগবান তাঁর এই অনুতাপের কথা জেনে তাঁকে কৃপা করবেন, দেবেন মুক্তি। *

ভক্তের কাছে জগৎ ভগবানের লীলা-স্থল। তাঁর সাধনা ভাববিভোর প্রেমের সাধনা।

জনসাধারণের তথা কবীরদাসের উপরে উপরে-লিখিত যোগী ও ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়ে। কবিরদাস ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভক্তের মত ভাববিহ্বল মানুষ তিনি ছিলেন না। সংসারী জীবের দুঃখ-দুর্গতি দেখলেই তাঁর চোখে জল আসত না। তিনি বরং তাদের কড়া কথা বলে ধমকে দিতেন। কবীরদাসের চরিত্রের এই কঠোর দিকটা গড়ে ওঠে যোগীদের প্রভাবে। তিনি হয়ে উঠেন 'অক্‌খড়' §। যেখানে কোনো রকম অলসতা, আরামপ্রিয়তা, কোনো রকম দুর্বলতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হয়েছেন, তাঁর বাণী হয়েছে ক্ষুরধার।

সাধারণ ভক্তের মত কবীরদাস মুক্তিকে সহজলভ্য মনে করতেন না। তাঁর মতে মুক্তিসাধনা অত্যন্ত কঠিন। এতে অলসতা, আরাম বা দয়ার কোনো স্থান নাই। 'সুরত' আর 'নিরত'-এর শুষ্ক কঠোর উপদেশ তিনি দিয়েছেন মুক্তির জন্য। এখানেও কবীরদাসের উপর যোগীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তবে কবীরদাসের উপর যোগীদের প্রভাব যথেষ্ট পড়লেও তিনি যোগমার্গের অনুসরণ করেন নি বা যোগীদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন না। যোগমার্গ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি গভীর। তিনি এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই যোগীদের কোনো-কিছুই তাঁর কাছে লুকোনো ছিল না। ভক্তদের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকে তিনি যেমন আঘাত করেছেন, তেমনি আঘাত হেনেছেন যোগীদের দোষত্রুটি-দুর্বলতার উপর। যোগীকে তিনি সুতীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করেছেন, তাঁরই অস্ত্রে তাঁকে ঘায়েল

---

* আলোচ্য প্রসঙ্গের উপাদান প্রধানতঃ ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর কবীর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

§ 'অক্‌খড়' কথাটা হিন্দী। কথাটির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দীতে অক্‌খড় বলতে বুঝায় সেই মানুষকে যে তার নিজের সুচিন্তিত মত সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ়, কিছুতেই তার থেকে একটুও বিচলিত হয় না। যে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও বেপরোয়া, যে কারুর কোনো তোয়াক্কা রাখে না, যা সত্য বলে মনে করে স্পষ্ট ভাষায় তা বলে দেয়, আর কোথাও কোনো মিথ্যাচার দেখলে কঠিন ভাবে করে আঘাত।

করেছেন। কানে কুণ্ডল, হাতে নারকেল-মালা, গলায় ঝুলান ছোট শিঙা আর পরনে গেরুয়া কাপড় যোগীর এই সব বাইরের বেশভূষা থাকলেই সত্যিকারের যোগী হওয়া যায় না। অনেক ভণ্ড যোগী বাইরের বেশভূষা ধারণ করত কিন্তু অন্তরে একেবারেই যোগী ছিল না। কবীরদাস এদের খুব কশাঘাত করেছেন। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের যোগী যে, সে বাইরের বেশভূষার ধার ধারে না, যোগীর চিহ্ন মুদ্রা, নাদ, বিভূতি সে মনেই ধারণ করে, মনেই করে আসন, করে জপ-তপ, তার সাধনা মনের জিনিষ।[১]

যোগীদের ভারী অহংকার। তাঁরা যোগপন্থী ছাড়া অন্যদের নিতান্ত কৃপার পাত্র মনে করেন। কবীরদাস তাঁদের এই অহংকার চূর্ণ করেছেন তাঁদেরই যুক্তি দিয়ে তাঁদের কাবু করে। যোগীদের সাধনার চরম লক্ষ্য উন্মুনী সমাধি, সেখানে অক্ষর-পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খুব ভাল কথা। কিন্তু সমাধি যখন ভঙ্গ হয় তখন কি? তখন ত আবার সেই ভব-বন্ধন। এর উত্তর যোগীরা কি দেবেন?

কবীরদাসের পদে বার বার এসেছে 'অবধূ' কথা। ভারতীয় কয়েকটি উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবধূত বলতে বুঝায় সিদ্ধ তপস্বীকে। বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে যে পুরুষ আত্মাতেই অবস্থান করেন, সেই অতিবর্ণাশ্রমী যোগীকে বলে অবধূত।[২] তান্ত্রিকদের মতে অবধূত চার রকমের—শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, ভক্তাবধূত। ভক্তাবধূত আবার দু'রকমের—পূর্ণ ভক্তাবধূত, এঁকে বলে পরমহংস আর অপূর্ণ ভক্তাবধূত, এঁকে বলে পরিব্রাজক। সংসারাসক্তিশূন্য বর্ণাশ্রমচিহ্নহীন গৃহস্থকেও অবধূত বলে।[৩]

কবীরদাসের 'অবধূ' কিন্তু এঁদের কেউ নয়। তাঁর অবধূ গোরখপন্থী সিদ্ধ যোগী; কোনো কোনো স্থলে তিনি পরিষ্কার গোরখনাথকেই অবধূ বলেছেন।[৪] অবধূ সিদ্ধযোগী। সাধারণ যোগী থেকে তিনি স্বতন্ত্র। কবীরদাসও তাই মনে করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই অবধূ আর যোগী আলাদা বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] কবীরদাসের অবধূ আদর্শ যোগী। তাঁর

---

১ কবীর গ্রন্থ, পদ ২০৩

২ ভাগবত ৩।১।১৯

৩ বঙ্গীয় শব্দকোষ

৪ কবীর পৃঃ ২৮

৫ ঐ পৃঃ ৩০

একটি পদে এঁর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে এই কথাই মনে হয়।[১] তিনি বলেছেন, 'অবধূ যোগী জগৎ থেকে আলাদা। ইনি যোগীর চিহ্ন মুদ্রা, স্থরতি, নিরতি আর শৃঙ্গ ধারণ করেন, নাদের দ্বারা ধারাকে খণ্ডন করেন না, গগন-মণ্ডলে এঁর বাস, দুনিয়ার দিকে ইনি তাকানও না। চৈতন্যের চৌকীর উপর ইনি বসে আছেন। আকাশে উঠেও ইনি আসন ছাড়েন না, আর পান করতে থাকেন মধুর মহারস। যদিও প্রকটরূপে ইনি কাঁথা জড়িয়ে থাকেন তবু নিজের হৃদয়ের দর্পণে সব কিছু দেখতে থাকেন, নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছ'শ তাগাতে গিঁঠ দেন। ইনি ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেন নিজ কায়া, আর জেগে থাকেন ত্রিকুটী-সঙ্গমে। কবীর বল্‌ছে, এই যোগেশ্বর সহজ এবং শূন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন।'

এ রকম আদর্শ যোগীকেই কবীরদাস গুরু করতেও প্রস্তুত। তিনি বলেছেন[২]—ভাই অবধূ, যে যোগী আমার এই কথাটার একটা মীমাংসা করে দিতে পারবেন তিনি আমার গুরুঃ—এক গাছ দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু তার শিকড় নেই; তাতে ফুল ছাড়াই ফল হয়েছে; তার ডাল-পালা-পাতা কিছুই নেই, তবু সে আট দিকের আকাশ ঢেকে রেখেছে। এই গাছের উপর আছে এক পাখী, তার পা নেই তবু নাচছে, হাত নেই তবু তাল দিচ্ছে, জিহ্বা নেই তবু গান করছে। এই গায়কের কোন রূপ-রেখা নেই। তবে সদ্‌গুরু হ'লে একে দেখিয়ে দিতে পারেন। এই পাখী খুঁজছে মাছের পথ। কবীর বিচার করে বলছে পুরুষোত্তম ভগবান অপরংপার। বলিহারি যাই তাঁর এই মূর্ত্তির!

এর থেকে বোঝা যায়, সত্যিকারের সিদ্ধ যোগী যাঁরা তাঁদেরই প্রভাব পড়েছিল কবীরদাসের উপর। যোগমার্গের যা উত্তম, তাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

কবীরদাসের সময় যোগী ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তও অনেক ছিলেন। কাশীতে তাঁদের সবারই আস্তানা ছিল। কবীরদাস তাঁদের সবাইকে অল্প-বিস্তর জানতেন। তিনি স্বয়ং একটি পদে বলেছেন[৩]—'সেই সময়ে মুনি, পীর, দিগম্বর, যোগী, জংগম, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এরা ছিল কিন্তু সবাই

---

১ কবীর গ্রন্থ পদ ৬৯

২ ঐ পদ ১৬৫

৩ ঐ পদ ১৭৮

ঘুরে মরছিল মায়াচক্রে পড়ে।' কবীরদাসের সময় দেশে নানা রকমের ধর্মসাধনা প্রচলিত ছিল। কেউ বেদ পাঠ করত, কেউ উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়াত, কেউ থাকত নগ্ন হয়ে, কেউ দীন-হীন হয়ে ফিরত, কেউ দান-ধ্যান করত, কেউ সুরাপান করত, মন্ত্র-তন্ত্র ওষুধ-বিষুধের কেরামতি দেখাত, কেউ তীর্থ-ব্রত করত, কেউ ধূমপান করে করে (গাঁজা টেনে টেনে) শরীর কালি করত, কিন্তু কেউ-ই রামনামে লীন হয়ে থাকত না। [১]

কবীরদাসের সময়ে সত্যিকারের সাধু-সন্ত যেমন অনেক ছিলেন তেমনি ভণ্ড সাধুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই সব ভণ্ডেরা বাইরে ছিল ধর্মের ধ্বজাধারী বড় বড় মহান্ত কিন্তু আসলে ছিল অত্যন্ত হীন-চরিত্রের মানুষ। কবীরদাস একটি পদে [২] এদের লক্ষ্য করে বলেছেন—এমন যোগ ত দেখিনি রে, ভাই, মহাদেবের নামে চালাচ্ছে সম্প্রদায়, নিজেদের বড় বড় মহান্ত বলে জাহির করছে, হাট-বাজারে সমাধিস্থ হচ্ছে আর সুযোগ পেলেই কামান-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। কবে কোন্ সাধু এমনি আক্রমণ করেছেন শুনি? দত্তাত্রেয় কবে ভেঙ্গেছিলেন শত্রুর দুর্গ? শুকদেব কবে দেগেছিলেন কামান? নারদ কবে চালিয়েছিলেন বন্দুক? ব্যাসদেব কবে বাজিয়েছিলেন রণভেরী? এই সব মন্দমতিরা লড়াই করে মরে। আজব সাধু এই সব মহান্ত। এদের লোভের অন্ত নেই। এদের সোনাদানার বাহার গৃহস্থের বেশভূষাকে লজ্জা দেয়। এদের হাতী-ঘোড়া-ঠাঁট কত। কোটিপতির মত এদের চাল।

তখন জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা হিন্দুধর্মের সব চেয়ে বেশী প্রভাব ছিল। বিশেষ করে কাশীর জনসাধারণ প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। ছেলেবেলা থেকেই কবীরদাস এদের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কাজেই হিন্দুধর্মের পূজা-আর্চা, আচার-অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। সাধারণের মধ্যে ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানটাই ছিল। তারা ধর্মের মূল তত্ত্ব বা মর্ম জানত না, অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন আচার ও প্রথার অন্ধ অনুসরণ করে চলত। অনুমান হয়, কবীরদাসেরও হিন্দুধর্মের এই দিকটার সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তার বাহ্যাচারের পিছনের তত্ত্বের দিকটা তিনিও জানতেন মনে হয় না। তাই, হিন্দুধর্মকে তিনি আচার-সর্বস্ব একটা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র মনে করতেন। সেই ভাবেই তিনি তাঁর পদে এই ধর্মের উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মের তত্ত্বের

---

১ কবীর গ্রন্থ পদ ৩৮৬

২ বীজক, ৬৯, রমৈণী,

দিকটা জানতেন না বলে কবীরদাসের এর প্রতি কোনো শ্রদ্ধাও ছিল মনে হয় না। সেইজন্য তাঁর পদে কোথাও হিন্দুধর্মের মর্মের দিকটা জানবার ইচ্ছারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

কবীরদাসের পরিচিত হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি পণ্ডিত আর পাঁড়ে। অনেক পদ তিনি পণ্ডিত বা পাঁড়েকে সম্বোধন করে রচনা করেছেন। হিন্দুধর্মের বিবিধ বিষয় নিয়ে তাদের প্রশ্ন করেছেন। পূজা-আর্চা, তীর্থ-ব্রত, জাতিভেদ, জন্মান্তর, স্বর্গ-নরক, চতুর্বর্গ ফল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং এই সম্বন্ধে প্রচলিত মত ও বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন। এই সব প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বোঝা যায় এই সব বিষয়ের কোনো সদুত্তর যে থাকতে পারে, তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। কবীরদাসের পদোক্ত পণ্ডিত নামেই পণ্ডিত; তার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীরদাস তাকে নেহাৎ বোকা ও ভণ্ড গোঁয়ার মনে করতেন। কবীরদাসের ধারণা ছিল, সত্যিকারের ধর্ম কি তা সে জানে না; তার তত্ত্বজ্ঞান নেই, আত্মজ্ঞান নেই, এমন কি ন্যায়-অন্যায়-বিচার-বোধও নেই। কবীরদাসের পাঁড়েও তথৈব চ। সেও একটি নিরেট বোকা এবং ধর্মের নামে ঘোর অধর্মাচারী। তিনি একটি পদে ত পাঁড়েকে সোজাসুজি নিপুণ কসাই বলে গাল দিয়েছেন।

কবীরদাসকে এর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি হিন্দু সমাজের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন বা জন্মেছিলেন। কাজেই দূরের থেকে বাইরের দিকটাই তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি তার বাহ্যানুষ্ঠানটাই লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দু জনসাধারণও ধর্মের এই বাহ্যানুষ্ঠানগুলোকেই ধর্ম বলে মনে করত, তার বেশী কিছু তারাও জানত মনে হয় না। কবীরদাস এদের দেখেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারণা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের পিছনের তত্ত্ব যেসব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জানা ছিল, কবীরদাসের মত একটি নিরক্ষর জোলার ছেলের পক্ষে তাঁদের কাছ থেকে তা' জানা সম্ভবপর ছিল না। আর তা ছাড়া, তাঁর সে রকম ইচ্ছাই বোধ হয় নি। কেন না, এই সব বাহ্যাচারের পিছনে যে কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, তা তিনি মনেও করেননি। তার কারণ, তিনি যে যোগমতের আওতায় মানুষ হয়েছিলেন, সেই মত অনুসারে হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারগুলো অত্যন্ত অসার বাজে জিনিষ। নাথপন্থী যোগীরা হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানগুলোকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন এবং নানা যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। শুধু

নাথপন্থী কেন, বেদবাহ্য সব ধর্মেই হিন্দুধর্মের এই বাইরের দিকটাকে আঘাত ক'রে এর অসারতা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, কবীরদাস ত অনেক খাঁটি হিন্দু সাধু-সন্তের সঙ্গও করেছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিলেন হিন্দু গুরুর কাছ থেকে; কাজেই হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানগুলির পিছনে কোনো তত্ত্ব আছে কি না তা ত তিনি তাঁদের কাছ থেকে অনায়াসে জানতে পারতেন। জানেন নি কেন? আমরা আগেই বলেছি, এই সব বাহ্যাচারের পিছনে যে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে তা তাঁর মনেই হয়নি। সেই জন্য তিনি ওদিকে কোনো চেষ্টাই করেন নি। আর তা ছাড়া আমাদের মনে হয়, সাধু-সন্তদের কাছ থেকে ঈশ্বরের কথা, প্রেমভক্তির কথা, পরমার্থজ্ঞানের কথা এই সবই তিনি শুনতে চাইতেন, আচার-অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শুনবার কথা তাঁর মনেই হ'ত না। যে মানুষ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, সে ঈশ্বরের কথাই শুনতে চায়, অন্য কিছুর দিকে তার মন যায় না।

নিছক বাহ্যানুষ্ঠানই যখন ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় তখন সত্যিকারের ধর্ম লোপ পায়। বাহ্যানুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করা মোহ। মোহ দূর না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ নেই। তাই কঠিন আঘাত হেনে এই মোহ দূর করতে হয়।

পরমার্থবিদ্ সিদ্ধ সাধু-সন্তেরা চিরকাল এ কাজ করেছেন। ধর্মের বেশে মোহ এসে যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই কঠিন আঘাত হেনে তাঁরা সে মোহ ভেঙ্গেছেন। আচারের মরু-বালিতে যখন মানুষের প্রেমভক্তির ধারা লুপ্ত হ'তে চলেছে, তখনই তাঁরা সহজ পথ কেটে তাকে নূতন খাতে বহিয়ে দিয়েছেন।

কবীরদাসও তাই করেছিলেন। নিপুণ কসাই পাঁড়েকে আর বোকা পণ্ডিতকে তিনি যে কশাঘাত করেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল। জীর্ণ বাহ্যাচারের শৈবালদামে হিন্দুধর্মের সত্যিকারের জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আঘাত হেনে তাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন কবীরদাস। প্রেম-ভক্তির বিমল স্রোতে এই সব মিথ্যা আবর্জনা তিনি ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

শুধু হিন্দুধর্মের বেলাই যে কবীরদাস এ রকম করেছিলেন তা নয়, যে কোন ধর্মের বাহ্যাচার-সর্বস্বতাকে তিনি আঘাত করেছেন। পণ্ডিত ও পাঁড়ের মত কাজী ও মোল্লার উপরও তিনি এক হাত নিয়েছেন। ওদেরও

তিনি নিতান্ত মূর্খ এবং অপদার্থ মনে করতেন। মুসলমানধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানকেও তিনি ছেড়ে কথা কন নি। সুন্নত, কোরবানি, আজান—এ সবের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মনে হয়, মুসলমানধর্মেরও গভীর তত্ত্বের দিকটা কবীরদাসের জানা ছিল না। যে জোলা পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, অনুমান হয়, তারাও ধর্মের বাহ্যাচারের দিকটাই জানতেন। আর পরম্পরাক্রমে আগত ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের যে বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কবীরদাস মানুষ হয়েছিলেন, তারই জন্য হিন্দুধর্মের ন্যায় মুসলমান-ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের পিছনে যে কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, তা বোধ হয় তাঁর মনেই পড়েনি।

কবীরদাস যে পরম সত্য লাভ করেছিলেন, ধর্মের যে সার মর্ম জেনেছিলেন তা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; কোনো বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা তা রাখত না। কবীরদাস যে সাম্প্রদায়িকতা, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করতেন, তার কারণ এ সব হয়ে উঠেছিল সেই পরম সত্যের বিরোধী। সেই সত্য অনন্যা ভক্তি। কবীরদাসের কাছে ভক্তির চেয়ে বড় আর কিছুই ছিল না। তাঁর কাছে ধর্মের সার কথা ছিল ভক্তি। তিনি এই ভক্তির দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করতেন। যা-কিছু এই ভক্তির বিরোধী বা ভক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, কবীরদাস তাকেই আঘাত করেছেন, সহজ যুক্তি দিয়ে তাকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। নতুবা শুধু সংস্কার বা বাহ্যাচার বলেই কোন-কিছুর তিনি খণ্ডন করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, যেখানে সত্যিকারের ভক্তি দেখা দেয় সেখানে অর্থহীন সংস্কার, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি থাকতে পারে না। ভক্তের কাছে এ সবের কোনো মূল্যই নেই।

কবীরদাসের কাছে ভক্তের বড় আদর ছিল। সদ্‌গুরুর কৃপায় যথার্থ ভক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। তাই যথার্থ ভক্তকেও তিনি খুঁজে বের করতে পারতেন। এ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে ধোঁকা দিতে পারত না। ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা কূট তর্ক, জ্ঞানের বড়াই, নানা রকমের বেশভূষা, ভেক, ভক্তির ভান কিছুতেই তাঁকে ভুলাতে পারত না। তিনি স্বয়ং খাঁটি ভক্ত ছিলেন ব'লে কোনো রকম মেকি তাঁর কাছে চলত না।

গুরুকৃপায় যথার্থ ভক্তের তিনি সঙ্গলাভ করেছিলেন, দেখেছিলেন তাঁদের মাহাত্ম্য। তিনি দেখেছিলেন সত্যিকারের ভক্ত যিনি তাঁর মধ্যে কোনো

ভেদবুদ্ধি নেই, কোনো সংকীর্ণ মনোভাব নেই। যে যে-ভাবেই ভগবানকে ডাকুক না কেন, ভক্তি থাকলে ভগবান তাতেই সাড়া দেবেন। সব নামই ভগবানের নাম ; সব পথই তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।

তাই দেখি, ভক্ত কবীরদাস সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার তিনি উর্দ্ধে। রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করীমের মধ্যে তিনি কোনো ভেদ স্বীকার করেন না। ভক্তের কাছে ভগবান একই। যে যে-নামে ডাকুক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি কবীরদাসের এক দিকে যেমন সত্যিকারের সাধু-সন্ত অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তেমনি অংসখ্য ভণ্ডের সংস্পর্শেও তাঁকে আসতে হয়েছিল। এদের কেউ বা উদাসী সাধু কেউ বা গৃহী। বাইরের দিক দিয়ে ধর্মের ভড়ং এদের ষোল আনাই ছিল। বেশভূষা, ভেক, জটা, বিভূতি, ফোঁটা-তিলক, পূজা-আর্চা, রোজা-নামাজ কিছুরই অভাব ছিল না এদের। চিরকাল যেমন হয়, খাঁটির চেয়ে মেকির সংখ্যা বেশী। কবীরদাসের সময়েও তাই ছিল। এই সব মেকিকে সুযোগ পেলেই তিনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর বাণী সব চেয়ে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

আর এক দল লোক ছিল তারা ভণ্ড নয়, ভ্রান্ত। কবীরদাস তাদের প্রতি ততটা নিষ্ঠুর হন নি। তিনি তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন কখনও ব্যঙ্গচ্ছলে কখনও বা যুক্তি দিয়ে।

কোটি কোটি জীব আসে সংসারে, নানাভাবে বিচরণ করে কিছুকাল, তারপর কোথায় চলে যায়। যাঁরা জন্মান্তর মানেন, কর্মবাদ মানেন, তাঁরা বলেন শুধু কি এই সংসারে, লোকে লোকান্তরে কত না যোনির মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জীব। জীবের সেরা মানুষ। তারাও এই যাওয়া আসার স্রোতের টানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার জন্য তার বুদ্ধিকে সে কতভাবেই না ব্যবহার করছে; ভোগবিলাসের কত উপকরণ পুঞ্জীভূত করে তুলছে আবার সময় হ'লে সব ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে এহেন বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেও খুব কম লোকেরই মনে জাগে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের মধ্যেও আবার কম লোকেরই মন সেই জিজ্ঞাসার অনুসরণ করে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করেন এমন লোকের সংখ্যা আরও কম। অবশ্য বিপদে পড়লে বা সুখ-সম্পদের আশায় কতক লোক ভগবানের ভজনা করে। তবে যে কারণেই ভগবানের দিকে মন আকৃষ্ট হোক না কেন অধিকারী ব্যক্তিরা বলেন একমাত্র জন্মার্জিত পুণ্যফল থাকলেই তা সম্ভবপর হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেছেন[১]—"আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চার রকমের পুণ্যবান ব্যক্তিরাই ভগবানের ভজনা করেন।" এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা পরম ভাগ্যবান তাঁরাই ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ"। [২]

তারপর সেই লতা বাড়তে বাড়তে

"কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।"[২]

ভক্তের কাছে এই প্রেমফলের বাড়া আর কিছু নেই, এই তাঁর জীবনের পরম পুরুষার্থ।

এই ত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥" [২]

---

১ ৭ম। ১৬

২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য। ১৯ পরিচ্ছেদ

ধর্ম অর্থ কামের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল ভক্তের কাছে মোক্ষ ও তুচ্ছ। ভক্ত চান শুধু প্রেমভক্তি আর কিছু নয়। নারদ পঞ্চরাত্র এই প্রেমভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন [১]—

অনন্যমমতাবিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।

—ভগবানের প্রতি অন্যবিষয়ক-মমতাশূন্য প্রেমপরিপ্লুত যে মমতা তাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ- উদ্ধব এবং নারদ প্রেমভক্তি বলেন।

ভক্ত কবীর ও এই প্রেমভক্তিকেই সকলের বড় বলে মনে করেছেন। তাঁর কাছে ও প্রেমই পরম সাধন, চরম সিদ্ধি। ধর্মের ক্ষেত্রে মতভেদের অন্ত নেই। অসংখ্য মত, অসংখ্য পথ। প্রত্যেকেই নিজের মত, নিজের পথটাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাই অন্যের সঙ্গে বাধে লড়াই। 'যোগী, যতী, তপস্বী, সন্ন্যাসী, এরা সব আপনা আপনি লড়াই করে মরে। অথচ পূর্ণ ব্রহ্ম যিনি তাঁর রহস্য জানতে পারে না।' এ রকম স্থলে কবীরদাস বলেন সহজ কথা। তাঁর মতে 'যার প্রেম জন্মে সেই উদ্ধার পায়।' [২] নইলে শুধু বিবাদই সার হয়।

কবীরদাসের চোখে জগৎ প্রেমময়, জীবন প্রেমময়। জগৎ জুড়ে অবিরত প্রেমের রাগিণী বাজছে। সেই সুরে মত্ত হয়ে জীবন-মৃত্যু, রাহু-কেতু, সমুদ্র-পর্বত, সারা দুনিয়া নাচছে, হাজার ভাবে এই প্রেমের স্পর্শ লাগছে কবীরের মনে আর সে আনন্দে নাচছে আর এতে আনন্দিত হচ্ছেন স্বয়ং স্রষ্টা। [৩]

কবিরাজ গোস্বামীর মত কবীরদাসও মনে করতেন এই প্রেম ভাগ্যবলেই লাভ করা যায়। সে সৌভাগ্য কি এক জন্মেই হয়? তা হয় না। কবীরদাস বললেন, যুগ-যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। [৪] কত জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষার পর এক দিন প্রভু কৃপা করেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, হৃদয়-মুকুল প্রস্ফুটিত হয়, ভরে উঠে প্রেমসুধায়।

যার অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করল। সংসারে তার সকল চাওয়া সকল পাওয়ার অবসান হয়ে গেল। মানুষ সংসারে এসে অবিরত সুখ-সম্পদের সন্ধানে ফিরে। সুখের আশায়

১ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য। ২২ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত
২ অনুদিত পদ ৪
৩ ঐ ৬
৪ ঐ ২৪

সে প্রাণপাত করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আশা পূর্ণ হয় না। সুখের তৃষ্ণা তাকে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে মারে। তার কারণ, যথার্থ সুখ কেমন করে পাওয়া যায় তা সে জানেই না। সুখ বলে যা সে খুঁজে মরে তা যে সুখাভাস মাত্র তা-ই সে বোঝে না। কবীরদাস এমনি ধরণের ভ্রান্ত মানুষকে যথার্থ সুখের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রভুকে পেলেই তবে যথার্থ সুখ পাওয়া যায়।[১] আর তাঁর মতে এই সুখ পেতে হ'লে চাই প্রেম, চাই বৈরাগ্য।

সুখের তৃষ্ণা অফুরন্ত। সে তৃষ্ণা মিটাতে হ'লে চাই সুখের একটি সাগর। তাই, কবীরদাস বললেন, প্রেম ও বৈরাগ্যের পথে চললে পরেই এই পরম সুখ-সাগরের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কিন্তু এই প্রেম সহজ জিনিষ নয়। ঠিক তার উল্টো। প্রভুর প্রতি যার প্রেম জন্মাল ঘুচল তার সকল আরাম, আগুন লাগল তার তথাকথিত সকল সুখে। অসীম তার বেদনা। দুঃসহ তার বিরহ-দহন। সে-দহনে সে দিন-রাত ছটফট করে মরে। প্রিয়ের সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই; তার দিনে নেই স্বস্তি, রাতে নেই ঘুম। কিন্তু কঠিন সে মিলন।[৩] অন্য সব ছেড়ে কেবল মাত্র প্রিয়ের জন্য যখন সমস্ত দেহ-মন ব্যাকুল হয়ে কেঁদে ফিরবে, চাতক যেমন বারিবিন্দুর আশায় অনবরত মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চীৎকার করতে থাকে, প্রাণ গেলেও অন্য জল খায় না, তেমনি যখন প্রিয়-মিলন-পিয়াসী হয়ে অনবরত প্রিয় প্রিয় বলে ডাক্‌তে থাকবে, সতী যেমন করে পতিপ্রেমের কথা স্মরণ করে হাসতে হাসতে আরোহণ করে পতির চিতায়, তেমনি যখন প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজের দেহ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারবে তখন হয়ত হবে মিলন।

প্রেমের পরিচয় ত্যাগে। সকল ত্যাগের সেরা ত্যাগ আত্মত্যাগ। তাই, কবীরদাস বলছেন, পেয়ে যদি থাকিস, বন্ধু, তা হ'লে দিয়ে দে নিজেকে[১]। প্রেমের পরিণতি আত্মবিসর্জনে। প্রেমের ক্ষেত্রে 'আমি' নেই সব 'তুমি', সব তিনি। প্রেম আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান্। যার সত্যিকারের প্রেম জন্মাল তার আর তা হারাবার ভয় নেই। সেই জন্যই কবীরদাস বলেন, পেয়েছিস ত

১ অনুদিত পদ ১২
২ ঐ ২৪
৩ ঐ ১৩

তার আবার হারানো কি।[১] এ জিনিষ যে একবার পেয়েছে সে আর হারাতে পারে না।

এই পরম বস্তু, এই 'অমূল্য রতন' পাওয়া যায় কি করে। ভাগ্য প্রসন্ন হ'লে প্রভু কৃপা করেন আর তা হ'লেই পাওয়া যায়। কবীরদাস প্রভৃতির এই মতের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের প্রসন্নতা, প্রভুর কৃপা, সে ত কোনো একটা উপলক্ষ্য করে আসবে। কি সে উপলক্ষ্য? ভক্তরা বলেন, সে উপলক্ষ্য সদ্‌গুরু।

ভক্তিবাদের সঙ্গে গুরুবাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভক্তিপথের গুরু দিশারী। ভক্তিরস-সায়রে গুরু কর্ণধার। গুরু-কৃপা ভিন্ন অন্তরে ভক্তি-বীজ উপ্ত হয় না। গুরু-কৃপা ভিন্ন প্রেম জন্মেনা। তাই কবিরাজ গোস্বামী গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ পাবার কথা বলেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, গোস্বামীপাদ কৃষ্ণেরও আগে গুরু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি আকস্মিক নয়। তিনি ইচ্ছা করেই করেছেন। ভক্তদের কাছে বিশেষ করে বৈষ্ণবাদি ভক্তদের কাছে গুরু এমনি গুরুই বটেন।

কে এই গুরু? গুরু স্বয়ং ভগবান। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শ্রীভাগবতস্বামী বলেন—"গুরুরূপে শ্রীভগবানই অবতীর্ণ ইহা সর্ববাদিসম্মত গুরুতত্ব।"[২] কিন্তু যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর সেই অসীমকে কেমন করে সসীম জীব গুরুরূপে পাবে? তার উত্তরে ভক্তরা বলেন—সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান নরদেহে বিরাজমান। মানুষের কাছে তাই তিনি মানুষ গুরুরূপেই প্রকাশিত, কিন্তু ভক্ত তাঁকে মানুষরূপে দেখেন না। ভক্তের কাছে তিনি ভগবদ্‌স্বরূপ। ভক্তিশাস্ত্রমতে স্বয়ং ভগবানের বাণী—আচার্য্যং মাং বিজানীহি—আমাকে আচার্য্য বলে জানবে। এর উপর আর কথা নেই। তাই, ভক্তের কাছে 'সর্বদেবময়ঃ গুরুঃ' গুরু সর্বদেবময়, সর্বাগ্র-পূজ্য। তাই ভক্তিশাস্ত্র মতে স্বয়ং ভগবানের বাণী 'প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্।'[৩]—আগে গুরুর পূজা করে আমার অর্চনা করবে।

আগে গুরু পাছে কৃষ্ণ। অথবা এ কথা বলা হয়ত ভুল। বলা উচিত,

---

১ অনুদিত পদ ১২

২ শ্রীভাগবতস্বামী কৃত শ্রীগুরুতত্বকুসুমাঞ্জলি পৃঃ ৩

৩ ঐ পৃঃ ৫

যেই গুরু সেই কৃষ্ণ। তবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ-স্বরূপ গুরুকে অবলম্বন করে হয় কৃষ্ণসেবা।

গুরুর এই মাহাত্ম্য, গুরুর গৌরব শুধু ভক্তিধর্মে নয়, ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্মেই স্বীকৃত। যাঁরা গুরুকে ভগবান মনে করেন না, তাঁরাও তাঁকে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন। যোগমত, তান্ত্রিক মত প্রভৃতিতে ত গুরু ভিন্ন এক পা-ও এগোবার উপায় নেই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরু গরিষ্ঠ।

বলা বাহুল্য, যেকোনো লোক গুরু হতে পারেন না। শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে দেওয়া আছে। সহজ কথায় বলা যায়, যিনি সিদ্ধ তপস্বী, যিনি নরোত্তম, তিনিই সদ্‌গুরু। সাধারণ লোকের ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নেই। সদ্‌গুরুকে দেখে তারা ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। এই জন্য, ঈশ্বরকোটি মহাগুরুরা কালে ভগবানের অবতাররূপেই পূজিত হন।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে গুরুর মাহাত্ম্য অজস্র প্রচারিত হয়েছে। কি প্রাচীন যুগ, কি মধ্য যুগ, এমন কি আধুনিক যুগেও অধ্যাত্মপথের পথিকেরা উচ্ছ্বসিতভাবে সদ্‌গুরুর মহিমা কীর্তন করেছেন। কবীরদাসও এই দলভুক্ত। তাঁর রচনায় বার বার সদ্‌গুরুর কথা এসেছে। কবীরদাসের অধ্যাত্ম-জীবনের পটভূমিকা রয়েছে যোগমতের পরিবেশের মধ্যে আর তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ভক্তি মতে। এই উভয় মতেই গুরুবাদ প্রবল। তা ছাড়া, গুরু রামানন্দের মাহাত্ম্য কবীরদাস স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই জন্য কবীরদাস আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সদ্‌গুরুকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রামই তাঁর গুরু, রামই তাঁর পীর।[১] তবে কি কবীরদাসের সদ্‌গুরু মানুষ নন? মানুষ নিশ্চয়ই। কবীরদাস আপন গুরু রামানন্দকে স্মরণ করেই সদ্‌গুরুর কথা বলেছেন। মহাগুরু রামানন্দ কবীর-নির্দিষ্ট সদ্‌গুরুর মূর্ত্ত বিগ্রহ। কবীরদাসের সদ্‌গুরু রামেরই নবরূপ।

কবীরদাস সদ্‌গুরুর মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন। তিনি গুরুকে গোবিন্দেরও আগে স্থান দিয়েছেন। বললেন, গুরু আর গোবিন্দ দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন। কার পায়ে আগে প্রণাম করব? কবীরদাসের উত্তর হল, গুরুর পায়ে। বললেন—যে গুরু গোবিন্দকে দেখিয়ে দিলেন তাঁকে বলিহারি যাই।

---

১ অনুদিত পদ ১৭

"গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগূঁ পাঁয়।
বলিহারী গুরু আপপৈঁ জিন গোবিন্দ দিয়ৌ দিখায় ॥"

কবীরদাসের সদ্‌গুরু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপ।[১] তাঁর দর্শনে জন্মের সংস্কার ঘুচে যায়।[২] দেবতা-মানুষ সবাই মায়ার ফাঁদে পড়ে ঘুরে মরছে।[৩] সদ্‌গুরুর কৃপা, তাঁর উপদেশ ভিন্ন কেউ এর থেকে উদ্ধার পায় না।

কণ্টকাকীর্ণ সংসারে এসে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তাঁর আর উদ্ধারের পথ থাকে না। এই অবস্থায় সদ্‌গুরুর নাম তার একমাত্র গতি।[৪]

জীব সংসারে বহু দুঃখ পায়। এই দুঃখের হাত এড়াবার একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ, এই জন্য কবীরদাসের উপদেশ, যত দিন বেঁচে থাকবে আশ্রয় নেবে সদ্‌গুরুর।[৫] সদ্‌গুরুর কৃপাতেই শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে খান ও খাওয়ান। তিনি ব্রহ্মদর্শন করান।[৬]

কবীরদাসের স্পষ্ট অভিমত ছিল, সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না। প্রণয়িনী (ভক্ত) প্রিয়তমের (ভগবানের) কাছে থেকেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারছেনা। বিরহ-বেদনায় ছটফট করছে। কবীর বলছেন, 'ওগো, আমার সেয়ানা সখি, শোন কথা, সদ্‌গুরু বিনা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হয় না।'[৭]

কবীরদাস স্বয়ং এই কৃপা লাভ করেছিলেন। বলছেন[৮]—গুরু আমাকে অজর সিদ্ধি ঘোঁটা খাইয়ে দিয়েছেন। যেদিন থেকে গুরু আমাকে এই সিদ্ধি-ঘোঁটা খাইয়েছেন সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে, আমার সকল দোটানার ভাব দূর হয়ে গেছে। অধর-কটোরায় নাম-ঔষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। এটি ব্রহ্মা বিষ্ণু খেতে পান নি। শম্ভু এর খোঁজে জন্ম কাটালেন। কবীর বলছে, স্বরতি-ধ্যানে বসে এ যে খেতে পারে সেই অমর হয়।

---

১ অনূদিত পদ ১৯
২ ঐ ৮১
৩ ঐ ৪৩
৪ ঐ ৪০
৫ ঐ ৯৬
৬ ঐ ৫
৭ ঐ ৮৬
৮ ঐ ৮২

সদ্‌গুরুর আশ্রয়কেই কবীরদাস স্বীয় আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশের হেতু-স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন—রামানন্দকে যখন গুরুরূপে পেলাম তখনই আমার সকল দুঃখ-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল, দূর হয়ে গেল সকল দোটানার ভাব।[১] তিনি স্বীয় গুরুর পায়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাতে করেই তিনি গুরুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নালার জল গঙ্গার সঙ্গে মিশে যেমন গঙ্গা হয়ে যায় তেমনি হয়েছিলেন কবীরদাস আপন গুরুর সঙ্গে মিশে।[২] তাই তিনি গৌরব করে বলেছেন, গুরুপ্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দুই দিয়ে জোলা জগৎ জয় করে যাবে।[৩]

এই জয় তিনি করেছিলেন তাঁর প্রেম-ভক্তি দিয়ে। সে প্রেম-ভক্তিও গুরুকৃপাতেই পেয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, ভক্তরা মনে করেন ভাগ্য না থাকলে ভক্তিলাভ করা যায় না। কবীরদাসও এই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ভাগ্য বিনা ভক্তি মিলে না। প্রেম-প্রীতির বিষয় ভক্তি। সারা দুনিয়া ভক্তিতে ভরে আছে কিন্তু যার প্রেম নেই সে ভক্তি পায় না।[৪] অন্যত্র বলেছেন—'কবীরের কর্মটি দেখ। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য সেই অলখ পুরুষকে বন্ধ করল। এ আর কিছু নয়, জন্মান্তরের ললাটলিপি।[৫]

কিন্তু শুধু ভক্তিলাভের ভাগ্য হলেই হবে না। সেই ভক্তির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সদ্‌গুরু-লাভেরও প্রয়োজন। কেন না, ভাগ্যক্রমে ভক্তির অঙ্কুর দেখা দিলেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় বিনা তা বাড়তে পারে না ও রক্ষা পায় না। ভক্তি অটুট রাখতে হ'লে গুরুর কৃপা লাভ করতে হবে। তাই কবীরদাস বলেছেন—সদ্‌গুরু তোমাকে যে সত্য দর্শন করাবেন তাতেই ভগবৎ-চরণে তোমার ভক্তি অটুট থাকবে।'[৬]

কবীরদাসের এই ভক্তি কেমন, তা জানতে হলে আগে জানা প্ররোজন সেই ভক্তির ভগবান যিনি, কবীরদাসের সেই আরাধ্য রাম কেমন।

---

১ সত্য কবীর কী সাখী ১।৮

২ কবীর পৃঃ ১৫২

৩ অনুদিত পদ ৫২

৪ সত্য কবীর কী সাখী ১৫।১১

৫ অনুদিত পদ ১০৪

৬ ঐ ৪৬

ভগবান অনন্ত। অনন্ত তাঁর নাম, অনন্ত তাঁর রূপ। শাস্ত্র আর সাধু-সন্তরা অনন্ত প্রকারে তাঁর কথা বলেছেন। গোস্বামী তুলসীদাসের কথায়—

"হরি অনন্ত হরিকথা অনন্তা
বহুপ্রকার গাৱহি শ্রুতি-সন্তা।" [১]

নানা ভক্ত নানা নামে নানা রূপে ভগবানকে জেনেছেন, পেয়েছেন। কবীর-দাসের ভগবান রাম। গুরু রামানন্দের কাছ থেকে তিনি এই নাম পেয়েছিলেন। কবীরদাস বহু পদে তাঁর ভগবান, তাঁর আরাধ্য রামের কথা বলেছেন।

রাম পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর মূর্ত্তি নেই। [২] তিনি অদ্বৈত-ব্রহ্ম। নাম লওয়া উচিত নয়, কেন না তাতে তাঁকে ভিন্ন মনে হবে। [৩] তিনি নিগু'ণ। [৪] সগুন-নিগু'ণের অতীত সত্যস্বরূপ। [৫] তিনি শিব (পরমাত্মা) জীবমহলে অতিথি। [৬] রাম বেদকোরাণের অগম্য। [৭] তিনি অগম অগোচর। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, হাতেও ধরা যায় না। অথচ তিনি দেখা ও ধরা থেকে দূরেও নন। [৮] তিনি চাঁদ-ছাড়া-চাঁদনি অলখ নিরঞ্জন রায়। [৯] তিনি অবিগত অকল অনুপম। [১০] তিনি অচিন্ত্য অকথনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। [১১]

কবীরদাসের ভগবান দ্বন্দ্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত, অপরংপার পুরুষোত্তম। [১২]

প্রসঙ্গত এখানে বলা আবশ্যক, কবীরদাস তাঁর আরাধ্যকে প্রধানত রাম নামেই অভিহিত করেছেন। কবীরদাসের রাম দাসরথি রাম নন। কবীরদাস অবশ্যি হরি, গোবিন্দ, কেশব, মাধব প্রভৃতি নামও ব্যবহার

---

১ কবীর পৃঃ ১৪৭-এ উদ্ধৃত।
২ অনুদিত পদ ৪
৩ ঐ ১০
৪ ঐ ১৮
৫ ঐ ১৯
৬ ঐ ২৪
৭ ঐ ৪৪
৮ ঐ ৪৮
৯ ঐ ১০৭
১০ কবীর গ্রন্থাবলী পদ ৬
১১ ঐ ২৬
১২ কবীর পৃঃ ১৫১

করেছেন্ তাঁর আরাধ্য সম্পর্কে কিন্তু এসব নামও তিনি প্রচলিত পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার করেন নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, যিনি নির্গুণ অদ্বৈত তাঁর প্রতি আবার ভক্তি কি, কিসের প্রেম? ভক্তি ত বৈয়ক্তিক ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে। উত্তরে বলা যায়, কবীরদাসের রাম বৈয়ক্তিক ঈশ্বরও বটেন। তিনি প্রভু, সাহেব, সাঁই, তিনি প্রিয়, তিনি ননদের ভাই।[১] তিনি অবিনাশী দুল্‌হা (বর), ভক্তের রক্ষাকারীও[২] বটেন।

আবার প্রশ্ন হতে পারে তা হলে এ সব কথা কি পরস্পর বিরোধী নয়? না, নয়। তার কারণ 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি—একই সৎ বিপ্রেরা তাঁকে নানা প্রকারে প্রচার করেন এই মাত্র।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।[৩]

"তত্ত্ববেত্তৃগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই জ্ঞান নির্বিশেষরূপে প্রকাশ হইলে যোগীরা পরমাত্মা বলেন, এবং পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট হইলে সাত্বতেরা তাঁহাকে ভগবান বলেন।"

কাজেই, ভগবানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেউ বা তাঁকে বলছে নির্গুণ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নৈর্ব্যক্তিক, অদ্বৈত ব্রহ্ম, আবার কেউ বা বলছে সগুণ, সাকার বৈয়ক্তিক ঈশ্বর। তিনি সবই আবার সবকে অতিক্রম করেও রয়েছেন।

কবীরদাসের বাণীর মধ্যে যে ভগবান সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী কথা দেখা যায়, তার হেতু তিনি ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, ভাবৈকগম্য অনুভবৈকগম্য পরমাত্মাকে আপন অন্তরের অনুভূতির মধ্যে পেয়েছিলেন আর তখনই দেখেছিলেন মানুষের বুদ্ধি যে সব পরস্পর বিরোধী ভাবের কথা চিন্তা করে তা সবই তাঁর মধ্যে আছে আবার তিনি সে সবকে অতিক্রম করেও রয়েছেন।

ভক্তরা ভগবানকে অবাঙমনসগোচর বলেই মনে করেন। ভগবানের স্বরূপ মানুষের সীমিত মানসের মধ্যে ধরা পড়ে না। মানুষ তাঁকে সোপাধিক বা

---

১ অনুদিত পদ ৪১
২ ঐ ৬৯
৩ শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১

নিরুপাধিক যে ভাবেই চিন্তা করুক না কেন তার দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে শুধু একটা আভাসমাত্র পেতে পারে। তাঁকে সচ্চিদানন্দই বলুক আর নির্গুণ নিরঞ্জনই বলুক তাতে করে সে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে শুধু একটা ইঙ্গিত করে মাত্র।

এই জন্যই কবীরদাস বার বার বলেছেন, তিনি অকথনীয় অচিন্ত্য। যে তাঁকে পায় সেও বলতে পারে না তিনি কেমন, যেমন বোবা গুড় খেলেও বলতে পারে না গুড় কেমন।

কোথায় আছেন তিনি? কোথায় আছেন কবীরদাসের রাম? বহু পদে কবীরদাস এর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তিনি আছেন অন্তরে, যত নরনারী তাঁরই রূপ।[১] মানুষ আপন মনগড়া সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ভগবানের আবাস নির্দেশ করে। সাধারণ হিন্দু মনে করে ভগবান আছেন মন্দিরে। সাধারণ মুসলমান ভাবে মসজিদে তাঁর স্থান। আর সাধারণ যোগি-সন্ন্যাসী এঁদের ধারণা যোগবৈরাগ্যের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। কবীরদাস বলেন তিনি কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নন। মন্দির-মসজিদ-যোগ-বৈরাগ্য কোথাও তিনি নেই। তিনি আছেন প্রাণের প্রাণে।[২] বললেন—ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড। ভাণ্ডের মধ্যে আছেন প্রভু। আবার বললেন—ঘটে ঘটে প্রভুই বিরাজ করছেন, কাউকে কটু বলো না।[৩] অন্যত্র বললেন, যেখানে সত্য বস্তু সেখানেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে তা ত জানা গেল, কিন্তু কেমন করে পাওয়া যাবে? কবীরদাস তারও জবাব দিয়েছেন নিজের সিদ্ধ-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বলেছেন—যোগসাধনা করে রঙমহলে প্রিয়তমকে পেয়েছি।[৪] আরও সহজ করে বললেন, সৎসঙ্গে মতি আর মনস্থির-করা রামকে পাওয়ার সহজ উপায় জেনে কবীরদাস তারই সাধনা করছে।[৫] কিন্তু কবীরদাসের পক্ষে যা সহজ উপায় তা ত সত্যি সত্যি সহজ নয়? মন স্থির করার চেয়ে

---

১ অনুদিত পদ ১৯

২ ঐ ১

৩ অনুদিত পদ ৩

৪ ঐ ৯১

৫ ঐ ৯৩

কঠিন কাজ খুব কমই আছে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা অর্জুনের মত এত বড় উচ্চকোটির ভক্ত, যাঁকে ভগবান স্বয়ং অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করতেন, তিনি পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন[১]— চঞ্চল মনকে নিরোধ করা আকাশস্থ বায়ুকে নিরোধ করার মত সুদুষ্কর। কবীরদাসও এ কথা জানতেন। তাই সাধারণ মানুষের জন্য আরও সহজ পথের কথা বললেন—যে ভগবানের কর্ম করে সে-ই তাঁকে পায়। [২]

কিন্তু ভগবানের প্রতি যার প্রেম-ভক্তি জন্মায় নি, সে ত তাঁর কর্ম করতে চাইবে না। এই জন্য ভগবানকে পাওয়ার সব চেয়ে সহজ পথ প্রেম-ভক্তি। কিন্তু সব চেয়ে যা সহজ তাই সব চেয়ে কঠিন। সত্যিকারের প্রেম-ভক্তির লক্ষণ ভগবানের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া। কবীরদাস বলেছেন—প্রেম যে পায় সে নিজেকে দিয়ে দেয়। [৩] কিন্তু এই দিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা। 'অহং'টি যে কিছুতেই যেতে চায় না। সংসারের কত বাঁধনে সে জড়িয়ে আছে, কত ভাবের কত উত্তেজনা তাকে অবিরত উগ্র করে তুলছে।

এই জন্য কবীরদাসের প্রেম-ভক্তি কঠিন সাধনার জিনিষ। কবীরদাস ভগবৎ-সাধনাকে সহজ জিনিষ মনে করতেন না। তাঁর কাছে সাধনা সংগ্রাম-বিশেষ। যত দিন দেহ থাকে তত দিন অবিরত চলে এই সংগ্রাম। 'দেহের মধ্যেই আছে শত্রু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ। শীল, সত্য আর সন্তোষকে সাথী করে নামের তলোয়ার নিয়ে লড়তে হয়। [৪] কবীরদাসের সাধনা বীরের সাধনা।

ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন, 'রামানন্দের প্রেম-ভক্তি কবীরের মধ্যে অভূতপূর্ব পরিণতি লাভ করল। কবীরের প্রেম-ভক্তি কঠিন সাধনার জিনিষ। এর মধ্যে ভক্তির অশ্রু, স্বেদ, কম্পাদি মহাভাবের স্থান নেই।

ভগবদ্-প্রেম আবদারের ব্যাপার নয়। প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকলে তবে এই প্রেম মিলে। কবীরদাস বলেন, মাথা কেটে মাটিতে রাখলে তবে এই প্রেম লাভ হয়। এই প্রেম ক্ষেতে জন্মায় না, হাটেও বিকায় না, শুধু যে চায় সে পায়। সাহস চাই, তা হ'লে ভগবান এগিয়ে আসবেন মিলনের জন্য।

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।৩৪
২ অনুদিত পদ ১১২
৩ ঐ ২৯
৪ ঐ ৮

এই প্রেমে নেই ভাবালুতার বা উচ্ছ্বাসের স্থান। আপন ইষ্টের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসই এর ভিত্তি।

কবীরদাসের ভগবদ্-প্রেমে মাদকতা নেই, আছে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকা; কর্কশতা নেই, আছে কঠোরতা; অসংযম নেই, আছে আনন্দ; উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, আছে স্বাধীনতা; অন্ধ অনুকরণ নেই, আছে বিশ্বাস; অশিষ্টতা নেই, আছে দৃঢ়তা।' [১]

অথচ, কবীরদাস ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন 'মস্ত মৌলা' মানুষ। প্রেম-ভক্তির বাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। ভগবানের জন্য তাঁর ছিল অসীম ব্যাকুলতা। ভগবদ্-বিরহে তিনি ছটফট করেছেন। তাঁর দিনে স্বস্তি ছিল না, রাতে ছিল না ঘুম।

কবীরদাসের প্রেম-ভক্তির মধ্যে এই যে কোমলে-কঠোরে সংমিশ্রণ, তার কারণ তাঁর চিত্তক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল যোগ-মতের কঠোর সাধনার আবহাওয়ার মধ্যে আর সেই ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছিল কোমল প্রেম-ভক্তির বীজ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে বলে' রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্-প্রেম ও সকল প্রকার ভাববিহ্বলতাশূন্য, উন্মত্ত-উচ্ছ্বাসহীন, সকল প্রকার অসংযম-অধীরতা-বর্জিত, শান্ত সংযত নিবিড়।

ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে প্রেম ও ভক্তি এক জিনিষ নয়। ভক্তি পরিপক্ক হ'লে তবে প্রেমে পরিণত হয়। আগে ভক্তি পরে প্রেম। প্রেম অতি দুর্লভ। ভক্তি থাকতে পারে অনেকেরই, কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও খুব অল্প লোকেরই প্রেম থাকে। অনেকে আবার প্রেমভক্তিকে ভক্তিরই এক প্রকারভেদ মনে করেন। তবে সত্যিকারের ভক্তের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম পরস্পর জড়িত থাকে, একটিকে ছেড়ে আর একটি থাকতে পারে না; সেখানে উভয়ের ভেদও লোপ পেয়ে যায়। ভক্ত কবীরের মধ্যেও আমরা এই জিনিষটি দেখতে পাই। তাঁর জীবনেও প্রেম ও ভক্তির ভেদ লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

প্রেম সাধারণতঃ নামরূপের উপর নির্ভরশীল। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, 'সাধক রূপ আর সীমার সহায়তায় অরূপ অসীমকে দেখতে পান; ভক্ত নাম আর রূপের সিঁড়ি বেয়ে উঠে অরূপ পরমতত্ত্বের দর্শন পান।'[২]

মানুষ জানার মধ্য দিয়ে অজানাকে জানতে চায়, পেতে চায়। অন্য কোনো

১ কবীর পৃঃ ১৬১-৬২

২ কবীর পৃঃ ২০৪

পথ তার নেই। তাই, মানব-প্রেমের ভাষায় সে ভগবৎপ্রেমের কথা বলেছে। ভগবানের সঙ্গেও সে মানব-প্রেম-সম্বন্ধই স্থাপন করেছে। এই সম্বন্ধ বহু প্রকারের হ'তে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান: যেমন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণব ভক্তেরা যে পঞ্চ ভাবের সাধনার কথা বলেন তার মধ্যে এই চারটি অন্যতম। অন্য ভক্তেরাও সাধারণতঃ এরই কোনো একটা ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ভগবানের সঙ্গে। মানবীয় প্রেমের চেনা পথেই তাঁরা ভগবানের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন।

কবীরদাসও ভগবানকে মানব-সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই পেতে চেয়েছেন। তাঁর ভগবান কখনও প্রভু, কখনও প্রিয়তম। তবে কবীরদাসের পদে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভক্ত বধূ, ভগবান বর; ভক্ত দুল্‌হিন, ভগবান দুল্‌হা; ভক্ত প্রণয়িনী, ভগবান প্রণয়ী। এইটি মধুর ভাব। বৈষ্ণবদের মতে এইটি সকল ভাবের সেরা। প্রেমের পরাকাষ্ঠা মধুর ভাবে। মনে হয়, কবীরদাসেরও তাই মত ছিল। কেন না, যেখানে তিনি দাস্য ভাবের কথা বলেছেন সেখানেও বহু ক্ষেত্রেই যেন মধুর ভাবের একটি আমেজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রভু শুধু প্রভু নন, প্রিয়ও বটেন। কবীরদাসের ভাবগভীর তত্ত্বপ্রধান পদগুলি যেখানে কাব্য-সৌন্দর্য্যে রসাল হয়ে উঠেছে সেখানেই দেখা যায়, এই চিরন্তন প্রেমের কথাই তিনি বলেছেন।

কবীরদাসের প্রেম বৈষ্ণবদের স্বকীয়া-প্রেম। তাঁর প্রিয় শুধু প্রণয়ী মাত্র নন, তিনি বর, স্বামী, কিন্তু প্রিয়বিরহে কবীরদাসের যে অধীর ব্যাকুলতা, যে বিপুল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, একমাত্র বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে।

কবীরদাসের বিরহিণীর কত দুঃখ, কত বেদনা! কখনো বল্‌ছেন— 'প্রিয়তমের বিরহে আমার প্রাণ ছটফট করছে। আমার দিনে শান্তি নেই, রাতে নেই ঘুম। আমার কাজকর্ম মাটি হ'ল। শূন্য শয্যায় আমার জন্ম কেটে গেল। চেয়ে-চেয়ে চোখে ব্যথা ধ'রে গেল কিন্তু পথ চোখে পড়ল না।'[১]

খুব অভিমান হয়েছে। প্রিয়তমকে বলছেন বেদরদী। বলছেন, বেদরদী বন্ধু আমার খোঁজ নিলে না। অভিমান আরও প্রবল হ'য়ে উঠল। বললেন— 'বিরহের আগুনে এই দেহ পুড়িয়ে ছাই করব। সেই আগুনের ধোঁয়া গিয়ে পৌঁছাবে স্বর্গে। সেই রাম যেন দয়া না করেন। তিনি যেন বর্ষণ করে এই

১ অনুদিত পদ ৬৮

আগুন নিবিয়ে না দেন। এই দেহ পুড়িয়ে কালি বানাব। সেই কালি দিয়ে লিখব রামের নাম। বুকের পাঁজর দিয়ে বানাব কলম আর লিখে লিখে রামকে পাঠাব। এই দেহকে করব প্রদীপ আর প্রাণকে করব তার পল্‌তে। এই প্রদীপের আলোতে আমার প্রিয়তমের মুখ দেখব। হয় বিরহিণীকে মৃত্যু দাও, নয় নিজেকে দেখাও। অষ্ট প্রহরের এই দহন এ যে আমি সহ্য করতে পারছি না।'[১]

কিন্তু অভিমান কতক্ষণ থাকে? বিরহ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, বেদনা যখন অসহ্য, তখন অভিমান অশ্রুসিক্ত মিনতিতে পর্য্যবসিত হয়। বিরহিণী বলে—'বন্ধু, আমি ত তোমারই দাসী। তুমি আমার ভর্তা। দীনদয়াল, এস তুমি দয়া করে। তুমি শক্তিমান, তুমি স্রষ্টা। প্রিয়তম, হয় তুমি এসে আপন করে নাও, নয় আমি প্রাণত্যাগ করি।'[২]

এই প্রেমের কত না রূপ, কত না বৈচিত্র্য। কখনো বিরহবেদনায় প্রাণ কণ্ঠাগত হচ্ছে, কখনও বা মিলনের আনন্দে মন বিভোর হয়ে যাচ্ছে। বন্ধু পাশে রয়েছেন কিন্তু অধীর ব্যাকুলতায় তাঁকে দেখতে পায় না, তাঁর খোঁজে ছুটে ছুটে বেড়ায়। বিহ্বল হ'য়ে ছুটে বেড়ায় কিন্তু কান্তকে কোথাও দেখতে পায় না। বাইরে কোথায় দেখবে। তিনি যে চোখের মধ্যেই রয়েছেন। কিন্তু প্রেম ভীরু, এত বড় কথা সহসা বলতেও সাহস পায় না। 'কবীর বলছে —আমার চোখেই বন্ধুর বাসা এ কথা মুখে বলতে গেলে ভয় হয়।'[৩]

যে একবার প্রিয়তমের দেখা পেয়েছে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। পড়বেই বা কি করে। কবীর বলছেন, 'যেখানে সিঁদুরের রেখা দিতে হয় সেখানে কাজল দেওয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ করছেন, সেখানে অন্যের স্থান হবে কোথায়?'[৪]

কিন্তু ভগবানের দর্শন পাওয়া ত সহজ ব্যাপার নয়। ভগবান যাকে কৃপা করেন মাত্র সেই তাঁর দর্শন পায়, তাঁর প্রেম লাভ করে। অন্য কোনো উপায়ে এটি হবার জো নেই। সাধন ভজন আরাধনা জ্ঞান ভক্তি সবই এই কৃপালাভের প্রচেষ্টা মাত্র। কত জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তরের সাধনার পর

১ অনূদিত পদ ৮৯

২ অনূদিত পদ ৬৯

৩ অনূদিত পদ ৬৭

৪ অনূদিত পদ ৭০

তবে এই কৃপা লাভ হয়, ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মে। কবীরদাস বলেন যুগ-যুগ প্রতীক্ষার পর তবে সাহেবের প্রতি প্রেম জন্মে।[১] মানুষের এর চেয়ে পরম সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। আর এই সৌভাগ্যলাভ জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলেই সম্ভবপর হয়। মানুষের দৃষ্টি বর্তমানের অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সে তার পিছনে-ফেলে-আসা সুদীর্ঘ অতীতের কিছুই দেখতে পায় না। অনাগত ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনাও তার কাছে রহস্যাবৃত। তাই ভগবৎ-কৃপা তার কাছে আকস্মিক মনে হয়। বিশেষ করে সে যখন দেখে যাদের পাপী-তাপী মনে করা হয়, এমন লোকও ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হয়ে যায়, তার হয়ে যায় নবজন্ম ; অথচ যারা ধার্মিক বলে গণ্য তারা এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না, তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। অনেকে হয়ত ভগবানকে খামখেয়ালী বলেই ধারণা করে বসে। কিন্তু তারা যদি মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবটা দেখতে পেত তা হলে এ কথা বলত না। যাক্ সে কথা।

ভগবানের কৃপা যে পেল, যার হৃদয়ে জন্মাল ভগবৎ-প্রেম 'তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ।' কবীরদাস বলেন,—'ওরে মন, ওরে আমার প্রিয়বন্ধু, বিবেচনা করে দেখ, প্রণয়ী হ'লে কি আর শোয়া চলে।[২]

ভগবানের প্রেমের বাঁশী নিত্য বেজে চলেছে। আনন্দময় তিনি। তাঁর বাঁশীর সুরে সুরে আনন্দের হিল্লোল উঠছে। সেই আনন্দে বিশ্ব-চরাচর হল গতিমান। তারা নাচতে-নাচতে চল্‌ল।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, সব মানুষ এ বাঁশী শুনতে পায় না, কানে শুনলেও মনে শোনে না। বাঁশীর আহ্বান তাদের কানে প্রবেশ করে, মরমে প্রবেশ করে না। কিন্তু যার ক'রে তার আর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। প্রাণান্ত হয় তার। কবীর বলছেন—'মুরলীর ধ্বনি শুনে আমি আর থাকতে পারছি না।'[৩] বাঁশীর সুরে বিকশিত হ'ল তাঁর হৃদয়-কমল, মন হ'ল সমাধি-মগ্ন। তখন 'আমি' আর রইল না, 'অহং- এর বিলোপ হয়ে গেল। তাই কবীরদাস বলছেন, 'আজ আমার প্রাণ জ্যান্ত থেকেই যাচ্ছে মরে।'[৩]

এ কেমন কথা, বেঁচে থেকেই মরে যাওয়া, এর মানে কি। ডাঃ দ্বিবেদী

---

১ অনুদিত পদ ২৪

২ অনুদিত পদ ২৯

৩ অনুদিত পদ ১৬

বলেন, 'ভক্তের মৃত্যু হ'ল 'আমি বা 'অহং'-কে ত্যাগ, একে বলি দেওয়া। প্রতি মুহূর্তে যে এই অহংকে বলি দিচ্ছে সে-ই ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। না মরলে যে বাঁচাই হয় না।' [১]

আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে যাঁদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, এই 'আমি'কে ত্যাগ করা কি কঠিন কাজ। সব যায় কিন্তু 'আমি' যায় না। এই জন্য যে প্রেম-সাধনা এই 'অহং' ত্যাগের মধ্য দিয়ে চলে সে যে সহজ জিনিষ নয়, তা বলাই বাহুল্য। কবীরদাসের প্রেম-সাধনা তাই এত কঠিন। 'নিজের মাথা কেটে হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে হয় এই প্রেম-মন্দিরে। দুর্গম এর পথ, অসীম এর বিস্তার। এ মামা-বাড়ী নয় যে আব্দার করলে আর একটু চোখের জল ফেললেই যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যাবে। [২]

ভগবানের সাধনা কঠিনই বটে। যে ভাবেই সাধনা হোক না কেন, জ্ঞানের পথেই হোক, আর প্রেম-ভক্তির পথেই হোক, সাধনার পথ অতি দুর্গম, 'দুর্গমঃ পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি।' কবীরদাসও এ কথা বার বার বলেছেন। তাঁর প্রেম-সাধনা অবিরত সংগ্রাম। এ আরামের ব্যাপার নয়, দুঃসহ এর দুঃখ।

কবীরদাসের প্রিয়তম যিনি, যিনি তাঁর আরাধ্য, তিনিও তাই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তমের মত দুঃখ-রাতের রাজা। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়েই তাঁকে পেতে হয়। দুঃখের দুর্গম পথ দিয়েই তিনি আসেন। সেই পথ ধরেই যেতে হয় তাঁর কাছে। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে যেমন বক্ষের দরজায় রবীন্দ্রনাথের বন্ধুর রথ এসে থামে তেমনি কবীরদাসেরও 'প্রিয়তম এই দুঃখের পথেই আসেন। কান্না তাঁর পথ, হাসি নয়, সুখ নয়। অশ্রুজল প্রিয়-মিলনের নিশ্চিত পথ।' [৩]

ভগবান লীলাময়। বিশ্বভুবন পরিব্যপ্ত করে চলছে তাঁর প্রেমলীলা। রাজার রাজা তিনি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর ঐশ্বর্যভাব নেই। সেখানে তিনি শুধু প্রেমিক। প্রেম দেবার জন্য আর প্রেম পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ফিরছেন।

ভগবানের এই প্রেমলীলা সম্পর্কে আধুনিক যুগের কবি সার্বভৌমের সঙ্গে মধ্যযুগের সন্তশিরোমণির অনেক মিল দেখা যায়। ডাঃ দ্বিবেদীজী

১ কবীর পৃঃ ১৯৬

২ কবীর পৃঃ ১৯৬

৩ কবীর পৃঃ ১৯৩

বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ প্রেমলীলার যে আদর্শের কথা বলেছেন কবীরদাসের আদর্শের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। বলা যায়, উভয়ে একই আদর্শের কথা বলেছেন। এক জন সরস কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে যা বলেছেন, অন্য জন সরল অর্থপূর্ণ ভাষায় তাই বলছেন। উভয়েই বলছেন, ভগবান ভক্তের সঙ্গে প্রেমলীলার জন্য ব্যাকুল। তবে একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ গরমিল আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভগবান প্রধানতঃ ভক্তের কাছে যান অভিসারে আর কবীরদাসের কবিতায় ভক্ত যান অভিসারে। [১]

অভিসারিকা চলেছে। কবীরদাস বলছেন—'বিন্দু বিন্দু প্রেমরসে ভিজে গেছে তার চুনরী। আপন প্রিয়তমের খোঁজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হয়ে।' [২]

কিন্তু সোহাগীই শুধু যায় না। প্রিয়তমও আসেন। আমরা আগেই বলেছি, কবীরদাস স্বকীয়া-প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর ভক্ত বধূ। বধূ বাপের বাড়ীতে এসেছে। কিন্তু সেখানে আর তার মন টিকছে না। স্বামীর কাছে শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্বামী আসবেন তাকে নিয়ে যেতে। ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বলছে, স্নান-টান করে কনে হয়ে বসে আছি প্রিয়ের পথ চেয়ে, সখি রে, একটু ঘোমটা খুলে দেখতে দে আমায়। আজ আমার মিলনের রাত যে! [৩]

রাত গভীর হয়ে আসে। পথ চেয়ে চেয়ে বধূ ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তিনি আসেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকা প্রিয় চলে যাবার পর জানতে পারে। প্রিয় তাকে জাগিয়ে দেন না, শুধু পাশে বসে বীণা বাজিয়ে যান। প্রেমিকার 'স্বপনমাঝে' মধুর রাগিণী বাজে। ঘুম ভাঙলে পর তাই তার আর আপসোসের অন্ত থাকে না। সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দেয়—

> "কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী,
> সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।"

কবীরদাসের বধূ কিন্তু সৌভাগাবতী, প্রিয় তাকে জাগিয়ে দেন। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তার লজ্জার সীমা থাকে না। আর এমনটি হবে না ব'লে সে সঙ্কল্প করে। বলে, 'আমি ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছিলাম। প্রিয়তম

---

১ কবীর পৃঃ ১৯৭
২ অনূদিত পদ ৮০
৩ অনূদিত পদ ২৩

আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়ে নিয়েছি তাঁর চরণ-কমলের অঞ্জন। যা'তে আর ঘুম না আসে, শরীরে যা'তে আলস্য না লাগে তাই করব।' [১]

বধূ বাপের বাড়ীতে থাকতে চায় না। এখান থেকে তার মন উঠে গেছে। তাই বলছে, 'ও আমার ননদের ভাই, এবার আমাকে তোমার আপন দেশে নিয়ে চল।' [২]

রাজি হলেন তিনি। তখন বধূর কী আনন্দ, কী গর্ব! বিয়ের পর মেয়ে অনেক দিন বাপের বাড়ীতে থাকলে লোকে নানা কথা বলে। বেচারা সব চুপ ক'রে সহ্য ক'রে যায়। তার পর যেদিন স্বামী নিতে আসেন কথাটা পাকে-প্রকারে সবাইকে শুনিয়ে দেয়। ওরা শুধায়, কি গো, শ্বশুর-বাড়া যাচ্ছ না কি? কার সঙ্গে যাবে? উত্তর দেয়, "কার সঙ্গে আর যাব। স্বামীর সঙ্গেই যাব। হাতে নেব নারকেল, মুখে দেব পানের খিলি। সীঁথি ভরে পরব মোতি।" [৩] সৌভাগ্যের চিহ্ন এ-সব, মাঙ্গল্য। শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময় মেয়ের মনের সে এক অদ্ভুত অবস্থা; ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে বিষাদ। কখনো গুন্‌-গুন্‌ করে গান করে, কখনো এটা-ওটা বায়না ধরে। দেখে-শুনে বিজ্ঞজনেরা বলে, "ওগো কনে, তোমাকে স্বামীর ঘরে যখন যেতেই হবে তখন কেন কান্না কাটি কর, গান গাও কেন, কেনই বা বায়না ধর! সবুজ-সবুজ চুড়ি পরেছ কেন? প্রেমের পোষাক পর।" [৪]

কনে কিন্তু বাপের বাড়ীর পোষাক পরে রয়েছে। তাতে দাগ লেগে আছে। আর তা ছাড়া তার মনটাও দোটানায় পড়েছে। একবার বাপের বাড়ীর দিকে টানছে একবার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে। তার কখনো বা আপসোস হচ্ছে, হয়ত বা শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া ঠিক করে ভাল করে নি। হিতৈষীরা বলছেন, "ওগো নতুন বৌ, তুমি কাঁচুলি ধোওনি কেন? তোমার ছেলেবেলার ময়লা কাঁচুলি। তাতে দাগ লেগেছে। না ধূলে প্রিয়তম তোমার খুশি হবেন না আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন।" [৫] তার পর বলছে, "ওগো বৌ, দোটানার ভাবটা ঘুচিয়ে ফেল, মনের ময়লা

১ অনুদিত পদ ৭৫
২ অনুদিত পদ ৪১
৩ অনুদিত পদ ৮১
৪ অনুদিত পদ ৭৪
৫ অনুদিত পদ ১২

ধুয়ে ফেল। এখন শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। স্বামী দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন, এখন আর পছতিয়ে কি হবে।" [১]

শ্বশুর-বাড়ী যাবার দিন। স্বামী আগে রওয়ানা হয়ে গেছেন। বধূর মন খুশিতে ভরা। নির্জন বনের মধ্য দিয়ে পথ। সে পথে পরিচিত কেউ নেই। ডুলি নিয়ে চলেছে কাহারেরা। আবার আপন জনদের জন্য বধূর মন কেমন করতে লাগল। বলল, "ওরে কাহার, তোদের পায়ে পড়ি একটু সময়ের জন্য ডুলিটা রাখ। আমি আমার সখিদের সঙ্গে একটু দেখা ক'রে নি, দেখা ক'রে নি আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।" [১]

বধূ ত চলেছে তার স্বামীর কাছে। ওরা শুধায়, ওগো বৌ, কোথায় থাকেন তোমার স্বামী, কোথায় যাবে তুমি? বধূ বলে, আমার প্রভু বাস করেন অগম্য পুরীতে। সেখানেই আমি যাব। জায়গাটার পরিচয় দিয়ে বলে—সেখানে আছে আটটি কুঁয়ো আর নয়টি বাপী আর আছে ষোলটি মেয়ে, তারা জল আনে। [২] এর মানে হ'ল, তিনি সারা জগৎ জুড়ে রয়েছেন, রয়েছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে। কবীরদাস এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন—ভাই সাধু, শোন, এরই মধ্যে (এই ঘটের মধ্যে) আমার সাঁই রয়েছেন।

ভগবান সর্বব্যাপী বটেন। কিন্তু ভক্ত তাঁকে পায় আপন অন্তরের মধ্যে। তাই কবীরদাস বললেন, অন্তরে খোঁজ—কেবল অন্তরেই খোঁজ, এখানে আছেন করাম, এখানেই আছেন রাম। [৩]

পুরাণ বলে, ভগবান থাকেন বৈকুণ্ঠে। সাধারণ লোকে মনে করে, এই বৈকুণ্ঠ জগতের বাইরে সুদূর উর্দ্ধলোকের কোনো একটা স্থান। কবীরদাস এ সব কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, বৈকুণ্ঠ উর্ধে কোথাও নয়, তা এই জগতেই রয়েছে; সাধুসঙ্গই সেই বৈকুণ্ঠ। [৪]

ভগবান সর্বত্রই আছেন। তিনি আছেন অন্তরে। সাধুসঙ্গেই এই সত্যের উপলব্ধি হয়, সাধুদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এই জন্যই বুঝি কবীরদাস সাধুসঙ্গকে বৈকুণ্ঠ বলেছেন।

১ অনূদিত পদ ১৮

২ অনূদিত পদ ৫০

৩ অনূদিত পদ ১৭

৪ অনূদিত পদ ৫৭

কবীরদাস বার বার বলেছেন, প্রভু থাকেন উচু অট্টালিকায়। বধূ সেখানে উঠতে সাহস পায় না, তার ভয় করে।

উন্মুনি সমাধির অবস্থাকেই কবীরদাস উচু অট্টালিকা বলেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর ছাড়িয়ে মন যখন উপরে উঠে সমাধি-মগ্ন হয়, তখনই হয় তার ভগবদ্- উপলব্ধি।

আবার কবীরদাসের প্রিয়তমের উচু মহল হ'ল যোগের পরিভাষায় সহস্রার। ষটচক্রের উর্ধে সহস্রার। এই সহস্রারেই হয় জীবে-শিবে মিলন। তাই এই দিক দিয়ে দেখলেও- প্রিয়তমের মহল উচুই বটে।

বধূ এল স্বামীর ঘরে। কিন্তু তবু মিলন হ'ল না। দুঃখ করে সে বলছে, স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী এসেছি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমি থাকতে পারলাম না; জানলাম না সেই সঙ্গের কি স্বাদ। স্বপ্নের মত কেটে গেল আমার যৌবন। [১]

মিলনের অন্তরায় বহু। তার মধ্যে প্রধান অন্তরায় বধূর মনের দোটানা ভাব। স্বামীর কাছে এসেও সে ভাব তার যায়নি। তার মন একবার বাপের বাড়ীর দিকে টানছে, একবার টানছে স্বামীর বাড়ীর দিকে। এই ভাব না গেলে মিলন হ'তে পারে না। আর সব ছেড়ে কায়মনোবাক্যে যদি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় তবেই মিলন হওয়া সম্ভব।

আর একটি বাধা আছে। বধূর গায়ে রয়েছে পোষাক, কাঁচুলি, চুনরী। বাপের বাড়ীর এ সব পোষাক। বিষয়ের দাগ লেগে লেগে ময়লা। এগুলো না ধুয়ে ফেললে ত প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে না?

কিন্তু ধোয়া কি সহজ? রগড়ে-রগড়ে ধুলেও তবু দাগ যায় না।[১১] জ্ঞানের সাবান দিয়ে ধুতে হয়। কিন্তু প্রিয়তম কৃপা না করলে তা'ও করা যায় না। তাই কবীরদাস বললেন, প্রভু যখন তোমাকে আপন করে নেবেন তখনই দাগ সব উঠে যাবে। [২]

এর থেকে বোঝা যায়, কবীরদাসের মতে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হ'তে পারে তখনই, যখন তিনি স্বয়ং কৃপা করবেন। তিনি কৃপা করলে মিলনের আর কোনো বাধা থাকে না। শাশুড়ী ননদী সবাইকে এড়িয়ে

---

১ অনূদিত পদ ২৮

২ অনূদিত পদ ৬৩

তার কাছে যাওয়া যায়। সমস্ত ছেলেমানুষি নিমেষে ঘুচে যায়। তিনি যে স্বয়ং হাত ধরে কাছে টেনে নেন।[১]

মানুষের আছে দুই রূপ ; এক জৈব বা মৃণ্ময়, অপর চিন্ময়। জৈব রূপে সে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা জটিলতা-আবিলতার মধ্যে জড়িত ; ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিতে কাতর, রিপুতাড়িত। অঙ্গে তার কত ধুলো-বালি মলিনতা। আর চিন্ময় রূপে সে শুদ্ধমুক্ত-স্বভাববান। প্রিয়তম যখন কাছে টানেন তখন জীবের এই চিন্ময় রূপই প্রধান হ'য়ে উঠে। এরই সঙ্গে হয় প্রিয়তমের মিলন। সীমার মধ্যে আছে অসীম। তারই সঙ্গে হয় অসীমের মিলন। নইলে মিলন হয় না। কারণ, প্রেমশাস্ত্র বলে, সমানে সমানে নইলে প্রেম হয় না। ভক্তের মধ্যে আছে চিরন্তন প্রেমিকা। তারই সঙ্গে মিলন হয় চিরন্তন প্রেমিকের।

তিনি চির প্রেমময়। তাঁর প্রেমের সীমা নেই। তাঁর প্রতি যার প্রেম জন্মাল, তাকে তিনি কত ভাবে কত রূপে প্রেম দান করেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবান যেমন রাজার রাজা হয়েও মানুষের হৃদয়হরণ করার জন্য কত মনোহরণ বেশে এসে দেখা দেন, মানুষ তাঁকে চায় কি চায় না সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না, তেমনি কবীরদাসের প্রিয়তম সম্বন্ধে কবীরদাস নিজেই বলেছেন—"কবীরদাসের তাঁর প্রতি ক্ষণেকের জন্যও প্রেম জন্মাল না। তবু তাঁর প্রীতি দিন দিন নব-নব রূপে দেখা দিচ্ছে।"[২]

প্রিয়তমের প্রেম সবাই পায় কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারে, তার মর্য্যাদা রাখতে পারে অল্প লোকেই। কেন না, যে একে গ্রহণ করে, দুঃসহ তার দুঃখ, অসীম তার বেদনা।

তবে তাঁর বাঁশী যে ভাগ্যবানের মরমে প্রবেশ করল তার আর অন্য গতি নেই, উপায় নেই। অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে বর্ষণমুখরিত রাতের অন্ধকারে দুঃখের বন্ধুর পথেই সে চলে অভিসারে।

শত বাধা এলেও যে প্রিয়তমের সঙ্গে তার মিলন হবেই এ বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয়ই থাকে না। কবীরদাসও এই আশ্বাসই দিচ্ছেন—"ওরে, তোর সঙ্গে প্রিয়তমের মিলন হবেই। এবার সরিয়ে দে ঘোমটার কাপড়।"[৩]

১ অনুদিত পদ ৮৩

২ অনুদিত পদ ৮৩

৩ অনুদিত পদ ৯৯

ভক্ত কবীর ছিলেন সিদ্ধ সাধক। তাঁর সাধনা প্রেমভক্তির সাধনা। এ সাধনা বীরের সাধনা, বড় কঠিন। সাধনার পথ নির্দেশ করেন গুরু। কিন্তু পথ চলার দায় শিষ্যের। পথের সব বাধা-বিঘ্ন তাকেই অতিক্রম করতে হয়। সব দুঃখ-কষ্ট তাকেই সইতে হয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে গুরু যেন দূতী, তিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। তার পরে যে প্রেমলীলা চলে সেখানে শুধু প্রণয়ী আর প্রণয়িনী, সেখানে আর কারুর স্থান নেই। এই জন্যই বুঝি কবীরদাস বলেছেন—ওরে, আমার নিজের প্রিয়ের কথা কার কাছ থেকে বুঝব? আমার প্রাণের প্রাণ আমার প্রিয় ছাড়া আর সবই যে মুসাফির।[১]

প্রিয়ের কথা প্রণয়িনীই জানে। অন্যে তার কি জানবে। কবীরদাসের প্রেমসাধনার এটি একটি সঙ্কেত। এতে করে সাধনা যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ভাবটার উপর যেন জোর দেওয়া হ'ল। অবশ্যি, কথাটা নতুন নয়। আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনা চিরকালই ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রেম রহস্যময়। সাধারণ মানব-মানবীর প্রেমের মধ্যেই এই রহস্যময়তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের অন্ত পায় না। প্রেম তাদের মধ্যে নব নব রূপ আবিষ্কার করে। তাই প্রেম চির-অজানা। তার সম্বন্ধে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কথা কেউ বলতে পারে না। তাই যদি হয় তাহ'লে সকল প্রেমের উৎস যিনি সেই অনন্তপ্রেমময়ের কথা কে বলতে পারে। তিনি যে নিতুই নব। নব নব রূপে আসছেন প্রেমিকার কাছে। যে তাঁকে যেমন করে চাইছে তিনি তার কাছে তেমনি ভাবেই দেখা দিচ্ছেন। কাজেই, তাঁর কথা অন্যের কাছ থেকে জানবার নয়। তাঁর কাছে যাবার পথ প্রত্যেকের নিজের পথ। সদ্‌গুরু শুধু দিক নির্দেশ করে দেন। বাকীটা প্রত্যেকের নিজের উপর।

এই জন্যই কবীরদাস বললেন—প্রভুর গতিবিধি অগম্য। তুই চল্ নিজের অনুমান মত। ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চল্। পরিণামে পৌছে যাবি।

---

১ অনূদিত পদ ৪৫

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার কথা মনে পড়ে যায়—

"বৃথা আমি কী সন্ধানে যাব কাহার দ্বার
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।"

আধুনিক যুগের কবির সঙ্গে মধ্যযুগের সন্তের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

প্রেমের কোনো বাঁধা-ধরা পথ নেই। সে আপনার পথের সন্ধান আপনি দেয়। সেই পথে চলে প্রেমিকা। চলতে চলতে সে পায়; পেতে পেতে চলে। ক্ষণে পায়, ক্ষণে হারায়। পায় যখন আনন্দে আত্মহারা হয়। হারায় যখন যাতনায় ছটফট করে। এমনি চলে প্রেমের লীলা। প্রেমিকা প্রিয়তমকে পেয়েও পায় না। বুঝেও বোঝে না তাঁর রহস্য। তাই পেয়েও হারায়; বিরহ-বেদনায় কাতর হয়। কিন্তু একবার যদি রহস্য বোঝে তাহ'লে প্রিয়ের সন্ধানে আর এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করে বেড়ায় না। তখন আপন অন্তরের মধ্যেই তাঁকে দেখতে পায়। তাই বিরহিণীকে ডাক দিয়ে কবীরদাস বললেন, ওগো সুন্দরী, আপন পুরুষের বিষয় যদি বুঝতে পার তাহ'লে দেখতে পাবে তিনি তোমার দেহেই নৃত্য করছেন। [১]

দুই নইলে প্রেম হয় না। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন দুই এক হয়ে যায়, ভেদ যায় লুপ্ত হয়ে। শ্রীরাধা সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

"মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে কখনো কখনো "মুঞি সেঞি মুঞি সেঞি কহি কহি হাসে।"

প্রেমের এ চরম অবস্থা। তখন দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায়। কবীরদাস বললেন—"দুই গিয়ে এক হয়েছে, লহরী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে।" অন্যত্র বললেন, কবীর বলছে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যুগে যুগে তুমি আমি এক। [১]

প্রেমের এই যে চরম অবস্থা, এই যে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যাওয়া এর অর্থ কি? এর অর্থ কি ভগবৎ-সত্তার মধ্যে ভক্ত-সত্তার বিলুপ্তি? এ বিষয়ে সাধকেরাও সকলে একমত নন। এক দল বলেন, প্রেমের চরম অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে মিলন যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন ভক্তের স্বতন্ত্র সত্তা আর থাকে না। অন্যেরা তা মানেন না। তাঁরা বলেন, ভক্ত

---

১ অনূদিত পদ ৭৯

কখনো ভগবানের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে চায় না। পরিপূর্ণ মিলনের অবস্থায়ও সে তার পৃথক্ সত্তা রাখতে চায় ঐ মিলনেরই আনন্দ উপভোগের জন্য। সে এক হয়ে যাবে অথচ পৃথক্ থাকবে। কবীরদাসেরও এই মত ছিল মনে হয়। তিনি মনে করতেন, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে তবু থাকবে তার পৃথক্ সত্তা। সে মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে। এক হয়ে যাবে আবার পৃথক্ সত্তাও থাকবে এ কি রকম ক'রে হবে। কবীরদাস বলেন, লৌকিক দৃষ্টিতে যা অসম্ভব ভগবানের বেলা তা সবই সম্ভব। [১]

অনেকে কিন্তু কবারদাসের 'যুগে যুগে তুমি আমি এক', এই জাতীয় বাণীর উক্তি ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের এই জাতীয় বাণী স্পষ্টই অদ্বৈতভাবসূচক। আর এ রকম অদ্বৈত ভাবের কথা কবীর-দাসের পদে অনেকই পাওয়া যায়। এর থেকে তাঁরা মনে করেন কবীরদাস ছিলেন অদ্বৈতবাদী। কিন্তু এঁদের এই মত যথেষ্ট যুক্তির দ্বারা সমর্থিত মনে হয় না। কেন না, 'কবীরদাসের রচনায় শুধু অদ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতের পদ পাওয়া যায়।' [২] কাজেই, কবীরদাস বিশেষ কোনো একটা মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন বলা যায় না।

আসল কথা, কবীরদাস ছিলেন ভক্ত মানুষ। ভক্তের কাছে ভক্তিই মুখ্য, কোন মতবাদ নয়। তাই ভক্ত কোনো বিশেষ মতবাদের মধ্যে আটকা পড়েন না বা বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি তাঁর কোনো বিরুদ্ধ-ভাবও নেই। তার কারণ, ভক্তের ভগবান অনন্ত ভাবময় আর ভাবৈকগম্য। কাজেই, অনন্ত ভাবে মানুষ তাঁর ভজনা করতে পারে। আর সেই জন্য, ভগবদ্‌বিষয়ে অসংখ্য মতবাদ প্রচলিত হ'তে পারে। ভক্ত জানেন যে যে-ভাবেই ভগবানকে পেতে চায় ভগবান সেই ভাবেই তার কাছে ধরা দেন। কাজেই, ভক্তের কাছে সব মতই মত, সব পথই পথ।

এ বিষয়ে কবীরদাসের বাণী সুস্পষ্ট। হিন্দু মুসলমান এই দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা ধর্মমতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'হিন্দু-তুরুক আমি আলাদা মনে করি না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা।' [৩]

---

১ কবীর পৃঃ ২১২
২ কবীর পৃঃ ১১০
৩ অনূদিত পদ ১১০

তাই কবীরদাস কোনো মতেরই পক্ষ নিতেন না। তাঁর অভিমত ছিল ভক্ত মানুষ ভগবানের ভজনা করবে, তার কাছে ভক্তি হ'ল মুখ্য। মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামান তার পক্ষে নিছক বোকামি। অথচ দেখা যায়, সাধু সন্তরাও পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করেন। তাই কবীরদাস বললেন, 'পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করে' সারা জগৎ ভুলে রয়েছে। যে কোনো পক্ষ না নিয়ে শ্রীহরির ভজনা করে সেই সন্তই বুদ্ধিমান।[১]

কবীরদাস যেমন কোন মতবাদে আটকা পড়েন নি, কোন মতবাদের পক্ষ নেন নি, তেমনি নিজেও কোনো মতবাদ প্রচার করেন নি। কবীরদাস ত, শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন না যে মতবাদ স্থাপিত করবেন। তিনি ছিলেন তত্ত্ববিদ্, সিদ্ধ ভক্ত। ছিলেন ভগবৎ-প্রেমে পাগল মানুষ। মতবাদ স্থাপন ত দূরের কথা, কোনো বিচার-বিতর্কেরও তিনি ধার ধারতেন না। নিজেই বলেছেন, "লেখাপড়া শিখিনি। বিচার-বিতর্ক জানি নে। হরিগুণ কীর্ত্তন ক'রে ক'রে আর হরিগুণ কীর্ত্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি।"[২] অবশ্যি, পরবর্ত্তী কালে কবীরদাসের ভক্তরা তাঁর নামে মতবাদ প্রচার করেছেন, পন্থ গঠন করেছেন; কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়।

ভক্তরা ভগবান সম্বন্ধে নানা ভাবের কথা বলেন। তার কারণ হ'ল ভগবানের অনন্ত ভাবময়ত্ব। আর এ সব কথা অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী হয়। এ রকম হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়। যিনি একাধারে নির্গুণ এবং সকল গুণের আকর, নিরুপাধিক ও সোপাধিক, তাঁর সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী কথা বলাটাই বরং স্বাভাবিক। কবীরদাসের পদে যে নানা পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়, তারও এই হেতু। কবীরদাসের রাম নির্গুণ, ত্রিগুণাতীত, নিরুপাধিক, সোপাধিক, অনন্তভাবময়। কাজেই, তাঁর কথা বলতে গিয়ে কবীরদাসকে এমন সব কথা বলতে হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে যা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। তবে কবীরদাসের পদ আলোচনা করলে একটা কথা মনে হয় যে, তাঁর উপর বেদান্তের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। বেদান্ত বলতে সাধারণতঃ লোকে অদ্বৈতবাদই বোঝে। আমরাও সেই অর্থে বেদান্ত কথাটা ব্যবহার করেছি। শাস্ত্রানুসারে কিন্তু অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা তার বিভিন্ন প্রকার-ভেদ সবই

১ অনূদিত পদ ৭৩
২ অনূদিত পদ ৯০

বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকেই এ সব বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অদ্বৈতবাদী বেদান্তীদের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিরাকার নিরুপাধিক, নির্বিশেষ, নিষ্কল, নিঃসীম। তবে অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তির জন্য তাতে উপাধির আরোপ করা হয়।

কবীরদাসের রাম বেদান্তের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নন; আবার ভিন্নও বটেন। কেন না, কবীরদাসের রাম নির্গুণ, নিরুপাধিক, কিন্তু কবীরদাস নির্গুণ নিরুপাধিক ইত্যাদি বলতে গুণ উপাধি ইত্যাদির অভাব বুঝতেন না, এইগুলির অতীত অবস্থা বুঝতেন। অর্থাৎ তাঁর নির্গুণ রাম গুণহীন নন, গুণকে অতিক্রম করে রয়েছেন। তিনি অরূপ কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই রূপ। রূপের মধ্যেই চলেছে তার লীলা। জগতের সব বৈচিত্র্য এই অরূপেরই লীলার প্রকাশ। এই অরূপই কবীরদাসের রাম। সীমাকে পূর্ণ করেই রয়েছেন অসীম। সীমা চঞ্চল, অস্থির, অবিরাম গতিশীল। অসীম অচঞ্চল, স্থির, ধ্রুব। এই অসীমই কবীরদাসের রাম।

তিনি সর্বব্যাপী। স্রষ্টা তিনি, পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন আপন সৃষ্টি। কবীরদাস বলেছেন, সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন। এই চর্মচক্ষু দিয়েই চেয়ে দেখ তিনি যেখানে-সেখানে (সর্বত্র) আছেন।[১] বলছেন, সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান।[২] তিনি অন্তরে-বাইরে সর্বত্র। কবীরদাস বলেছেন—তিনি শরীরে মনে নয়নে রয়েছেন।[৩]

এমনি কবীরদাসের রাম। ইনি নির্গুণও বটেন সগুণও বটেন। আবার নির্গুণও নন সগুণও নন। আসলে ইনি নির্গুণ সগুণ উভয়ের অতীত। কবীরদাস স্পষ্টই বলেছেন—সগুণ এবং নির্গুণ এই উভয়ের অতীত যে, আমি করব তারই ধ্যান।[৪]

কাজেই এক দিক দিয়ে বেদান্তের ব্রহ্মের সঙ্গে কবীরদাসের রামের যথেষ্ট মিল আছে বলা যায়। এটা কেমন করে সম্ভবপর হ'ল। কবীরদাস বেদান্ত পড়েন নি নিশ্চয়ই। কারণ, তিনি নিজেই বহু স্থলে বলেছেন যে, তিনি লেখাপড়া জানেন না। তবে কাশীতে বহু বেদান্তী সাধু-সন্ন্যাসী ঐ সময়ে

১ অনূদিত পদ ১১২
২ অনূদিত পদ ৬৬
৩ অনূদিত পদ ৭১
৪ অনূদিত পদ ৪৯

ছিলেন। কবীরদাস তাঁদের সঙ্গ করেছিলেন অনুমান করা যায়। কবীরদাসের মানসে তাঁদের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তার চেয়েও মনে হয়, একমাত্র পরমাত্মার সাধক যোগপন্থীদের প্রভাবাধীন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্য কবীরদাসের মানস এমনি ভাবে গঠিত হয়েছিল যে, তাতে ভগবৎ-সত্তার যে উপলব্ধি হয়েছিল তার সঙ্গে বেদান্তের ব্রহ্মের সাদৃশ্য সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর এই মানস গঠনে বেদান্তী সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রভাবও থাকতে পারে তা আগেই বলেছি। অথবা, ভগবৎ-সত্তা কেন যে কবীরদাসের কাছে কবীরদাসের রামরূপে ধরা দিলেন তা তিনিই জানেন। হয়ত এ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল।

আর একটা বিষয়ে কবীরদাসের উপর বেদান্তের বিশেষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবীরদাস বার বার মায়ার কথা বলেছেন। এই মায়া আর বেদান্তের মায়া একই। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "কবীর মায়া সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সবই বেদান্ত নির্দ্ধারিত অর্থে।" [১]

বেদান্ত-মতে (অদ্বৈত দ্বৈত উভয় মতেই) মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। অদ্বৈত মতে মায়া জীব বা জীবভূত ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে, জীব-ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়। জীব তথা সৃষ্টি ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র এই যে বুদ্ধি তারই নাম মায়া। অদ্বৈতবাদীদের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবু যে অন্য কিছুর অস্তিত্ববুদ্ধি হয় তা ঐ মায়ার জন্যই হয়। কেন হয়? এর উত্তর তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন তাই হয়। নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম আপন মায়াশক্তি বা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সগুণ সোপাধিক হয়ে উঠেন। কেন হন, তার কারণ আর কিছুই নয় তিনি ঐরূপ ইচ্ছা করেন তাই হন।

দ্বৈতবাদীরা জীব এবং ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে ব্রহ্মও নিত্য, জীবও নিত্য, ব্রহ্মেরই সনাতন অংশস্বরূপ জীব। শ্রীভগবান বলেছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" [২] জীবলোকে আমারই সনাতন অংশ জীবভূত হয়েছে। কাজেই, জীবও শুদ্ধমুক্তস্বভাববান। ব্রহ্মের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু দেহধারণ করা মাত্র মায়াচ্ছন্ন হয়ে সে এ কথা ভুলে যায়। সে অনিত্য সংসার, অনিত্য দেহ আর তাকে

---

১ কবীর পৃঃ ১০৯

২ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা ১৫।৭

অবলম্বন ক'রে যত নশ্বর ভোগ-সুখ তাই নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। ভগবানের কথা তার আর মনে থাকে না।

এই যে মায়া, এ ব্রহ্মেরই শক্তি এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সাংখ্য একেই বলেন প্রকৃতি। মায়া বা প্রকৃতি গুণময়ী বা ত্রিগুণাত্মিকা। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়। এ ব্রহ্মেরই নামরূপাত্মক স্বরূপ।[১] ব্রহ্ম আপন সত্ত্বগুণপ্রধান মায়াকে অবলম্বন করে ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঈশ্বর। ইনি সংসারের কর্তা। বেদান্তের গ্রন্থে মায়াকে অবিদ্যাও বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যা, তদেতর অবিদ্যা, আবার কোনো কোনো গ্রন্থে কথা দু'টির মধ্যে পার্থক্য ও করা হয়েছে। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে বলা হয়েছে মায়া আর অবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে বলা হয়েছে অবিদ্যা। তবে সাধারণতঃ মায়া আর অবিদ্যা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবীরদাসও মায়া আর অবিদ্যাতে কোনো ভেদ করেন নি।[২]

কবীরদাস বহু পদে এই মায়ার কথা বলেছেন। তার কোনো কোনোটি রয়েছে সন্ধাভাষায়, কোনো কোনটি রয়েছে রূপকের আকারে আর বাকীগুলি আছে সহজ ভাষায়। সাংখ্যকারের মত কবীরদাস বললেন, "বিচার ক'রে দেখ, একই পুরুষ রয়েছেন আর নারীও রয়েছেন একই।"[৩] এই নারী মায়া। তাই বললেন—একই নারী জগৎ জুড়ে জাল পেতেছে। খোঁজ করে কেউ তার অন্ত পায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নয়। ঘটের ভিতর লাগিয়েছে নাগ-ফাঁস, ঠকিয়ে খাচ্ছে সারা জগৎ।[৩] এর অন্ত যেমন নেই, তেমনি এর আদিও নেই। বললেন —"এ চিরকুমারী, কেউ এর জন্ম দেয়নি। এ বিশ্ব-মনোমোহিনী, নানা মূর্তিতে জগৎকে ভুলায়। প্রথমে ছিল এ পদ্মিনী, তার পর হ'ল নাগিনী। এই নাগিনী সমস্ত জগৎকে তাড়া ক'রে খাচ্ছে।"[৪] জগৎ কিন্তু তা বোঝে না। এ সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রাখে। সবাই একে ভালবাসে। কবীরদাস একে বলেছেন বেশ্যা। এই যে মোহিনী, এই যে সুন্দরী যুবতী, এর ঠিকানাটা পর্যন্ত কেউ জানে না। কবীরদাস বলেন, "সমস্ত জগৎ একে ভালবাসে। কিন্তু এ নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে আপনি বেঁচে থাকে।"[৪]

---

১ কবীর পৃঃ ১০৪
২ ঐ ১০৮
৩ অনুদিত পদ ৩৮
৪ ঐ ৫৬

জগৎ মায়াময়, মায়ারই সৃষ্টি। সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কবীরদাস বললেন, "তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন, তিনিই সাজান, এ সবই গোবিন্দের মায়া।" [১] মায়া গোবিন্দেরই। কবীরদাস বললেন, "সব দেবতা মিলে একে শ্রীহরিকে দান করল। তাঁর সঙ্গে সে চার যুগ ধরে বাস করল।" [২]

আবার এ রঘুনাথের মায়া। মত্ত হয়ে জগৎ জুড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এর হাতে কারো রক্ষা নেই। পণ্ডিত মূর্খ সাধু সন্ন্যাসী ধ্যানী যোগী সবাইকে মারছে। ঋষ্যশৃঙ্গের মত ঋষি, মীননাথের মত যোগীকেও এ ঘায়েল করে দিল। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মার পর্যন্ত দিল মাথা ঘুরিয়ে। [৩] এই দুর্দান্ত নাগিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। উদ্ধারের উপায় আছে দু'টি। এক জ্ঞান অপর ভক্তি।

মায়া বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে জীবনকে যেন তন্দ্রাতুর করে দেয়। সদ্‌গুরু যাকে কৃপা করেন তার এই তন্দ্রা টুটে যায়। সে যথার্থ জ্ঞানলাভ ক'রে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পায়। কবীরদাস বলেন, যাকে গুরু জাগিয়ে দিয়েছেন—সে-ই উদ্ধার পেয়ে যায়। [৪]

সদ্‌গুরুর কৃপায় যে মায়া দূর হয় ভক্তরা এ কথা খুবই বিশ্বাস করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্মুখ ;
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ;
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ;
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ নিকট যায়।" [৫]

---

১ অনূদিত পদ ৫৫
২ ঐ ৫৬
৩ ঐ ৩৭
৪ ঐ ৩৮
৫ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২

গুরুর উপদেশে মায়া দূর হ'লেই লোকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। আবার যাঁরা ভক্ত, যাঁরা অন্য সব ছেড়ে একান্তভাবে ভগবানকেই আশ্রয় করেন মায়াকে তাঁরা অতিক্রম করে যান। শ্রীভগবান বললেন—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। [১]

—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা একান্ত ভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাঁরা একে অতিক্রম করতে পারেন।

যথার্থ ভক্তের কাছে মায়া জব্দ। সে সবার উপর প্রভুত্ব ক'রে বেড়ায় 'কিন্তু হরিভক্তের বাড়ীতে সে দাসী।' ভক্তকে মায়া বদ্ধ করতে পারে না এই ছিল কবীরদাসের দৃঢ় মত।

আমরা পূর্বেই বলেছি, কবীরদাস শাস্ত্র-পড়া মানুষ ছিলেন না। তবে এই বেদান্তোক্ত মায়ার কথা জানলেন কি করে? সম্ভবত সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন। অথবা তার চেয়েও সম্ভবপর মনে হয়, স্বীয় গুরু রামানন্দের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে উপদেশ পেয়েছিলেন। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "কবীরদাস মায়া সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সবই বেদান্তনির্দ্ধারিত অর্থে। খুব সম্ভব ভক্তিসিদ্ধান্তের সঙ্গে মায়া সম্বন্ধীয় উপদেশও তিনি গুরু রামানন্দের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।" [২]

কোনো লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য কতকগুলি উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। লক্ষ্যের জন্যই উপলক্ষ্য। কিন্তু এমন যদি হয় যে. উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তা হ'লে তা অর্থহীন বিড়ম্বনা মাত্র হয়ে পড়ে।

পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্বালোচনা, নিয়ম-ব্রত-পূজা-আর্চা এ সব উপলক্ষ্য। এ সবের লক্ষ্য হ'ল আত্মজ্ঞানলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে এ কথা ভুলে যায়। তারা লক্ষ্য ভুলে গিয়ে উপলক্ষ্যকেই প্রধান ক'রে তোলে। তারা মনে করে, এই উপলক্ষ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা আর লক্ষ্যে পৌছান একই কথা। এই জন্য তারা উপলক্ষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। সাধারণ লোকে এদের খুব

---

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।১৪

২ কবীর পৃঃ ১০৯

ধার্মিক বলে মনে করে, মনে করে এরা অবশ্যই ভগবানকে পেয়েছে। আবার এরা নিজেরাই অনেকে তাই মনে করে।

এই শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় শাস্ত্রবিদ্ বা মন্ত্রবিদ্। এরা শাস্ত্র জানে, বেদ-কোরাণে এরা পারদর্শী, ধর্মের বহুবিধ ব্যাখ্যা এরা করতে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এরা শাস্ত্রবিদ্ বা মন্ত্রবিদ্ বলেই যে আত্মবিদ্ হয়েছে বা ভগবানকে পেয়েছে, তা স্বতঃই সিদ্ধান্ত করা যায় না। বেদান্ত জানা আর আত্মবিদ্ হওয়া এক কথা নয়। যারা সচেতন, নিজের সম্বন্ধে তাদের কোনো ভুল ধারণা নেই। নিজের অকৃতার্থতার কথা তারা জানে। তারা যে আত্মবিদ্ হ'তে পারে নি বা ভগবানকে পায়নি এ তারা জানে। আর জানে বলেই নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান বা ধর্মাচরণের জন্য বড়াই করে না বা তাকেই চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে না।

কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত ধার্মিকই এই ধরণের মানুষ নয়। তারা উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য বলে মনে করে। ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মনে করে; ধর্মের মর্ম জানে না তবু করে ধর্মের ব্যাখ্যা; ঈশ্বরকে পায় নি তবু ঈশ্বর সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে। গুরু সেজে মানুষকে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বাহ্যাচারসর্বস্ব ধর্মধ্বজী, আবার অনেক ক্ষেত্রে ভণ্ডও বটে। মরমী কবি চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

"মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তা'রা।"

কবীরদাস কিন্তু এদের এত মোলায়েম কথা বলেন নি। তিনি এদের কঠোর ভাবে আঘাত করেছেন। কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, আত্মবিদ্। ভগবানকে তিনি পেয়েছিলেন। তাই পুঁথি পড়তে না জানলেও শাস্ত্রের তথা ধর্মের মর্ম তিনি জেনেছিলেন। এই জন্য এই ধরণের আঘাত করার তাঁর অধিকার ছিল। যেখানেই তিনি দেখেছেন লক্ষ্য ভুলে মানুষ উপলক্ষ্যকেই প্রধান করে তুলেছে, যেখানেই দেখেছেন সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি চলেছে, চলেছে ভণ্ডামি, সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান কাউকেই রেহাই দেন নি।

কবীরদাসের কাছে ভগবান পুঁথির কথা মাত্র, তত্ত্ব মাত্র ছিলেন না, তাঁর কাছে ভগবান ছিলেন প্রত্যক্ষ সত্য। এই জন্য পুঁথিপড়োর সঙ্গে তাঁর মিলত না। তাই এক জায়গায় বলেছেন—"ওরে, তোর মন আর আমার

মন কি ক'রে এক হবে? আমি বলছি চোখে দেখি আর তুই বলছিস পুঁথিতে লেখা আছে।"[১]

শুধু পুঁথিই যারা পড়ে, পুঁথির মধ্যেই তারা বাঁধা পড়ে যায়। পুঁথির লক্ষ্য যে ভগবান তা এরা ভুলে যায়। এমনি কি পুঁথি পড়ে পড়ে এদের মন হয়ে যায় সঙ্কীর্ণ, এদের সাধারণ বিচারবুদ্ধি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। এদের লক্ষ্য করেই কবীরদাস বল্‌লেন, "ভাই, বেদ-কোরাণ মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে মনের চিন্তা যায় না।"[২] বল্‌লেন, "পাঁড়েজী, বেদ-কিতাব এ সব ছেড়ে দাও। এ সব মনের ভ্রম মাত্র।"[৩] কবীরদাস শুধু পাঁড়েজীকেই বেদ-কিতাব ছাড়তে বলেন নি, মোল্লা সাহেবকেও কোরাণ-কিতাব ছাড়তে বলেছেন।

তার কারণ, এই সব পুঁথিপড়োদের দেখে দেখে কবীরদাসের ধারণা হয়েছিল পুঁথি ভগবানকে ঢেকে দেয়। পুঁথিপড়োরা পুঁথিকেই জানে ভগবানকে জানে না। তাই তিনি বাহ্যাচারসর্বস্ব হিন্দু পণ্ডিত ও গুরুরা যে ভগবানকে জানে না, এ কথা যেমন বলেছেন তেমনি বললেন, "অনেক পীর আর আউলিয়া দেখেছি, তারা কিতাব-কোরাণ পড়ে, শিষ্য করে, কবর দেওয়ার বিধান দেয়। এরাও খোদাকে জানে না।[৪]

তা ছাড়া কবীরদাস বিশ্বাস করতেন এবং তিনি জেনেছিলেন, ভগবান বেদ-কোরাণের অগম্য। কিন্তু এ সব কথা কেউ মান্‌ত না। তাই দুঃখ করে বলেছেন, "তিনি বেদ-কোরাণের অগম্য এ কথা বল্‌লে পর কেউ বিশ্বাস করে না।"[৫]

কবীরদাস বেদ-কোরাণ ছেড়ে দিতে বলেছেন বলে' জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন; তবে সে জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই। তাঁর ভক্তিও ছিল জ্ঞান-সম্পৃক্তা ভক্তি।

কবীরদাস বার বার বলেছেন তত্ত্ববিচারের কথা। তত্ত্ববিচার না থাকলে অধ্যাত্মসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তত্ত্ববিচার না থাকলে ফোঁটা-তিলক কাটা,

---

১ অনুদিত পদ ৬১

২ অনুদিত পদ ১১২

৩ অনুদিত পদ ৫১

৪ অনুদিত পদ ৬৫

৫ অনুদিত পদ ৪৪

জটাধারণ, মাথা মুড়ান, সন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি বাহ্যাচারে কিছুই হয় না। [১] যে সব লোক জ্ঞান-ধ্যানের মর্ম জানে না অথচ ধার্মিক সেজে মোহান্ত হয়ে বসে, কবীরদাস তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন।

পরমার্থ-তত্ত্ব ভুলে যারা ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মনে করে সেই সব অজ্ঞ লোক সত্যকে পায় না। তা'রা নিজেরাও ডোবে অন্যদেরও ডোবায়। তাই, কবীরদাস বললেন—"ওহে গোরখ, শোন, অন্তরে সর্বদা তত্ত্ববিচারই যাঁদের আহার তাঁরা পরিজন সহ উদ্ধার পেয়ে যান। [১]

কবীরদাসের মতে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার অন্যতম উপায় যে জ্ঞান, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। গুরুকৃপায় এই জ্ঞানলাভ হয়। গুরু শুধু ভক্তি উপদেশ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানও উপদেশ করেন!

কিন্তু কবীরদাস কোনো কিছুই বিচার না ক'রে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর একটা জোরাল সহজ বিচারবুদ্ধি ছিল। তিনি তা দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নিতেন, সেই বিচারে যা অযৌক্তিক মনে হ'ত তিনি তা কিছুতেই মেনে নিতেন না। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু ধর্মের তীর্থ-ব্রতাদি বাহ্যাচার যে তিনি মানতেন না, তার কারণ তিনি এই সব যুক্তিহীন মনে করতেন। তিনি যেমন বিনা বিচারে কিছু মেনে নিতেন না তেমনি অন্যকেও যখন কিছু বলেছেন, তখন তা বিচার করে দেখতে বলেছেন।

এমন কি, গুরুর উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি বিচার করতে বলেছেন। [২] কবীরদাসের অভিমত ছিল, সাধুরা হবে জ্ঞানী। তাই বল্‌লেন, সাধুর জাতি জিজ্ঞেস করো না, তাঁর জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞেস কর। [৩] অধ্যাত্মসাধনার্থীদের তিনি উপদেশ দিলেন—"জ্ঞানের হাতী চড়। তার পিঠে বিছিয়ে নাও সহজের তুলিচা। সংসারটা কুকুরের মত, সে আপসোস মিটিয়ে ঘেউ ঘেউ করুক না।" [৩]

কবীরদাসের যোগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন তিনি জানতেন। এই যোগসাধনায়ও তিনি জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "জ্ঞান ছাড়া যোগ ব্যর্থ।" [৪] তা ছাড়া, কবীরদাসের অদ্বৈত-

১ অনুদিত পদ ৩৪

২ অনুদিত পদ ৪৮

৩ অনুদিত পদ ৬০

৪ কবীর পৃঃ ১৫৯

ভাবের পদগুলিতে ত তিনি নিছক ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলেছেন। কাজেই, কবীরদাস পুঁথির বিরোধী হ'লেও জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না।

ভক্তিপথে বিশ্বাস প্রধান সম্বল। বিশ্বাস না থাকলে ভক্তি সম্ভবপরই হয় না। বিশ্বাস না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস কিন্তু দু'রকমের। এক, জ্ঞানীর বিশ্বাস ; আর এক অজ্ঞানের বিশ্বাস। সত্যিকারের বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানীর বিশ্বাস যার নেই, ধর্মের সব রকম বাহ্যাচার পালন করলেও তার কিছুই হয় না। ভগবানকে সে পায় না। বললেন কবীরদাস, "মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস্ লম্বা জটা। ওরে, তোর ভিতরে যে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে ক'রে প্রভুকে পাওয়া যায় না।" [১]

কবীরদাসের মূল লক্ষ্য প্রভুকে পাওয়া। সেই লক্ষ্যকে যা আড়াল ক'রে দাঁড়ায়, কবীরদাস ছিলেন তারই বিরোধী ; তিনি তীব্র ভাবে তাকেই আক্রমণ করেছেন। ধর্মের বাহ্যাচারের যে তিনি নিন্দা করেছেন তার কারণও এই। শুধু তিনি বাহ্যাচারের নিন্দা করার জন্যই নিন্দা করেন নি। তিনি সব কিছুকে দেখেছেন প্রেমভক্তির দৃষ্টিতে। যা প্রেমভক্তিকে আবৃত করে দেয় তিনি তাকেই আঘাত করেছেন। প্রেমভক্তি থাকলে বাহ্যাচার রইল কি রইল না, তা নিয়ে কবীরদাসের মাথাব্যথা ছিল না। [২]

তিনি দেখেছিলেন, লোকে মূল লক্ষ্য ভুলে গিয়ে ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান-পালনকেই ধর্ম বলে মনে করছে। অনেকেই এই সবের পিছনের তত্ত্ব কি তা কিছুই জানত না, শুধু অন্ধভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বহীন যুক্তিহীন প্রথার অনুসরণ করত। ধর্মাচরণ তাদের কাছে একটা জড় অভ্যাস মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকের ধারণা, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এই বাইরের দিকটার সঙ্গেই কবীরদাসের পরিচয় ছিল। শুধু যোগমতের তত্ত্বের দিকটাও তিনি জানতেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচারের পিছনে যে সব তত্ত্ব আছে তা তিনি জানতেন না বা জানবার চেষ্টাও করেন নি।

এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় কবীরদাসের পদ থেকেই। যে সব ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচার খণ্ডন করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রে

---

১ অনূদিত পদ ১৫

২ কবীর পৃঃ ১৩৫

সর্বত্রই তিনি ঐ সব বাহ্যাচারের সমর্থক পণ্ডিত, পাঁড়ে, কাজী বা মোল্লাকে নিতান্ত মুর্খ ভেবেছেন মনে হয়। কারণ প্রতিপক্ষ হিসাবে তারা তাদের মতের সমর্থনে যে সব যুক্তি দিতে পারত তিনি সে সবের কথা ভেবে তা খণ্ডন করেন নি।[১]

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন, কবীরদাসই প্রথম হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারের খণ্ডন করেন নি। এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। কবীরদাসের আগে হঠযোগীরা এ কাজ করেছেন, তারও আগে করেছেন সহজযানী সিদ্ধ ও জৈন সাধকেরা।[২]

কবীরদাসের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, যোগপন্থী প্রভৃতি সবার মধ্যেই যারা ধর্মের বাহ্যাচারকে ধর্ম মনে করত এমনি মানুষের সংখ্যা ছিল বেশী। কবীরদাস এ সব ভ্রান্তদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে ক'রে নানা ভাবে আঘাত ক'রে ক'রে তাদের চোখ ফুটাবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, যোগপন্থী কেউ তাঁর হাতে নিস্তার পায় নি।

মোল্লা আজান দেয়, চেঁচিয়ে ডাকে আল্লাকে। কবীরদাস তাকে দিলেন এক খোঁচা। বললেন, "মোল্লা হয়ে যে আজান দিস্, তোর প্রভু কি কালা? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও যে প্রভু শুনতে পান।"[৩]

সাধু-সন্ন্যাসীরা জটা রাখে, মাথা মুড়ায়, গায়ে ছাই মাখে, সন্ধ্যা-তর্পণ করে, মূর্তিপূজা করে। কবীরদাস বলেন, যদি এ সবের পিছনে তত্ত্ববিচার না থাকে, যদি এ সবের দ্বারা ভগবানকে না পাওয়া যায় তাহ'লে এগুলো দিয়ে কি হবে?[৪]

ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ কোনো মূল্য কবীরদাসের কাছে ছিল না। এগুলোকে তিনি ছোট মেয়ের পুতুল-খেলার মত মনে করতেন। বলেছেন, পূজো, সেবা, নিয়ম-ব্রত এসব যেন ছোট মেয়ের পুতুল-খেলা। যতক্ষণ প্রিয়তম স্পর্শ না করেছেন ততক্ষণ এ সব অনেক সংশয় থাকে।[৫] প্রিয়তমের স্পর্শ পেলে, অন্তরে প্রেমভক্তি জাগলে বাহ্যাচার আপনি দূর হয়ে যায়।

---

১ কবীর পৃঃ ১৩২

২ কবীর পৃঃ ১৩৩-৩৫

৩ অনূদিত পদ ১৫

৪ অনূদিত পদ ৩৪

৫ অনূদিত পদ ৫৯

কবীরদাসের ভক্তি রাগানুগা। কাজেই বৈধী ভক্তির আনুসঙ্গিক পূজা, সেবা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান তিনি যে নিরর্থক মনে করতেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

মন্দির, মসজিদ, তীর্থ, ব্রত, মূর্ত্তি এ সব সম্বন্ধেও কবীরদাসের অনুকূল মনোভাব ছিল না। তিনি এই সবকেও ব্যর্থ মনে করতেন। তাই বলেছেন, 'এই দুনিয়া দেবালয়ে পূজো করে, করে তীর্থব্রত। চলা-ফেরাতেই পায়ে ব্যথা ধরে যায় এ দুঃখ কোথায় রাখব।' [১] বলেছেন, 'সত্য স্রষ্টকর্তা যিনি তিনি সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মূর্ত্তির মধ্যে নাই।' [২]

সম্ভবতঃ এই সবের পিছনের তত্ত্বও তাঁর জানা ছিল না। তাঁর সময়কার বাহ্যাচারসর্বস্ব ধর্মসম্প্রদায়গুলি দেখে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যারা মন্দির, মসজিদ, মূর্ত্তি ইত্যাদি মানে তারা মনে করে শুধু ঐ সবের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। এই জন্য তিনি এ সবেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার? উত্তর নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, 'অন্তরে আছেন ভগবান, আছেন তিনি জগৎ জুড়ে। আর তাঁর মধ্যেই তীর্থ, মূর্ত্তি সব রয়েছে। বাইরে কে খুঁজে মরে।' [৩]

কবীরদাসের ধর্ম ছিল প্রেমভক্তির ধর্ম। আর তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন করুণ-হৃদয় মানুষ। এই জন্য সকল প্রকার হিংসার তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী। বিশেষ করে ধর্মের নামে পশুহত্যার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। দেবীপূজক শাক্ত পাঁড়েকে ত তিনি নিপুণ কসাই বলেছেন। বলেছেন, 'পাঁড়ে এক পলকের মধ্যে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে নিজের আত্মাকেই বধ করে।' [৪]

মুসলমানের গোবধেরও তিনি একই রকম নিন্দা করেছেন; বলেছেন, 'যে গোবধ করে তাকে বলে তুরুক। এই লোকটা পাঁড়ের চেয়ে কম কিসে?' [৪]

বস্তুতঃ কবীরদাস হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারের মত মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচারেরও এমনি ধরণের নিন্দাই করেছেন। সাধারণ মুসলমানেরাও সাধারণ হিন্দুদের মত ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মানে। পীর-মুরশিদের কথা মত চলে, কলমা পড়ে, নমাজ পড়ে, রোজা রাখে। তাদের ধারণা, এতে করে তারা বেহেস্তে

---

১ অনুদিত পদ ১১৩

২ অনুদিত পদ ১১২

৩ অনুদিত পদ ১৭

৪ অনুদিত পদ ৫২

(স্বর্গে) যেতে পারবে। মুসলমান সমাজে পীর-মুরশিদের খুব প্রভাব। তাদের সম্বন্ধে কবীরদাস বলছেন, 'তারা রোজা করে, নমাজ পড়ে, কলমা পড়ে, কিন্তু তাতে ত স্বর্গ মিলে না।' [১] তিনি ধর্মকে অন্তরের জিনিষ মনে করতেন। তাই বলেছেন, 'এক মনের ভিতরেই আছে সত্তরটি কাবা। যে দর্শন করবে সেই জানবে।' [১]

কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর মতে আসল কথা হ'ল প্রিয়কে চেনা, প্রভুকে চেনা, তাঁকে পাওয়া। তাই বললেন, 'প্রিয়কে চেন। একটু দয়া কর আপনাকে। ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করো। প্রভু কাছেই এসে রয়েছেন জেনো।' [১]

কবীরদাসের উপর যোগমতের বিশেষ প্রভাব ছিল এ কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর বহু পদে তিনি যৌগিক পরিভাষার, যোগমতের যুক্তির ও বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর আপন সাধনার কথা বলেছেন। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদির কথা বহু বার তিনি বলেছেন। যোগসাধনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল। তিনি যোগের যথার্থ মর্মও জানতেন। কবীরদাস বলতেন, 'জ্ঞান ছাড়া যোগ ব্যর্থ। চরম সত্যকে শারীরিক ব্যায়াম আর মানসিক শমদমের দ্বারা পাওয়া যায় না। যোগের প্রতিপাদ্য যে পরমপুরুষ তিনি আত্ম-গম্য, চোখ আর কানের বিষয় নয়। যথার্থ জ্ঞান হ'লেই তবে তাঁকে পাওয়া যায়।' [২]

কবীরদাস লক্ষ্য করেছিলেন যোগীদের মধ্যেও বাহ্যাচারসর্বস্বতা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ যোগীরই সাধনার চেয়ে ভেকের উপর নজর বেশী। তাই এদেরও তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। বলেছেন, 'ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি হিজড়া।' [৩]

কবীরদাস মার্জিত ভাষার ধার ধারতেন না। ভণ্ডামি দেখলে তিনি এই ধরণের যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিতেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা অনেকেই তাই করেন। সাধুসন্তদের কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁরাই এ কথার সাক্ষ্য দেবেন।

---

১ অনূদিত পদ ১৬৯

২ কবীর পৃঃ ১৫৯

৩ অনূদিত পদ ১৪

যোগসাধনার মধ্যে একটা দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে বহির্বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হয়। তবেই যোগের চরম অবস্থা সমাধিতে পৌছান যায়। কিন্তু একবার সিদ্ধিলাভ করলে আর এ সবের প্রয়োজন হয় না। তখন যোগ হয়ে যায় সহজ, তখন ইন্দ্রিয় এবং মনকে প্রত্যাহার বা রুদ্ধ করতে হয় না; তারা সহজেই ভগবদ্‌মুখী হয়ে যায়।

এই অবস্থা হলে ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়ে যায় তেমনি সহজ যেমনি সহজ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস। তখন সাধক যা করেন তাই অধ্যাত্মসাধনার একটা না একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কবীরদাসের এই অবস্থা হয়েছিল। তাই, তিনি বলেছেন, সহজ যোগ, সহজ সমাধির কথা। এ কেমন। বলেছেন কবীরদাস—'চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দি না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ দেখি। যা বলি সেই নাম, যা শুনি সেই স্মরণ, যা কিছু করি সেই পূজা, যেখানে সেখানে যাই তাই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শুই তখন সেইটেই হয় দণ্ডবৎ। অন্য দেবতার আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হয়ে আছে আমার মন। খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠতে বসতে কখনো (তাঁকে) ভোলে না। এমনি হয়েছে প্রগাঢ় মিলন। কবীর বলছে এমনি ধারা আমার উন্মুনি ভাব অর্থাৎ সমাধির অবস্থা।'[১] এই সমাধির অবস্থায় কি হয়, কবীরদাস বললেন, 'সুখ-দুঃখের পরে এক পরম সুখ। তার মধ্যে প্রবেশ করে থাকি।'[১]

সহজ যোগের অবস্থায় নাম-জপ, ভজন, সেবা এ সব আর আলাদা করে করতে হয় না। কিন্তু এই সহজ যোগ ত আর সহজ নয়, তা কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ। কাজেই তিনি সহজ যোগের অবস্থায় পৌছাবার আগে নাম-জপ, ভজন, এবং সেবার কথা বলেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে নামের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কলিযুগের নামই ধর্ম, নামই একমাত্র গতি।

> "ব্যক্ত করি ভাগবত কহে আর বার
> কলিযুগে ধর্ম নামসঙ্কীর্তন সার।"[২]

---

১ অনূদিত পদ ১৪

২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি, ৩য়

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

অন্য যুগে যাগযজ্ঞ পূজা-আরাধনা ধ্যানধারণাদির দ্বারা যে ফল হ'ত, কলিযুগে শুধু নামেই তা হয়।

"আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়।[১]

শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকঃ মহান্ গুণঃ
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥"[২]

হে রাজন্, কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হ'লেও তার একটি মহান্ গুণ আছে। এই যুগে মানুষ কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই মায়াবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করতে পারে।

প্রেমভক্তির সাধকেরা নামের এর চেয়েও বড় মাহাত্ম্যের কথা বলেন। ভক্তের কাছে মুক্তির চেয়েও কাম্য ভগবৎপ্রেম, নামে সেই ভগবৎপ্রেম লাভ হয়।

"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।"[৩]

নামের মাহাত্ম্যে মহাপাতকী দস্যু সাধুভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী হয়ে গেছে, এ রকম অসংখ্য কাহিনী ভক্তিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কবীরদাসও বহু পদে নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিনয় করে বলেছেন, 'বোবার গুণ গাওয়ার মত ভাষা নেই ত নামের বড়াই করব কি করে?'[৪] নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—'যার নামের নেশা একটু লেগেছে গণিকা হোক আর সদন কসাই-ই হোক সে ত'রে গেছে।'[৪]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

"নামাভাস হইতে হয় সর্বপাপ ক্ষয়"

কবীরদাসও বললেন—'অধর-কটোরায় নামৌষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে।'[৫]

---

১ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য। বিংশ।

২ শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৩৪

৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৩য়

৪ অনূদিত পদ ৭৭

৫ অনূদিত পদ ৮২

নামের আছে অমৃত-স্বাদ। যে একবার সে-স্বাদ পেয়েছে সে আর নাম ছাড়তে পারে না। কবীরদাসেরও তাই হয়েছিল। দিন-রাত, তিনি নাম করতেন। বলেছেন, 'নিশিদিন আমি প্রভুর নাম নি।'[১]

নামের নেশা আছে। এ দারুণ নেশা। 'নামের দিকে দৃষ্টি দিলে নেশা বাড়ে। নাম শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। আর নাম স্মরণ করলেই মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য নেশা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে আর কমে। কিন্তু নামের নেশা দিন দিন সওয়া গুণ করে বাড়তে থাকে।'[১]

যার এই নেশা হয় সে মাতাল হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়। কবীরদাসও পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বলছেন, 'সব দুনিয়া সেয়ানা আর আমি পাগল। ...হরিগুণ কীর্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি।'

অনেক ভক্তিগ্রন্থ তথা ভক্তদের মতে যে কোনো প্রকারে হোক্ একবার মুখে নাম নিলেই নামের ফললাভ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসের ২৮৯ অঙ্কে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের একটি স্তোত্রে আছে—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।"

"ভগবানের যে কোনো একটি নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত অথবা মনঃস্পৃষ্ট কিংবা কর্ণগোচর হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ অথবা ব্যবহিত কিংবা কোনো অংশে রহিত হইলেও নিশ্চয়ই সংসার হইতে পরিত্রাণ করে।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভের কথা বলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী।"[২]

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥" (৬।২।৪১)

---

১ অনূদিত পদ ৭৭

২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত্য। ৩য়

"অজামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধাপূর্বক যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করতঃ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল তখন যে শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম কীর্তন করিলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায়, ইহা আর কি বলিব ?"

তবে উপযুক্ত আধার না হ'লে নামের ফল ফলতে বিলম্ব হয় এ কথাও তাঁরা বলেছেন। উদ্ধৃত শ্লোকের অপরাংশে আছে—

"পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"

'হে বিপ্র, যদি সেই নাম দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডি-মধ্যে বিন্যস্ত হয়, তবে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ বিলম্বে হয়।'

কবীরদাসের কিন্তু এরূপ বিশ্বাস ছিল না। মনের সঙ্গে কোনো যোগ না রেখে শুধু মুখে নাম নিলেই মুক্তি পাওয়া যায় এ সব কথা তিনি স্বীকার করতেন না। বলেছেন, 'পণ্ডিত মিছে কথা বলে। রাম রাম বললেই যদি দুনিয়ার লোক উদ্ধার পায় তাহ'লে চিনি চিনি বললেই ত মুখ মিঠে হবে, আগুন আগুন বল্‌লে পুড়ে যাবে, জল জল বল্‌লে তৃষ্ণা মিটবে আর ভোজন ভোজন বল্‌লে ক্ষিদে দূর হবে।'[১]

শুধু মুখে নাম নিলে কিছু হয় এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না। নিজের মতের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন টীয়া পাখীর। বলেছেন, 'টীয়া পাখী যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ হরি হরি বলে কিন্তু তার উপর হরিনামের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায় তাহলে সে-নামের কথা তার আর মনেই পড়ে না।'

কবীরদাস মনে করতেন মানুষের মধ্যেও আছে অনেক টীয়া পাখী। তারা মুখে রাম রাম বলে কিন্তু তাদের সত্যিকারের প্রীতি বিষয়ের প্রতি, তারা মায়াবদ্ধ, তাদের অন্তরে প্রেম জন্মায় নি। সেই জন্য তারা মুখে রাম নাম বললেও তাদের বেঁধে যমপুরীতে নিয়ে যায়। তাদের মুক্তি হয় না।

ভক্তের প্রধান কাজ ভগবদ্‌-ভজন। এ ছাড়া আর সবই তার পক্ষে অকাজ। কবীরদাস বললেন, 'আমি জানি, হরিভজন ছাড়া আর সবই অনুচিত।[২] এ কথার অর্থ এ নয় যে, কবীরদাস ভজন ছাড়া আর কিছু করতে নিষেধ করেছেন। কেন না, তাঁর বাণীর এই অর্থ করলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, কবীরদাসের মতে বিশ্বশুদ্ধ লোকের সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী

১ অনূদিত পদ ৫৪

২ অনূদিত পদ ১১১

হয়ে শুধু 'ভজ গোবিন্দ' করা উচিত। কিন্তু কবীরদাস স্বয়ং ছিলেন গৃহী আর তাঁর শিষ্যেরাও প্রায় সবাই ছিলেন গৃহী; কাজেই, এ রকম কথা তিনি বলতে পারেন না। এই জন্য আমাদের মনে হয়, তাঁর বাণীর অর্থ হ'ল ভক্ত যা করবে তাই ভগবদ্‌ভজন মনে করে করবে।

কবীরদাস বিশেষ করে বলেছেন সেবা-কর্মের কথা। বললেন, 'বান্দা, সেবাই তোর কাজ।' ভক্ত ভগবানের দীন সেবক, তাঁর বান্দা। সেবকের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। তাই, কবীরদাস বললেন সেবাই তোর কাজ। ভক্তিশাস্ত্রে এই ভাবের বহু সমর্থন পাওয়া যায়। ভক্তের কাছে ভগবৎ-সেবার বাড়া আর কিছুই নেই। সেবা ছেড়ে ভক্ত মুক্তি পর্যন্ত চান না। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন,—

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (৩।২৯)

—'আমার সেবা ব্যতিরেকে শুদ্ধ ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।'

কাজেই, এই যে ভগবৎসেবাকেই ভক্তের কাজ বলে কবীরদাস ঘোষণা করলেন এ নূতন কথা নয়। ভক্তিধর্মের মধ্যে এর ঐতিহ্য বরাবর ছিল। কবীরদাস হয়ত গুরু রামানন্দের কাছ থেকে এটি পেয়েছিলেন।

কবীরদাস কিন্তু ভগবৎ-সেবা বলতে বৈধীভক্তির সাধারণ সাধকদের মত কাঠ, পাথর বা মাটির কোন ভগবৎমূর্তির সেবা-পূজা মনে করতেন না। কেন না, তিনি মূর্তি-পূজা মানতেনই না। তাঁর সেবা অর্থ মানুষের সেবা, নর-নারায়ণের সেবা। কেন না, জগতে যত নরনারী জন্মেছে সবই রামের রূপ বলে তিনি মনে করতেন।[১] এই ভাবটিও ভারতের আধ্যাত্ম-সাধনার ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিল। বাহ্যাচার-প্রধান ধর্মের আওতায় এটি আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। কবীরদাস আবার এইদিকটার উপর জোর দেন।

কবীরদাস হিন্দুধর্মের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানতেন বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা এর আগে একবার আলোচনা করেছি। তবে এ কথাও সত্য যে, 'তাঁর পরমার্থতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব হিন্দুচিন্তার দ্বারা ওতপ্রোত ছিল।'[২]

---

১ অনূদিত পদ ১৭

২ Kabir and his Followers P. P. 68-70

তিনি হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই মানতেন না আবার কয়েকটি প্রধান মতবাদ মানতেনও।

কবীরদাস যে মায়াবাদ মানতেন তা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য তাঁর মায়া শঙ্করাচার্যের মায়া থেকে একটু অন্য রকমের, তাও দেখা গেছে।

তা ছাড়া কবীরদাস কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ মানতেন।[১] কর্মবাদের সহজ অর্থ—'যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল তার পায়।' আর এই ফল ভোগ করতে হয় জন্ম-জন্মান্তর ধরে। ফলভোগ করতে গিয়ে জীব আবার কর্ম করে। আবার তাকে এই নূতন কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করবার জন্য হ'ল এই জন্ম। তার পর এই জন্মের কর্মফল ভোগ করবার জন্য হবে আবার জন্ম। এমনি চলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রবাহ। কবীরদাসেরও এই মত ছিল। তিনি বললেন, 'এখানেত সবাই নিজের কর্ম ভোগ করছে।' কর্মকেও তিনি বন্ধন মনে করতেন। এ বড় কঠিন বন্ধন। একে কাটাতে পারে কে? কবীরদাস বলেন, 'যে সমাধিমগ্ন হয়ে অলখ পুরুষকে দেখতে পায় তার কর্মবন্ধন আধি-ব্যাধি সব দূর হয়ে যায়।'[২]

কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এর একটিকে মানলে আর একটিকেও মানতে হয়। কবীরের অনেক পদেই এর নিদর্শন আছে। একটি পদে তিনি বলেছেন, 'কবীরের কর্মটি দেখ। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য সেই অলখ পুরুষকে করল বন্ধু। এ আর কিছু নয়—জন্মজন্মান্তরের ললাটলিপি।'[৩]

জন্মান্তর মানলে আর একটি মতবাদও মানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে হ'ল আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদ। কেন না, জন্মান্তরের কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে জন্মান্তর হয় কার? জন্ম কথাটারই বা অর্থ কি? উত্তরে বলা যায়, জন্মান্তর হয় জীবের। তক্ষুণি প্রশ্ন হবে জীব কে? জীবদেহ জীব নয়। এই জন্য মৃত্যুকে বলে দেহত্যাগ করা। কাজেই যিনি দেহত্যাগ করেন, প্রাণত্যাগ করেন, তিনি দেহ নয়, প্রাণ নয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই দেহাতিরিক্ত প্রাণাতিরিক্ত বস্তুকে বলেছেন আত্মা।[৪]

১ Kabir and his Followers P. P. 76·78

২ অনূদিত পদ ৩৫

৩ অনূদিত পদ ১০৪

৪ কঠোপনিষৎ ২।২।৪.৫

আত্মার দেহধারণের নাম জন্ম। দেহ থেকে বিযুক্ত হওয়ার নাম মৃত্যু আর দেহান্তর-প্রাপ্তির নাম জন্মান্তর। জীব এই আত্মা, জীবদেহধারী আত্মা। একে বলা হয় জীবাত্মা। এখন প্রশ্ন উঠবে, কে এই আত্মা ? জীব বা জীবাত্মা বলায় ত কিছুই পরিষ্কার হ'ল না। তা' ছাড়া আত্মাকে জীবাত্মা বলায় অর্থাৎ আত্মার জীব এই উপাধি ব্যবহার করায় আত্মার নিরুপাধিকত্বও স্বীকার করা হ'ল। তাহ'লে এই আত্মার স্বরূপ কি ?

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে আত্মা সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা হয়েছে। উপনিষদ্‌গুলিতে ত আত্মতত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ স্পষ্টই বলেছেন—'তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্'—'সেই আত্মতত্ত্ব বেদের গুহ্য ভাগ উপনিষৎসমূহে নিহিত আছে।'

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন, জগতে একমাত্র সদ্বস্তু আত্মা আর অন্য সব অসদ্বস্তু অর্থাৎ একমাত্র আত্মারই বিনাশ হয় না আর সবই বিনাশশীল। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অব্যয়, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন। ইনি অব্যক্ত অচিন্তনীয়।[১] তত্ত্ববিদ্‌গণ আত্মাকে দেখেছেন দুইরূপে, জীবাত্মারূপে আর পরমাত্মারূপে। পরমাত্মা আর জীবাত্মা ভক্তেরা এঁদেরই বলেন ঈশ্বর ও জীব।

উপনিষৎ বলেন আত্মা ব্রহ্ম। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[২]—এই আত্মা ব্রহ্ম। আত্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। উপনিষদ্‌গুলিতে সর্বত্র এই ভাবেই আলোচনা হয়েছে। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিক, নিরবয়ব, অখণ্ড, শুদ্ধ চৈতন্য। 'উক্ত পরম ব্রহ্ম বেদান্তে প্রপঞ্চাতীতরূপে কীর্তিত হইয়াছেন।'[৩] যদিও তিনি প্রপঞ্চাতীত 'তবু তিনিই সকলের অচল প্রতিষ্ঠা এবং তিনি স্বয়ং অবিকারী।'

আবার ব্রহ্ম সগুণ সোপাধিকও বটেন। তিনিই জগৎ। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।[৪]—'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্‌রূপে (বিদ্যমান) ছিল।'

স্বীয় মায়াকে অবলম্বন করে ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য এবং ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। এই ব্রহ্মই আত্মস্বরূপ।

---

১ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২।২০, ২১, ২৪, ২৫

২ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ২

৩ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৭

৪ ছান্দোগ্য ৬।২।১

শ্বেতাশ্বতর বললেন—

'এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥' (১।১২)

'ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর জ্ঞানিগণের দ্বারা প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জানিবে। কারণ, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই।'

ব্রহ্ম পরমাত্মা। তিনিই মায়া বা অবিদ্যায় যখন প্রতিবিম্বিত হন তখন জীব।

'অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ'[১]—'সেই পরমাত্মাই অনীশ্বর (জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া সংসারে আবদ্ধ হন।'

ব্রহ্ম সর্বভূতান্তরাত্মা হ'লেও জাগতিক সুখ-দুঃখে লিপ্ত হন না।[২] তিনি ধর্মাধর্ম থেকে ভিন্ন, কার্যকারণ থেকে পৃথক।[৩] তিনি যাবতীয় কর্মবন্ধনের অতীত। আর জীব যদি ব্রহ্ম হয় তবে সে-ই বা কর্মফল ভোগ করে কি ক'রে?

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কর্মফলের অতীত, অতএব সুখদুঃখাদির অতীত বটে। কিন্তু মায়াবৃত অবস্থায় বা মায়াতে প্রতিবিম্বিত অবস্থায় অর্থাৎ জীবরূপে তিনি স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হন। কেন হন? তাঁর ইচ্ছা।

যত কাল মায়া, যত কাল এই বিস্মৃতি, তত কাল জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। পরমাত্মাকে এ সব স্পর্শ করে না। কর্মফল ভোগ প্রসঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কটি উপনিষদে ভারী সুন্দর করে বুঝানো হয়েছে।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্যো অভিচাকশীতি।'[৪]

—'সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী (আত্মা এই সমান নাম) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষকে (শরীরকে) আশ্রয় করিয়া

---

১ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৮
২ কঠোপনিষৎ ২।২।১১
৩ ঐ ১।২।১৪
৪ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ৩।১।১

রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) স্বাদু ফল (কর্মফল) ভক্ষণ করে, অপরটি (পরমাত্মা) ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।'

এই কর্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মাকে বিবিধ দেহধারণও করতে হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—

'গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা,
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ।' (৫।৭)

'কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কারবিশিষ্ট যিনি ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিয়া থাকেন, সেই জীবই স্বকৃত কর্মের ফল উপভোগ করেন। বিবিধ দেহধারী, সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত, ত্রিমার্গে গমনকারী, ও পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর সেই জীব নিজ কর্মফলানুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।'

জীবের বিবিধ দেহধারণ তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং কর্মফল ভোগ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। বেদান্তীদের মতে জীবের স্থূল দেহ ছাড়াও একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ আছে। এই লিঙ্গদেহও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। কর্ম ও উপাসনা থেকে সংস্কারগুলি এই লিঙ্গদেহকেই আশ্রয় করে' থাকে। জীব মৃত্যুর সময় ভোগায়তন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে' লিঙ্গদেহ নিয়ে চলে যায় এবং বাসনাযুক্ত উক্ত সংস্কার অনুযায়ী নূতন ভোগায়তন দেহ লাভ করে। তখন সেই সংস্কারগুলি ফলবান হয় অর্থাৎ জীব পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে।

এই কর্মবন্ধন, এই জন্মান্তরাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বা ভগবদ্‌লাভ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—

'অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।' (১।৭)

'এই প্রপঞ্চে সর্বান্তর ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ সমাধি অবলম্বনে ব্রহ্মেই লীন হন, এবং পুনর্জন্মাদি হইতে মুক্ত হন।'

আমরা দেখেছি, কবীরদাসও ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন বলতে হয়। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রভূত আলোচনার বিষয় এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ কবীরদাস হয়ত গুরু রামানন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, হয়ত বা যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের তিনি সঙ্গ করতেন তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে

অবশ্যি কিছু নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, যেখান থেকেই পান না কেন, তিনি মতবাদ দু'টিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন।

ব্রহ্ম এক। তিনি অনাদি অনন্ত অরূপ। তিনিই ভগবান। তিনি ভাবৈকগম্যঃ। ভক্তেরা বলেন, কেবল ভাবের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাবকে অবলম্বন করেই তাঁর নামরূপ। ভাব অসংখ্য। তাই ভগবানেরও অসংখ্য নামরূপ। যে যে-ভাবে তাঁকে চায়, তাঁর উপাসনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করেন। তাঁর কাছে যাওয়ার অনেক পথ। যার যার স্বভাব অনুসারে মানুষ তার একটি বেছে নেয়। কিন্তু যে যে-পথেই যাক না কেন, সে আসলে ভগবানেরই পথে চলে। শ্রীভগবানেরই বাণী—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।' [১]

—'যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেই ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। মানুষ সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করে।'

যারা অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করে তারাও জেনে হোক আর না জেনেই হোক, ভগবানেরই উপাসনা করে। কেন না, সব দেব-দেবী ভগবানেরই মূর্তি। শ্রীভগবান বলছেন—

'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥'

—যে সব ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করে তারা অজ্ঞানে (অর্থাৎ ভগবানই যে অন্য দেবতার রূপ ধারণ করেছেন তা না জেনে) আমারই উপাসনা করে।

মানুষ যতক্ষণ পথে থাকে ততক্ষণ পথ আর মত নিয়ে সে লড়াই করে, ততক্ষণ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ; ততক্ষণ ধর্মের নামে চলে দ্বন্দ্ব। কিন্তু পথের শেষে যখন পৌঁছায় তখন দেখে সব পথেরই শেষ এক, সব মতেরই পরিণাম এক। তখনই ভক্ত বলতে পারেন—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকঃ গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

রুচির বৈচিত্র্যের জন্য ঋজুকুটিল নানা পথে চলে মানুষ। কিন্তু সব

---

১ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৪।১১

জলস্রোতেরই একমাত্র গতি যেমন সমুদ্র, তেমনি তুমিই তাদের একমাত্র গতি।

আর তখন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন মত আর পথ নিয়ে মিছিমিছি বিবাদ করো না, অন্তে সবাই এক জায়গাতেই গিয়ে পৌছাবে যে!

কবীরদাস এমনি পথের শেষে গিয়ে পৌছেছিলেন। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। তাই মতের বিবাদ দূর করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

কবীরদাসের সময়ে ভারতবর্ষে যে সব বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে প্রধান দু'টি—হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই মতের সঙ্গেই কবীরদাসের অল্লাধিক পরিচয় ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এই দুই মতেরই প্রভাব দেখা যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আজকাল যেমন হিন্দুধর্ম বলতে ভারতবর্ষে উদ্‌ভূত ধর্মমাত্রকেই বুঝায় কবীরদাসের সময় কিন্তু সে রকম ছিল না। সেই সময়ে হিন্দুধর্ম কথাটা আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। বেদ, ব্রাহ্মণ আর পৌরাণিক মত এই তিনটিকে যে মানে, কবীরদাস তাকেই হিন্দু বলে মনে করতেন।[১] অবশ্যি, মুসলমান কথাটা তখন যে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত আজও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

কবীরদাসের উপর হিন্দু প্রভাবের কথা আমরা আগেই খানিকটা আলোচনা করেছি। কবীরদাসের প্রেমভক্তির সাধনাকে যদি কোনো মতের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহ'লে সে মত অবশ্যই হিন্দু-মত। তাঁর পরমার্থতত্ত্বও হিন্দুচিন্তার দ্বারা ওতপ্রোত ছিল সে কথাও আমরা লক্ষ্য করেছি।

কবীরদাস মূর্তিপূজা, বহু দেব-দেবীর পূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির নিন্দা করেছেন। অনেকে বলেন, তার কারণ মুসলমান প্রভাব। অনেকে আবার এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, এই রকম মূর্তিপূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির খণ্ডন যোগমত প্রভৃতিতে মুসলমান এদেশে আসবার বহু আগে থেকেই হয়ে আসছিল। এই ধরণের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। কবীরদাস সেই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছিলেন। তবে তাঁর উপর ইসলামের প্রভাবও অবশ্যই ছিল। সেই প্রভাবের ফলে তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ রকমের

---

১ কবীর, পৃঃ—১০

সাহস এসে গিয়েছিল যার জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধ ও যোগীদের মত তত্ত্বজালে জড়িয়ে পড়েন নি। তিনি প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তির কথা না ভেবেই সহজ ঢঙে সহজ কথা বলতে পেরেছেন।[১]

কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের তত্ত্বহীন যুক্তিহীন বাহ্যাচার এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব ভণ্ডামি দেখা দিয়েছিল তাদের তীব্র ভাবে আঘাত করেছেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ কবীরদাস করেছেন। তিনি বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন এই দু'টি ধর্মমতের লক্ষ্যও যে এক তা দেখিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতই একই ভগবানের কথা বলছে, উভয় মতেই হয়েছে ভগবানেরই প্রকাশ। তাই, কবীরদাস সন্তকে ডাক দিয়ে বললেন, 'সন্ত, আমি দু'টি পথই দেখেছি। হিন্দু-তুরুক আমি আলাদা মনে করি না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা।'[২] বললেন, 'হিন্দু আর তুরুকের একই রাস্তা। এইটেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ।' কবীর বলছেন, 'ওহে সন্ত, শোন, রাম না বলে খোদা বললে কিছু এসে যায় না।'[২]

ভগবান একই। তাঁর নানা নাম। কেউ তাঁকে এক নামে ডাকে কেউ অন্যনামে। কিন্তু তাই বলে ত আর আলাদা আলাদা ভগবানের কথা হয় না। হিন্দু বলে রাম, কৃষ্ণ; মুসলমান বলে আল্লা, করীম। আর তার জন্য উভয়ে উভয়কে পৃথক ভেবে লড়াই করে মরে। কবীরদাসের কাছে এ বড় অদ্ভুত ঠেকে। তিনি বলেন, 'একই জমির উপর বাস করছে, অথচ কাউকে বলা হচ্ছে হিন্দু, কাউকে তুরুক।'[৩] আর এদের মধ্যে কত ভেদ!

এ সব হ'ল পথের কথা। মানুষ যতক্ষণ ভগবানকে পায় না ততক্ষণ তার ভেদবুদ্ধি থাকে। কিন্তু যেই পথের শেষে পৌছায়, ভগবানকে পায়, তখন দেখে ভেদ কোথাও নেই। তখন সে বুঝতে পারে 'আল্লা রাম করীম কৃষ্ণ এ সব ত হজরতেরই নাম।'[৩] মতের বিভেদ, পথের বিভেদ তখন ঘুচে যায়।

---

১ কবীর পৃঃ—১৩৬

২ অনূদিত পদ ১১০

৩ অনূদিত পদ ১০৯

কবীরদাস এই কথাটাই বার বার বলেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনের কথা বলেছেন তার মূল এইখানে। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। সেই জন্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দু আর মুসলমান একই ভগবানের আরাধনা করছে। হিন্দু যাঁকে বলছে রাম, মুসলমান তাঁকেই বলছে আল্লা। এদের মত ও পথের পার্থক্য যা-ই থাক না কেন, লক্ষ্য একই। তাই, কবীরদাসের কাছে হিন্দু যা, মুসলমানও ছিল তাই। এদের তিনি একই মনে করতেন। আলাদা আলাদা নামে ভগবানকে ডাকে বলেই ত তারা সত্যিকারের আলাদা নয়! হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও মানুষ। তাদের উপাস্যও এক। 'একই মাটির ভাঁড়, ভিন্ন ভিন্ন তার নাম।'[১]

তাই সিদ্ধভক্ত কবীরদাস কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ভেদ স্বীকার করেন নি। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের ভগবদ্‌ভক্ত যাঁরা, যাঁরা সত্যিকারের ভগবৎপ্রেমী, তাঁদের মধ্যে যিনি যে-নামেই যে-ভাবেই ভগবানকে ডাকুন না কেন, আসলে সবাই তাঁরা এক। কেন না, সবাই তাঁরা একই ভগবানের উপাসক। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষ মাত্রকেই ভগবানের রূপ বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাম, যত নরনারী জন্মেছে তারা সব তোমারই রূপ।'[২] কাজেই তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ ছিল না।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র উপনিষদের যুগ থেকে পরম একের কথা বলে আসছে। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যকে নিয়ে তিনি বিরাজমান। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পরম একেরই প্রকাশ। কবীরদাস যে এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন তাতে করে তিনি ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন। অনেকে বলেন, এই একেশ্বরের কথা তিনি ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছেন। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ, কবীরদাসের উপর ইসলামের সত্যিকারের কোনো প্রভাব পড়ে থাকলে তা এসেছে সূফী সাধকের কাছ থেকে। আর এই সূফী মতের উপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। কাজেই অনুমান করা যায়, যে পরম একের সাধনা কবীরদাস গুরু রামানন্দের কাছ থেকে

---

১ অনূদিত পদ ১০৯

২ ঐ ১৭

পেয়েছিলেন, তাই মুসলিম সূফী সাধকদের সংস্পর্শে এসে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

আর তিনি প্রচারও করে গেছেন প্রেমভক্তিরই কথা। সে প্রেমভক্তিতে কোনো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই। সেই জন্য, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিল।

ভক্ত কবীর তাঁর প্রভু রামের কথাই বলে গেছেন। এই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য। এই রামই পরম এক। তা বুঝাবার জন্যই যেন তিনি রামের নানা নাম ব্যবহার করেছেন। রামই আল্লা, রামই রহিম, তিনিই হরি, তিনিই কৃষ্ণ।

আবার কবীরদাস পরমাত্মাকে নামাতীত মনে করতেন। তিনি যেমন রূপাতীত তেমনি নামাতীত। আল্লা আর রাম এই দুইয়েরই অগম্য তিনি।[১]

এর কারণ, কবীরদাস ছিলেন ভক্ত মানুষ। তিনি প্রাণভরে ভগবানের কথাই বলেছেন। কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। ভগবান যেমন নামরূপের অতীত তেমনি তাঁর অসংখ্য নাম, অসংখ্য রূপ। ভক্তহৃদয়ে তিনি যখন যেভাবে প্রতিভাত হয়েছেন ভক্ত তখন সেইভাবেই তাঁর কথা বলেছেন। এইজন্য, কবীরদাসের উক্তি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়।

কিন্তু কবীরদাসের আসল পরিচয় তিনি ভক্ত কবীর। এইটি জানা হয়ে গেলে আর তাঁর কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। ভক্ত কবীর ভগবানের কথাই বলেছেন আর সব কিছু তারই আনুষঙ্গিক। এইটিই হ'ল কবীরদাসের সকল মতামতের মূল রহস্য।

---

১ কবীর পৃঃ ১৩৮

বিশ্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিধাতার আছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। মানুষও সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত সৃষ্টির উপাদান মাত্র। মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সেই পরিকল্পনাই প্রকাশিত হচ্ছে। জগতের বিভিন্ন অংশে বিধাতার ইচ্ছা বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষেও বিধাতার একটা বিশেষ ইচ্ছা কাজ করছে। তিনি যেন এখানে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম ঐক্যতত্ত্বটি রয়েছে তাকেও উদ্ভিন্ন করে তুলেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আগাগোড়া এই ইচ্ছা বিস্তৃত হয়ে আছে। বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে, বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এ আপনাকে প্রকাশ করছে। বিধাতার এই ইচ্ছাকেই বহন করে যুগে-যুগে কত মহাপুরুষেরই না এখানে আবির্ভাব হ'ল! জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির বিভিন্ন পথে মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের কি বিপুল বৈচিত্র্যকেই না তাঁরা প্রকাশ করলেন!

কবীরদাসও বিধাতার এই ইচ্ছাকে বহন করেই আবির্ভূত হ'লেন। স্রষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী জগতে যখন যার প্রয়োজন হয় তখনই তার উদ্ভব হয়। আর সেই উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশেরও তখন সৃষ্টি হয়। কবীরদাস যখন এলেন তখন তাঁর আসার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তাঁর আবির্ভাবের অনুকূল পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয় সাধনা তখন এক বিরাট সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। এক অভিনব পরিণতির মুখে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করেছে ইসলাম ধর্ম। এ যাবৎ ভারতের ধর্ম-সাধনায় বিভিন্ন মত ও পথের উদ্ভব হয়েছিল সত্য এবং তাদের মধ্যে কোথাও বা অল্প পরিমাণে কোথাও বা অধিক পরিমাণে পার্থক্য এমন কি বিরোধও ছিল সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের তলে তলে একটা ঐক্যের ফল্গুধারা বয়ে চলেছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে এমনকি বিরোধের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি এইটিই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য। তাই মত ও পথের বিভিন্নতাকে ভারত সহজেই স্বীকার করে নিয়েছিল। পরমতসহিষ্ণুতা ভারতের অপর বিশিষ্টতা। ভারতের ধর্ম-সাধনা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই জন্য বেদ-গ্রাহ্য ও বেদ-বাহ্য, সংস্কারযুক্ত ও সংস্কার-মুক্ত নানা ধর্মমত এখানে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মনুষ্যত্বকে শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ হিসাবেই এখানে মানুষের সম্মান, তার আদর। মানুষের ধর্মমত তার সে সম্মান ও আদর লাভে বাধা সৃষ্টি করে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার এই চারিত্রিক আদর্শের জন্য ভারতে যে-কোনো ধর্মের মানুষ অন্য যে-কোনো ধর্মের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে এসেছে। তাই, ভারতীয় সমাজে জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদ থাকা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের এক উদার আদর্শে সবাই মিলতে পারত।

ভারতীয় সমাজ অতি প্রাচীন কাল থেকে মোটের উপর ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-পুষ্ট আর সেই জন্য আচারনিষ্ঠ। যারা আচার মানত না, তারা জাতিচ্যুত হ'ত, কিন্তু সমাজ-শাসন মেনে চললে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হ'ত না; নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করে সমাজেই থেকে যেত। এমনি করে বহু জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তবু বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা বজায় ছিল।[১]

নানা বিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সমাজের প্রধান কীর্তি সত্য, কিন্তু এই কীর্তি দোষ-হীন ছিল না। এটি সমাজদেহকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে সামঞ্জস্য ছিল কিন্তু সংহতি ছিল না।

ইসলামের সংঘাতে এই দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল। মুসলিম সমাজ ভারতীয় সমাজের ঠিক উল্টো ছাঁচে গড়া। মুসলমান সমাজ আচার মানে না, অন্য ধর্মমতকে স্বীকার করে না, বিধর্মীকে আপন ধর্মে ধর্মান্তরিত করা পুণ্য কর্ম মনে করে, স্বীয় ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে সব মানুষকে বিচার করে বলে' অমুসলমানদের হীন বলে' মনে করে। বিধর্মীদের জন্য তার নরকের ব্যবস্থা।[২] আপন গণ্ডীর বাইরে মুসলমান সমাজ অত্যন্ত অনুদার। ইসলাম যখন এল তখন ভারতীয় সমাজের বাইরে যাবার সব ক'টি দুয়ারই খোলা ছিল কিন্তু ভিতরে আসার পথ ছিল না একটিও। মুসলমান সমাজের ভিতরে আসার সব দুয়ারই ছিল খোলা, বাইরে যাওয়ার সব দুয়ার বন্ধ।

গণতান্ত্রিক সাম্যমূলক যুযুৎসু ইসলাম ধর্ম ভারতীয় সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত হান্‌ল। তার বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা বানচাল হবার যোগাড় হ'ল। আচারনিষ্ঠ

---

১ কবীর, পৃঃ ১৭৫

২ ঐ পৃঃ ১৭২

সমাজ যাদের জাতিচ্যুত করেছিল তারা অপমানিত হয়ে আর পুরানো সমাজে থাকতে চাইল না। মুসলমান সমাজ তাদের সাদরে গ্রহণ করতে লাগল।

তবে, আত্মরক্ষার শক্তি যেমন ব্যক্তিমানুষের সহজাত তেমনি সমাজেরও। আঘাত পেলেই এ শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই, ইসলামের আঘাতে ভারতীয় সমাজে সংহতি-চেতনা দেখা দিল। "ভারতীয় জনসাধারণের সাধারণ নাম হ'ল হিন্দু। এই হিন্দু মানে অমুসলমান। ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্ম, বহু কালাবধি প্রচলিত বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ঐতিহ্য প্রভৃতি সবই এই একটা কথা দ্বারা সূচিত হ'ল।"

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এর বিভিন্ন অংশে যেখানে ধর্মের মূলতত্ত্ব এক সেখানেও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের ও বিবিধ সামাজিক প্রথা প্রভৃতির পার্থক্য ছিল প্রভূত।

নব উদ্‌বুদ্ধ সংহতি-চেতনাকে কার্য্যকরী রূপ দেবার প্রয়াস সুরু হ'ল। কিন্তু এ প্রয়াস ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের প্রয়াস। স্মার্ত পণ্ডিতেরা শাস্ত্রকে ভিত্তি করে সারা ভারতে একই রকম আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। বলা বাহুল্য, এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যে রোগ ভিতরের বাইরে ওষুধ লাগিয়ে তা দূর করা যায় না। বাহ্যানুষ্ঠান স্থানীয় বস্তু, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই, বিভিন্ন স্থানে তা বিভিন্ন হবেই। জোর করে সব এক রকম করতে গেলে সে-চেষ্টা সফল হয় না, হয়ওনি।

ভারতীয় ধর্মমতগুলি এই সময়ে শুষ্ক জ্ঞানময় দার্শনিক কূটতর্কের জটিলতা এবং বাহ্যানুষ্ঠানের স্থানীয় ও শাস্ত্র-শাসিত বিবিধ বৈচিত্র্যের বেড়াজালে পড়ে সক্রিয়তা, গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল। মতের বিভিন্নতা ও পথের পার্থক্য ধর্মের উপলক্ষ্য না হয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতিভেদমূলক সামাজিক ব্যবস্থা। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যবোধের স্থলে সাম্প্রদায়িকতাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

এই অবস্থায় উত্তর-ভারতে এসে লাগল বৈয়ক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী দার্শনিকতার কূটতর্কমুক্ত সংহতিমূলক ইসলাম ধর্মের সংঘাত। ইসলাম ধর্ম সমূহগত, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না। বাহ্যাচারের বাঁধন তার তেমন শক্ত নয়। প্রবল বিজিগীষু এই ধর্ম বন্যার বেগে ছড়িয়ে পড়তে চায়।

ধর্মের গ্লানি যখন দেখা দেয় তখন বিধির বিধানে নূতন করে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। ধর্ম জীবনেরই ধর্ম। জীবন জীর্ণতাকে বরদাস্ত করতে পারে না; জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে বারে বারে সে নূতন হয়ে দেখা দেয়। ভারতবর্ষেও মুসলমান আসার তিন-চারশ' বছর আগে থেকেই ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছিল এবং তখনই ভক্তিধর্ম নূতন করে রূপ নিয়েছিল দক্ষিণ-ভারতে।

ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম। কাজেই এ সংহতিমূলক সাম্যের ধর্ম। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটির গুণে একেও সামাজিক ভেদমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে চলতে হ'ল। ফলে ভক্তিধর্মে দেখা দিল দু'টো ধারা। একটি শাস্ত্রের শাসন মেনে, উপাসনার বাহ্যানুষ্ঠান মেনে, সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রভৃতি স্বীকার করে নিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। অপরটি নিল এই সব অগ্রাহ্য করে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির সহায়তায় উপাসনার পথ।

ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিধর্ম ভারতীয় জীবনের মূলগত ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করল। শাস্ত্রানুগ ভক্তিধারাও ভক্তির ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করে। এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। তবে এই ঐক্যতত্ব বিশেষ করে শাস্ত্র-না-মানা 'বেডুরী' ভক্তদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল।

ইসলামের আঘাতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল তাতে করে এই ধারা বিশেষ ভাবে প্রবল হয়ে সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রধান নিমিত্ত হ'লেন কবীরদাস। ধর্ম তখন প্রধানত সাম্প্রদায়িক, শাস্ত্র-শাসিত এবং আচারনিষ্ঠ। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, ইসলামধর্মও।

সম্প্রদায় বিভেদ সৃষ্টি করে। ধর্ম যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্প্রদায় তা স্বীকার করে না। তার কাছে মানুষের পরিচয় সাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবে, এমন কি ভগবানেরও পরিচয় সাম্প্রদায়িক ভগবান হিসাবে।

যথার্থ ভক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ভক্তি চিনে শুধু ভগবানকে, চিনে শুধু ভক্তকে। জীবের সঙ্গে ভগবানের যে অবিরত প্রেমলীলা চলছে, ভক্তি-সাধনার তাই ভিত্তি। ভগবান জীব মাত্রেরই অন্তরে থেকে লীলা করছেন। কাজেই ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এই প্রেমভক্তিই তার সহজ ধর্ম। এতে জীব মাত্রেরই সমান অধিকার। এ ক্ষেত্রে কোনো বিভেদ, কোনো বিরোধ, কোন সংঘর্ষের স্থান নেই। ভক্তের কাছে ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্র, সংস্কার, বাহ্যানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁর কাছে

অর্থহীন। অবশ্য, এক শ্রেণীর ভক্ত শাস্ত্র, সংস্কার, বাহ্যানুষ্ঠান প্রভৃতিকে মেনে চলেন। তবে এইগুলিকে তাঁরা ভক্তির সহায়ক হিসাবেই মানেন।

কবীরদাস ছিলেন প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভক্ত। তাঁর কাছে সকলের উপর প্রেমভক্তি। এই তাঁর সর্বস্ব। এর বাড়া তিনি কিছু মানতেন না।

কবীরদাস ধর্ম বলতে বুঝতেন এই প্রেমভক্তির ধর্ম, কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। আর জাতি, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, লোকাচার, দেশাচার প্রভৃতি যা-কিছু এই প্রেমভক্তির প্রতিকূল তিনি তাকেই অস্বীকার করেছেন, তারই বিরোধিতা করেছেন।

ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি মানুষের অন্তরে স্বতঃ উৎসারিত হয়। মানুষ মাত্রেরই এতে সহজ অধিকার। আর এই ভক্তির ক্ষেত্রে সবাই এক। ভক্তের কোনো জাতি নেই, ভক্তিধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম নেই।

ভক্ত কবীরদাস এমনি ভক্তির কথাই বলেছেন। তিনি সব রকমের গণ্ডি, সব রকমের বন্ধনের বাইরে যে মিলনভূমি সেখানে সবাইকে আহ্বান করেছেন। ভারতের সংহতি-চেতনা এমনি ভাবে নূতন করে তাঁর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছে।

তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে কবীরদাসের পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনে একাধিক মতের প্রভাবও পড়েছিল। কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ মতবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন নি, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন নি। তাই সকল মতেরই দোষগুণ তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বিচার করতে পারতেন। আর সবার বাইরে ছিলেন বলে' পরস্পর-বিরোধীদেরও মিলন-ক্ষেত্রের কথা বলতে পারতেন।

এ সম্পর্কে দ্বিবেদীজী লিখেছেন—"তিনি যেন দাঁড়িয়েছিলেন নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয়-স্থলে, নানা অসম্ভব পরিস্থিতির মিলন-বিন্দুর উপর। তিনি এমনি একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যেখান থেকে একদিকে বেরিয়ে গেছে হিন্দুত্ব আর একদিকে মুসলমানত্ব, একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অশিক্ষা; একদিকে যোগমার্গ আর একদিকে ভক্তিমার্গ, একদিকে নির্গুণ ভাবনা আর একদিকে সগুণ সাধনা। নানা পথের এমনি সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে কবীরদাস প্রত্যেক পথের দোষগুণ দেখিয়ে দিতে পারতেন।"[১]

ভক্ত কবীর ছিলেন বীর সাধক। অসাধারণ ছিল তাঁর সাহস। এক

১ কবীর পৃঃ ১৮২

ভগবৎপ্রেমভক্তি ছাড়া আর কিছুই তিনি মানতেন না, আর যা এই প্রেমভক্তির বিরোধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন প্রচণ্ডভাবে তাকে আঘাত করতেন। তাঁর সাধনার পথে কত বাধা-বিঘ্ন, কত প্রলোভন দেখা দিয়েছে, তিনি সে সমস্তই অপূর্ব সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে গেছেন। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি জয়ী হয়েছেন। অন্য ভক্তদের বিশেষ করে শাস্ত্র-মানা সগুণ উপাসকদের সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত পার্থক্য এই ছিল যে, তাঁরা শাস্ত্র-সংস্কার প্রভৃতি মানতেন কিন্তু কবীরদাস এ সব কিছুই মানতেন না।

একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী ভক্ত। সে যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে পুরাতনের প্রভাব এড়িয়ে যাঁরা নূতন পথে চলেছেন কবীরদাস ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "কবীরের পর উত্তর ভারতে সংস্কারমুক্ত যে কোনো ধর্মমত মধ্যযুগে হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটার উপর প্রত্যক্ষতঃ অপ্রত্যক্ষতঃ কবীরের প্রভাব অসামান্য।" [১]

কবীরদাস আপন অন্তর্যামীর প্রেরণায় স্বীয় হৃদয়ের সহজ ভক্তির পথে চলেছিলেন। তিনি সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ভগবৎ কৃপা লাভ করেছিলেন। সেই জন্য কোনো বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ মতবাদের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তিনি হিন্দুও ছিলেন না, মুসলমানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এই ধরণের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ঊর্দ্ধে। কেন না, তিনি দেখেছিলেন ভগবানের প্রতি যথার্থ প্রেমভক্তির ক্ষেত্রে কোনো রকম সাম্প্রদায়িকতা, কোনো রকম দ্বন্দ্বের স্থান নেই। এখানে হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই। আছে শুধু ভক্ত, শুধু সন্ত। তাই কবীরদাসের মতে সন্তের কোনো জাতি নেই।

এই দিক দিয়েই কবীরদাস বিভিন্ন ধর্মমতের মিলন-ক্ষেত্রটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কবীরদাসের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। মানুষ তাঁকে যে ভাবে যে নামেই ডাকুক না কেন তিনি একই। কাজেই, ঈশ্বরের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, প্রেমভক্তি আছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না, যত বিরোধ বাহ্যাচার নিয়ে। এই জন্য, কবীরদাস সকল রকম বাহ্যাচারের বিরোধী ছিলেন। তিনি সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য—ভগবদ্‌বিশ্বাস ও প্রেমভক্তির কথা বলেছেন।

আল্লা-রাম যে এক এ কথা কবীরদাসই প্রথম জোর-গলায় প্রচার করলেন।

১ ভারতের মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬২

হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধর্মের এই ভাবে তিনি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই ছিল তাঁর ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কাজ।

তবে এই কাজটি ছিল কবীরদাসের ভক্তিসাধনার গৌণ ফল। কবীরদাসের প্রধান পরিচয় তিনি ভক্ত। সংস্কারমুক্ত, সহজ, উদার, সর্বজনীন ভক্তি প্রচারই ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে কবীরদাসের প্রধান দান। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, "কবীরদাসের অধিকাংশ মত ভারতের এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুগত। পূর্ববর্ত্তী সহজপন্থী সিদ্ধ ও যোগীদের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু একটি জিনিষ তাঁদের কারুর ছিল না। সে ভক্তি। রামের প্রতি ভক্তি। এই রাম পরাৎপর ব্রহ্ম। কবীর প্রচার করলেন এই ভক্তি। এই তাঁর দান।"[১]

কবীরদাসের বাণী প্রেমভক্তির বাণী। তার থেকে তবু নানা মুনি নানা মতের সমর্থন খুঁজে পান। সমাজ-সংস্কার, সর্বধর্মসমন্বয়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন, সাহিত্যরস ইত্যাদি কত বস্তুই না এতে পাওয়া যায়। এটা কিছু আশ্চর্যও নয়। যাঁরা সত্যদ্রষ্টা সাধক তাঁদের বাণীতে জীবনের নানা রহস্যের সন্ধানই মেলে। কেন না, তাঁরা যে গভীরের কথা বলেন বাইরের থেকে তাকে নানা ভাবেই দেখা যায়।

আর তা ছাড়া কবীরদাস ছিলেন সাধারণ মানুষ। যদিও তিনি সিদ্ধভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং যদিও তিনি নিজেকে এমন এক আনন্দ-লোকের অধিবাসী মনে করতেন যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারে না, তথাপি সাধারণ মানুষেরই সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগ। সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে-ভরা দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা সকল মহত্ত্বের সঙ্গে তিনি যোগ রেখে চলতেন। "এই ধরিত্রীর মাটিতেই তিনি দৃঢ় করে পা রাখতেন, গভীর তত্ত্বকথাও তিনি সহজ বুদ্ধি আর সজীব মনের সাহায্যে প্রকাশ করতেন।"[২]

কবীরদাস ছিলেন নিরক্ষর মানুষ। গ্রন্থগত-পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর যা ছিল তা পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাওয়া যায় না। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। এই জন্য তাঁর প্রেমভক্তির বাণী অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে আর তা হয়েছে জনসাধারণেরই ভাষায়। গভীর তত্ত্বকথাও

১ কবীর পৃঃ ১৩৮—৪২

২ কবীর পৃঃ ২১৮

তিনি সহজ করে বলেছেন। সাধারণ লোকের অতি পরিচিত বিষয় যেমন কৃষি, তাঁতবোনা, এ সব থেকে তিনি উপমা প্রভৃতির ব্যবহার করেছেন। এইজন্য কবীরদাসের বাণী সাধারণ নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝতে পারে। যে সব গভীর তত্ত্বকথা দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য তাও কবীরদাসের বলার গুণে তাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে।

এই জন্য জনসাধারণের উপর কবীরদাসের এমন অসাধারণ প্রভাব। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কবীরদাস জনসাধারণের সাথী ও গুরু। তাঁকে যে তারা শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করে তা নয়, তার চেয়েও বেশী তাঁকে আপন জন বলে ভালবাসে। বরং শ্রদ্ধা করার চেয়ে ভালবাসেই বেশী। এই জন্য কবীরদাসের সন্ত-রূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবি-রূপও বরাবর লোকের কাছে আদর পেয়ে আসছে। তিনি শুধু নেতা ও গুরু নন, সাথী ও বন্ধু।"

কবীরদাসের সময়ে জনসাধারণের ধর্মজীবনে নানা মিথ্যাচার নানা যুক্তিহীন সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল। এইগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল যথার্থ প্রেমভক্তির প্রতিবন্ধক। এই কারণে কবীরদাস এইগুলিকে তীব্র ভাবে আঘাত করেছেন। ফলে, তাঁর রচনায় সমাজ-সংস্কারমূলক অনেক বাণী পাওয়া যায়। এই জন্যই অনেকে কবীরদাসকে সমাজ-সংস্কারক মনে করেন। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কেন না, তাঁর সেরূপ কোনো মতলবই ছিল না। তাঁর আসল কাজ ছিল প্রেমভক্তির প্রচার। সেই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে এমন সব কথা বলতে হয়েছে যা সমাজ-সংস্কারের প্রভূত সহায়তা করেছে।

কবীরদাস ছিলেন যথার্থ মুক্ত পুরুষ। বাঁধন ছেঁড়ার কাজ ছিল তাঁর সহজাত। তাই তাঁর কণ্ঠে মুক্তির বাণী এমন প্রবল হয়ে উঠেছে। সে বাণী শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে নি, মানুষের সমাজ-জীবনেও তার প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট, মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত করার কাজেও তা অনেক সাহায্য করেছে।

বীর ভক্ত ছিলেন কবীরদাস। তিনি যা মিথ্যা বলে মনে করতেন তার সঙ্গে কখনো আপোষ করে চলতে জানতেন না, তাকে আঘাত করতেন প্রচণ্ডভাবে। নিজে যা সত্য বলে মনে করতেন সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও তা প্রচার করতেন জোর গলায়। এই জন্য অনেকে তাঁকে অহংকারী মনে করেন।

হ্যাঁ, কবীরদাস অহংকারী ছিলেন বৈ কি। কিন্তু তাঁর অহংকার সাধারণ

মানুষের অহংকার থেকে পৃথক্। তাঁর অহংকার ভক্তের অহংকার। কবীরদাস অহংকার করেই ত বলেছেন, জোলা রামনাম নিয়ে জগৎ জয় করে যাবে। কিন্তু লোকে ভক্তের এই অহংকারটি যে কি তা বুঝতে পারে না। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "সমাজে যা অহংকার ভগবদ্‌ভক্তির ক্ষেত্রে তাই আপনার প্রতিও আপনার প্রিয়তমের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসের পরিচায়ক।"[১]

আমরা পূর্বেই বলেছি কবীরদাসের পদে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পাওয়া যায়। এর কারণ কবীরদাস ছিলেন ভক্ত। অনন্ত রহস্যময় ভগবান ভক্তের কাছে যখন যে ভাবে ধরা দেন ভক্ত তখন সেই ভাবেই তাঁর কথা বলেন। "ভগবানের যে অনির্বচনীয় রূপের পরিচয় ভক্ত পান তাকে ত ঠিক ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কেন না, যে রূপ অসীম অনন্ত তা মানুষের সীমিত ভাষার মধ্যে ধরা দেয় না। তাই সেই রূপের কথা বলতে গেলে নানা ভাবে তা বলবার চেষ্টা করতে হয়। এই জন্য অনেক সময় ভক্তের কথা পরস্পর-বিরোধী হয়। এই রকম পরস্পর-বিরোধী কথার সাহায্যে ভক্ত ভগবৎসত্তার অনির্বচনীয়তাই লক্ষ্য করেন।"

কবীরদাস ছিলেন যথার্থ গুরু। ধর্মের ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কট সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ধর্মের নানা গ্লানিতে অভিভূত ভারতের জনসাধারণকে তিনি দেখালেন যথার্থ ধর্মের পথ, তাদের চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁর অনেক কথাই বুঝতে পারে নি। তিনি অনেক ব্যাপারেই তাঁর সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। এমন অনেক ব্যাপার তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার ছিল যা তাঁর সমকাল-বর্তীদের ধারণা করতেই হয়ত শত শত বৎসর লেগে যেত।[২]

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জগতের অনেক মহাপুরুষ সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। তাঁদের সমকালবর্তীরা তাঁদের খুব কম কথাই বুঝতে পেরেছে। তার কারণ, তাঁদের কাল তাঁদের সমকালকে অতিক্রম করে দূর-ভবিষ্যতের দিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। তাই, তাঁদের সব কথা বুঝতে হ'লে কয়েক শতাব্দী কেটে যায়।

কবীরদাসের বেলাও তাই হয়েছে। ভারতীয় সাধনার ধারা তাঁকে অবলম্বন করে যে সঙ্কট অতিক্রম করে এল, অন্য কথায়, ভারতের সাধনার

১ কবীর পৃঃ ২২১

২ Kabir and his Followers, pp. 49—50

ধারাকে তিনি যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে এলেন তার পূরো অর্থ সেদিনকার মানুষ বুঝতে পারেনি। তা বুঝবার জন্য কয়েক শতাব্দী লেগেছে আর সেই কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর সাধনাই ভিতরে ভিতরে কাজ করে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

আজকের দিনের মানুষ কবীরদাসের বাণী মানুক আর নাই মানুক, তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। ভাবের ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্তের চিরাগত উদারতাকে কবীরদাসের সাধনা যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে এ কথা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই স্বীকার করবেন।

যা মানুষকে বাঁধে, যা তাকে কোনো রকম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে ভক্ত কবীর তারই বিরোধী ছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। সাম্প্রদায়িক কোনো বন্ধন স্বীকার করতেন না বলে তিনি কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। গুরু রামানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নিলে ও তিনি রামানন্দ-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না। কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

কবীরদাস নিজে যেমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না তেমনি "তিনি সম্প্রদায় গঠনেরও বিরোধী ছিলেন।"[১] কাজেই, কবীরদাস স্বয়ং যে কবীরপন্থের সৃষ্টি করেন নি একথা মানতে হয়। অনেকে এমন কথা পর্যন্ত বলেন যে কবীরদাস কাউকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যও করেন নি। দীক্ষার অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপর তাঁর কোনো আস্থাই ছিল না। কাজেই, আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত তাঁর কোনো শিষ্য নেই। অবশ্যি, একথা অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বীকার করেন না।

অসাধারণ যাঁরা তাঁরা প্রায়ই আপনার অসাধারণত্বে একক হয়ে থাকেন। সম্প্রদায়কে তাঁদের মান্‌তে হয় না। কেননা, সম্প্রদায় সাধারণকে নিয়ে।

কিন্তু সাধারণের সম্প্রদায় নৈলে চলে না। সেইজন্য গুরু করে যান আজীবন সম্প্রদায়ের বিরোধিতা আর তাঁরই শিষ্যেরা তাঁকে নিয়ে করেন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ইতিহাসে এমন ঘটনার প্রমাণ মিলে অসংখ্য।

কবীর পন্থের উৎপত্তিরও এই ইতিহাস। কিন্তু ঠিক কবে থেকে পন্থের সৃষ্টি হ'ল এবং এর প্রতিষ্ঠাতাই বা কে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

কবীর পন্থের প্রধান দুই শাখা। একটিকে বলা হয় 'বাপ' শাখা। এটির প্রধান মঠ কাশীতে কবীর চৌরায়। অপরটির নাম 'মাঈ' শাখা। এটির প্রধান মঠ মধ্যপ্রদেশের ছত্তিসগড় জেলার দামাখেরা নামক স্থানে।

উভয় শাখারই গুরু পরম্পরার ঐতিহ্য আছে এবং প্রত্যেক শাখারই গুরুদের নামের তালিকা আছে। সেই তালিকা থেকে প্রতিষ্ঠাতার নাম পাওয়া যায়। তবে যে পুঁথিতে তালিকা পাওয়া গেছে তা সাম্প্রদায়িক। কাজেই এর ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি বলা কঠিন।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রবন্ধের অধিকাংশ মালমসলা F. E. Keay রচিত Kabir and His Followers নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১ ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী কৃত "কবীর" পৃঃ ২১৮

'বাপ' শাখা প্রাচীনতর। এই শাখার গুরুদের নামের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়।

১। কবীরদাস। ২। সুরতগোপালদাস। ৩। জ্ঞানদাস। ৪। শ্যামদাস। ৫। লালদাস। ৬। হরিদাস। ৭। শীতলদাস। ৮। সুখদাস। ৯। হুলাসদাস। ১০। মাধোদাস। ১১। কোকিলদাস ১২। রামদাস। ১৩। মহাদাস। ১৪। হরিদাস। ১৫। শরণদাস। ১৬। পূরণদাস। ১৭। নির্মলদাস। ১৮। রঙ্গীদাস। ১৯। গুরুপ্রসাদ। ২০। প্রেমদাস। ২১। রামবিলাস।

গুরু সুরতগোপালদাসকে এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সুরত-গোপালদাস বা প্রথমদিককার অন্যান্য গুরুদের সম্পর্কেও বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। গোড়ার দিকে কবীর চৌরায় সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ বা মূল গদীও ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ গুরু সুখদাসের সময়ে কাশীতে প্রধান মঠ স্থাপিত হয়। প্রথমে হয় নীরু টীলায়, তারপরে কবীর চৌরাতে।

এই শাখায় গুরুপদ বংশগত নয়। কোনো গুরুর দেহাবসান হ'লে পন্থের প্রধান সাধুরা সমবেত হয়ে গুরু নির্ব্বাচন করেন। যাকে তাকে গুরু করা হয় না। যাঁকে গুরু নির্ব্বাচিত করা হয় তাঁকে বিশেষভাবে পণ্ডিত ও পন্থের মতবাদ নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হ'তে হয়। গুরুই পন্থের সর্বময় কর্তা। মঠ পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার তাঁকেই বহন করতে হয়। তবে দায়িত্ব গুরুর হ'লে ও তাঁর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মঠের বিষয় আশয়ের ভার থাকে 'দেওয়ানের' উপর, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার 'কতোয়ালের' উপর আর পূজা আর্চার দায়িত্ব পূজারীর।

কবীর চৌরার প্রধান অধিকারীরা সবাই ব্রাহ্মণ। এখানে জাতিভেদ মানা হয় আবার হয়ও না। সব শ্রেণীর লোকই এই শাখার সাধু হ'তে পারে কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যে সব লোক সাধু হয় তাদের পঙক্তি ভোজনের ব্যবস্থা আলাদা।

আমরা আগেই বলেছি 'বাপ' শাখার প্রধান মঠ কাশীর কবীর চৌরায়। মস্ত বড় মঠ। পন্থের বহু সাধু এখানে বাস করেন। মঠের প্রাঙ্গণে একটি বাঁধান বেদী আছে। প্রবাদ কবীরদাস এই স্থানে বসে ধর্মোপদেশ দিতেন। বেদীর উপরে কবীরদাসের প্রতিনিধিস্বরূপ একজোড়া খড়ম রেখে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রাঙ্গণের একপাশে একটি ঘরে আছে গুরুর গদী। এই ঘরটি খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। প্রবাদ, এখানকার গদীতে স্বয়ং কবীরদাস বসতেন। তাই কোনো গুরু গদীর উপর বসেন না, গদীর পেছনে বসেন।

কবীর পন্থীরা বলেন এই মঠে কবীরদাসের ব্যবহৃত একটি টুপী ও একখানা পশমী সেলী বা দোপাট্টা এবং একখানা বীজকগ্রন্থ রক্ষিত আছে।

মঠের গায়ে লাগা নীরুটীলা। এইখানে কবীরদাসের পিতামাতা বা পালক পিতামাতা নীরু ও নীমার বাড়ী ছিল।

এর মাইল দুই দূরে লহর তালাও। জনশ্রুতি এইখানেই নীরু ও নীমা কবীরদাসকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তালাও বা পুকুরটি এখন প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। এখানে ছোট্ট একটি মন্দির আছে। একজন পূজারী এর তত্ত্বাবধান করেন।

কবীর চৌরার মঠের একটি শাখা মঠ আছে মঘরে। এই স্থানটি বস্তি জেলায়। এখানে কবীর দাসের তিরোভাব হয়। তাঁর তিরোভাব-স্থানটি ভক্তদের কাছে বড়ই পবিত্র। স্থানটিকে একটি বড় দেওয়াল দিয়ে দুভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এর এক ভাগ রয়েছে মুসলমানদের অধিকারে আর এক ভাগ হিন্দুদের।

মুসলমানরা দাবি করেন তাঁদের দিকে যে সমাধি রয়েছে তাতেই কবীরদাসের দেহ কবর দেওয়া হয়েছে। কবীরদাসের মৃতদেহ ফুলে পরিণত হয়েছিল এই গল্প তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

কবীর দাসের এই সমাধিভবনটি দেখতে অনেকটা হিন্দুমন্দিরের মত। এক খানা শাদা চাদর দিয়ে কবরস্থানটি ঢেকে দেওয়া হয় এবং তার উপর ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তার কাছে ধূপ ধুনোও জ্বালান হয়। এটা অসাধারণ কিছু নয়। ভারতের অনেক মুসলমান পীর ফকিরের কবরের উপরই এমনি ফুল দেওয়া হয় এবং তার কাছে ধূপ ধুনো জ্বালান হয়।

কবীরদাসের কবরের কাছে আর একটি কবর আছে। লোকে বলে এটি কবীরদাসের ছেলে কামালের কবর।

গোড়ায় এখানে নাকি একটি সমাধিই ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভক্তরা এসে এখানে ভক্তি নিবেদন করতেন।

শেষে একবার কী কারণে জানি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে যায়। তখন হিন্দুরা আলাদা সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন।

কবীরপন্থী একজন পূজারীর উপর এই মন্দিরের দেখাশোনার ভার রয়েছে। ইনি কবীর চৌরার মহান্তের অধীন।

হিন্দুদের অংশে ও কামালের সমাধিমন্দির আছে। হিন্দুরা বলেন তাঁদের মন্দির যেখানে সেখানেই দেহত্যাগের জন্য কবীরদাস প্রতীক্ষা করছিলেন। সমাধিস্থলটি একখানা লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। হিন্দু রীতি অনুসারে প্রতিদিন এখানে পূজা হয়।

ভারতের নানা স্থানে কবীর চৌরার মঠের অধীন মঠ আছে।

'মাঙ্গ' শাখা বা ছত্তিশগড়ী শাখার প্রতিষ্ঠাতা ধরমদাস। এঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব কাহিনী থেকে সত্য নির্ণয় করা কঠিন। একটি কাহিনী অনুসারে ধরমদাস জাতিতে বানিয়া। তিনি কবীরদাসের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁর আসল নাম যুড়াওন। কবীরদাসের শিষ্য হওয়ার পর তিনি নাম বদলে ধরমদাস নাম গ্রহণ করেন। প্রবাদ কবীরদাস দেহত্যাগের পর ধরমদাসকে দেখা দেন এবং তাঁকে পন্থগঠন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এমনকি ধরমদাস কিরকমভাবে ধর্মদেশন করবেন তাও বলে দেন।

এই কাহিনীর কতটা সত্য বলা যায় না। সম্ভবতঃ ধরমদাস কবীরদাসের সাক্ষাৎ শিষ্য নন। কেননা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১৫১৭ খৃঃ) কবীরদাস দেহত্যাগ করেন আর ধরমদাস গদীতে বসেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (আনুমানিক ১৬১৯ খৃঃ)। ধরমদাস খুব সম্ভব কবীরপন্থী কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে পন্থে যোগ দেন এবং পরে স্বয়ং একটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। যেমনটি হয় পরবর্তী শিষ্যরা পরে তাঁর নামে কাহিনী রচনা করেন যে তিনি কবীরদাসের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন।

তবে কাহিনীর কথা বাদ দিলেও এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে ধরমদাসই কবীরপন্থের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গুরু। একমাত্র কবীরদাসের পরে তাঁর স্থান। পন্থের সংগঠন, প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূলে প্রধান হয়ে রয়েছে তাঁরই ঐকান্তিক সাধনা। কবীরপন্থী সাহিত্যের মধ্যেও ধরমদাস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। বহু গ্রন্থ কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে রচিত।

'মাঙ্গ' শাখার গুরুপদ বংশগত। গুরুকে বিবাহ করতে হয়। কিন্তু একটি ছেলে হওয়ার পর আর তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারেন না। তখন তাঁর স্ত্রীকে সন্ন্যাসিনী হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক গুরু উর্দ্ধে ২৫ বছর

২০ দিন পর্যন্ত গদী অধিকার করে থাকতে পারেন। তারপরেই পুত্রকে তাঁর গদী ছেড়ে দিতে হয়।

ধরমদাসের প্রথমপুত্র নারায়ণদাস। তিনি কবীরদাসকে গুরু বলে মানতে অস্বীকার্ করেন। তখন কবীরদাসের বরে ধরমদাসের আর একটি পুত্র হয়। তাঁর নাম চূড়ামণি। এই চূড়ামণিই পিতার পর গদী পান।

ধরমদাসের পরবর্তী গুরুদের নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এ ছাড়া পন্থের এই শাখার বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তালিকাটি এই—

১। ধরমদাস ২। চূড়ামণিদাস ৩। সুদর্শননাম ৪। কুলপতিনাম ৫। প্রমোদনাম গুরু (বালাপীর) ৬। কেবলনাম ৭। অমলনাম ৮। সুরতসনেহীনাম ৯। হকনাম ১০। পাকনাম ১১। প্রগটনাম ১২। ধীরাজনাম ১৩। উগ্রনাম ১৪। দয়ানাম।

'মাঙ্গ' শাখার গুরুদের আর একটি ধারা আছে। এই ধারার ও আদিপুরুষ ধরমদাস। প্রথমোক্ত ধারার গুরুদের বলা হয় দামাখেরা গুরু আর এঁদের বলা হয় হাটকেশ্বর গুরু। এঁদের গদী হাটকেশ্বরে। মধ্যপ্রদেশে ধামতারি নামে একটি ছোট্ট শহর আছে। হাটকেশ্বর জায়গাটি তারই উপকণ্ঠে। হাটকেশ্বর গুরুদের এই তালিকাটি পাওয়া যায়—

১। ধরমদাস ২। চূড়ামণিদাস ৩। স্থতিদাস, আনন্দদাস ৪। নরহরদাস ৫। যুধিষ্ঠিরদাস ৬। ফকিরদাস ৭। অমৃতদাস ৮। জ্ঞানদাস ৯। কৃপালদাস। কৃপালদাসের দুই পুত্র কামোদদাস ও দাদাসাহেব। দাদাসাহেবের চার পুত্র মহকুনদাস, করনামদাস, চিন্তামণিদাস ও অস্থিরদাস।

এই দুই ধারার মধ্যে তত্ত্বের দিক দিকে বা অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে কোনো মতভেদ নেই। গুরু সুরতসনেহী নামের সময় পর্যন্ত নাকি উভয় ধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। উভয় ধারার মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদানও চল্‌ত। কিন্তু সুরতসনেহীনামের পুত্র হকনামের গদী পাওয়ার পরই এঁদের মধ্যে একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হাটকেশ্বর গুরুরা বলেন, তার কারণ সুরতসনেহীনামের বিবাহিতা পত্নীর কোনো সন্তান ছিল না; হকনাম তাঁর এক নিম্নশ্রেণীর দাসীর গর্ভজাত সন্তান। কাজেই, এরকম ছেলে যেখানে গুরুর গদী পায় সেখানে হাটকেশ্বর গুরুরা সম্বন্ধ ছেদ না করে পারেন নি।

দামাখেরা গুরুদের ধারায় ঠিক এই জাতীয় কারণে পরে আর একবার গুরু উগ্রনামের মৃত্যুর পর দলাদলি ও ছাড়াছাড়ি হয়।

এইসব গদীয়ান মহান্তরা পরবর্তীকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোর বিষয়ী হয়ে পড়েন। এঁরা অনেক ঐশ্বর্যের মালিক। এসব দলাদলির মূল হয়ত এইখানে। থাক্ সে কথা।

'মাঙ্গ, শাখার যে প্রধান দুই ধারার কথা বলা হ'ল তা ছাড়া আরও অনেক মহান্ত আছেন যাঁরা আপনাদের ধরমদাসের সন্তান বলে দাবি করেন। এঁদেরও অনেক শিষ্যসামন্ত আছে। এঁদের বলা হয় বংশগুরু।

'মাঙ্গ' শাখা বা ছত্তিসগড়ী শাখা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বহুস্থানে এঁদের মঠ আছে। এমন কি অনেক জায়গায় কবীরচৌরার মঠের পাশেই এঁদের মঠ আছে। এঁদের শিষ্যসামন্তও অনেক। সাধারণতঃ দেখা যায় কবীরচৌরার শিষ্যদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোক বেশী আর এঁদের শিষ্যরা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

কবীরচৌরা ও ছত্তিশগড়ী শাখার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে মনে হয় না। তবে একটি প্রধান পার্থক্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। সেটি হ'ল কবীরচৌরার গুরুরা সন্ন্যাসী আর ছত্তিশগড়ী গুরুরা গৃহী। গুরুর পক্ষে গৃহী হওয়া কবীরচৌরার মতে অত্যন্ত অন্যায়। এইজন্য, তাঁরা যে সব গুরু আপনাদের ধরমদাসের সন্তান বলে দাবি করেন তাঁদের গুরু বলেই মানেন না। কবীরচৌরার অনুগামীরা একটু গোঁড়া। তাঁরা কখনো ছত্তিশগড়ী শাখার তীর্থগুলিতে যান না। কিন্তু ছত্তিশগড়ী শাখার অনুগামীরা কবীরচৌরা ও মঘরে তীর্থ করতে যান।

কবীরপন্থীদের আর একটি শাখার প্রধান মঠ রয়েছে ধনৌতিতে। এই জায়গাটি বিহারের সারণ জেলায়। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতার নাম ভগবানদাস। এঁদেরও গুরু পরম্পরায় একটি তালিকা পাওয়া যায়।

এই শাখার গুরুরা নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী সাধু। এঁরা ভক্ত বা গোসাঁই নামে পরিচিত। এঁদের শিষ্যদের বলা হয় ভগতাহী। গুরু যে-শিষ্যকে গদীর অধিকারী মনোনীত করেন তাঁর দেহাবসানের পর তিনিই গদী পান।

নানা স্থানে এঁদের মঠ আছে। তবে বেশীর ভাগ মঠই বিহারে।

বর্তমানে কবীরপন্থীদের নানা শাখা দেখা যায়। কবীরপন্থীদের মতে তাঁদের সবশুদ্ধ ১২টি শাখা আছে এবং দেশের নানা স্থানে এই সব শাখার গদী আছে।

এই হিসাবটা হয়ত অতিরঞ্জিত। তবে এঁদের বিভিন্ন শাখা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতে কবীরপন্থীদের সংখ্যা দশ লাখের মত। তার মধ্যে এক ছত্তিশগড়ী শাখার লোকই প্রায় ছয় লাখ। আগেই বলেছি এদের অধিকাংশ লোকই নিম্নশ্রেণীর। তার মধ্যে আবার জোলাদের সংখ্যাই বেশী। কবীর জোলা ছিলেন বলেই বোধ হয় এমনটি হয়েছে। কবীরপন্থীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা কম। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা ত কবীরদাসকে আমলই দিতেন না। তাঁরা তাঁর ধর্মকে জোলার ধর্ম বলে ঠাট্টা করতেন, এখনও করেন। অবশ্যি, আহীর, কূর্মী প্রভৃতি জলাচরণীয় জাতির কিছু লোক কবীরপন্থীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

কবীরদাস জাতিভেদ মানতেন না; বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। এই সব প্রথাকে তিনি তীব্রভাবে আঘাত করেছেন। কিন্তু কবীরপন্থীদের মধ্যে বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করা হয় এবং জাতিভেদও মানা হয়। অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি লোক যাঁরা কবীরপন্থে যোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রায়ই প্রধান প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। হয়ত বা নিম্নশ্রেণীর লোকের চেয়ে তাঁদের স্বাভাবিক যোগ্যতা বেশী বলেই এমনটি হয়েছে, হয়ত বা ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব এদেশে এত দৃঢ়মূল যে তাকে অতি অসাধারণ ব্যক্তি ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না বলেই এমনটি হয়েছে।

সম্ভবতঃ ভারতের মাটির গুণে কবীরপন্থীদের মধ্যেও জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জাতির মানুষ কবীরপন্থী হয় কিন্তু তাদের মূল জাতি, তার গোঁড়ামি, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সবই বজায় থাকে। এমন কি এরা মূর্তিপূজা পর্যন্ত করে। অথচ কবীরদাস ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। আগে কোনো উৎসবাদিতে সমবেত কবীরপন্থীদের একই চৌকাতে আহারাদি চলত। এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির কবীরপন্থীদের ভিন্ন ভিন্ন চৌকা হয়। শুধু একটি দিন এর ব্যতিক্রম হয়। সেটি হচ্ছে কবীরদাসের জন্মদিন। এই দিনে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সব কবীরপন্থী একই সঙ্গে আহার করেন।

জাতিভেদ-সংস্কারটি বোধ হয় ভারতীয় মানসেরই অন্যতম উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, দেখা যায় বারে বারে মহামানবেরা এসে একে আঘাত হেনেছেন। কিন্তু বারে বারেই এটি রক্তবীজের মত জেগে উঠেছে। জাতিভেদ না-মানাই ছিল যাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁদেরই অনুগামীদের মধ্যে

কোনো না কোনো আকারে এটি দেখা দিয়েছে। কাজেই কবীরপন্থীদের মধ্যে জাতিভেদ দেখা গেলে বিস্মিত হবার কিছুই নাই। ধর্ম অনেকের কাছেই একটা অনুষ্ঠান মাত্র। মনে প্রাণে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে কম লোকেই।

কোনো একটি বিশেষ জাতের কবীরপন্থীরা মিলে অনেক সময় একটি দল গঠন করে। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি চলে। আবার নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলছে। কবীরপন্থীদের সঙ্গে হিন্দুদের বিবাহাদি অবাধে চলে। মেয়ে স্বামীর ধর্মমত মেনে চলে। কবীরপন্থীরাও বিবাহাদি ব্যাপারে স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত হিন্দু প্রথাদি মেনে চলে। এরা অনেকে হিন্দুদের মত চুটকিও রাখে আবার মা-বাবার শ্রাদ্ধের সময় মাথাও মুড়ায়। অথচ, কবীরদাস এই ধরণের অর্থহীন প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এই গুলি নিয়ে তিনি কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন।

এই রকমই হয়। মহামানবেরা উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে যান কিন্তু তাঁদের অনুগামীরা সে-আদর্শের ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারে না। কবীরপন্থীরাও কবীরদাসের উচ্চ আদর্শ মেনে চলতে পারেনি অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু তবু কবীরপন্থ উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের প্রভূত কল্যাণ করেছে। সমাজসৌধের একেবারে নীচের ধাপে ছিল যারা তারা সমাজের ক্ষেত্রে যেমন ছিল অস্পৃশ্য ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি ছিল অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও সংস্কৃতির বিশেষ কিছুই তাদের মধ্যে গিয়ে পৌছাত না। কবীরপন্থে যোগ দিয়ে এরা একটা সক্রিয় ধর্ম পেল আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেল নতুন সামাজিক মর্যাদা। যারা ছিল মনুষ্যত্বের দূর প্রান্তসীমায় তারা ভিতরে আসবার সাদর আমন্ত্রণ পেল। আর তাতে সাড়া দিল অনেকেই। Keay সাহেব মধ্য ভারতের পঙ্কাদের কথা বলেছেন। এরা ছিল সমাজের একেবারে নীচের তলায়, অতি দীন, অতি হীন। কবীরপন্থে যোগ দেওয়ার পর এদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়ে যায়।

কবীরপন্থের মধ্যে কালক্রমে নানা কারণে নানা শাখাপ্রশাখা দেখা দেয় একথা আগেই একবার বলা হয়েছে। এই সব শাখাপ্রশাখার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা কিছু তা বহিরঙ্গীয়। এইজন্য, এদের মধ্যে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রত্যেক শাখারই সাধু বা বৈরাগী সম্প্রদায় আছে। এদের প্রধান কাজ

দেশের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে কবীরের বাণী প্রচার করা ও যারা পন্থের শিষ্য হতে চায় তাদের শিষ্য করা। এরা প্রায়ই গোঁড়া হয় এবং শিষ্য সংগ্রহে এদের থাকে প্রচণ্ড উৎসাহ। ছত্তিশগড়ী শাখায় বৈরাগিনীও আছে। তবে, এই সব বৈরাগিনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈরাগীদের পত্নী। কবীরচৌরা ও ধনৌতি শাখায় কিন্তু স্ত্রীলোকের সাধু অর্থাৎ বৈরাগিনী হওয়ার অধিকার নেই।

কবীরচৌরা, ছত্তিশগড় এবং ধনৌতি এই তিন শাখার তিলকচিহ্নে সামান্য পার্থক্য আছে।

কবীর পন্থী মহান্তরা মাথায় লম্বাধরণের কান-ঢাকা টুপী পরেন, শাদা লম্বা আলখাল্লা পরেন, চৌরী (ঝাড়ন) এবং কৌড়ী বা আসক (দীর্ঘ দণ্ড) ধারণ করেন। প্রত্যেক শাখাতেই প্রধান মহান্ত সর্বময় কর্তা। অন্যান্য মহান্তরা তারই কর্তৃত্বে কর্তৃত্ব করেন। কোনো মহান্ত যখন সফরে বেরোন তখন তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর দেওয়ান। অনেক শিষ্যসামন্তও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে।

মহান্তকে বছরে অন্ততঃ একবার তাঁর নিজের এলাকার শিষ্যদের বাড়ী যেতে হয়। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে শিষ্যের উন্নতি অবনতির জন্য গুরু দায়ী। এই জন্য সব সময়ে শিষ্যকে গুরুর সযত্ন তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। যেখানে গুরু শিষ্য একত্র থাকেন সেখানে এ কাজ সহজেই হয়। কিন্তু শিষ্যদের পক্ষে বিশেষ করে গৃহস্থ শিষ্যদের পক্ষে সব সময় গুরুর কাছে থাকা সম্ভবপর নয়। এই জন্যই, অন্য উপায়ে গুরু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। সেই উদ্দেশ্যেই, গুরু বছরে অন্ততঃ একবার শিষ্যবাড়ী যান এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষ্যে শিষ্যরা অনেকেই গুরুর মঠে আসেন। গুরু যখন শিষ্যবাড়ী সফরে বেরোন তখন নূতন নূতন লোককে শিষ্যও করেন।

ভারতবর্ষে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বড় মধুর। গুরু পিতা, শিষ্য সন্তান। গুরু সর্বদা শিষ্যের কল্যাণ চিন্তা করছেন। শিষ্য গুরুর সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করছে। কবীরপন্থেও এই সাধারণ ভাবধারার ব্যতিক্রম হয় নি। শিষ্যরা যথাসাধ্য মহান্তের সেবাযত্ন করে থাকে। তাঁর সফরের পথ-খরচা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তারাই দেয়।

ছত্তিশগড় শাখায় অধীনস্থ প্রত্যেক মহান্ত প্রধান মহান্তের কাছ থেকে নিয়োগের সময় পাঞ্জা ও পরোয়ানা পেয়ে থাকেন। এতে তাঁর এলাকার সব কবীরপন্থীদের নাম থাকে। বছরে একবার এইটি প্রধান মহান্তের কাছে

কবীরপন্থীরা তুলসীর কণ্ঠীমালা ধারণ করেন। দীক্ষার সময়ই কণ্ঠী ধারণ করতে হয়। অনেকে কণ্ঠীর মালার বদলে একটিমাত্র কণ্ঠী শক্ত সুতোয় করে পরেন। সাধুরা কৌপীন পরেন। কবীরপন্থী গৃহীদের বলা হয় ভগৎ। এঁরাও কণ্ঠী ধারণ করেন তবে সাধুদের মত তিলকচিহ্ন ধারণ করতে পারেন না। আমরা আগেই বলেছি বিভিন্ন শাখার তিলকচিহ্নের মধ্যে একটু একটু পার্থক্য আছে। অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত কবীরপন্থীদেরও দীক্ষার সময় কানে কানে বীজমন্ত্র দেওয়া হয়। কবীরপন্থী সাধুদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এঁরা ভিক্ষা চেয়ে লোককে বিরক্ত করেন না। আগেই বলা হয়েছে ছত্তিশগড়ী ভিন্ন অন্যশাখায় মেয়েদের সাধু করা হয় না। কবীরপন্থী মেয়েদের বিয়ের আগে কণ্ঠী ধারণ করতে দেওয়া হয় না; স্বামীর গুরুর কাছে তাদের দীক্ষা নিতে দেওয়া হয় না। কবীরপন্থীরা বিশুদ্ধ নিরামিষ-ভোজী। মাছ মাংস মদ প্রভৃতি তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য।

কবীরপন্থীদের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণব ধর্মের। এঁদের বৈষ্ণবই বলা যায়। এর কারণও আছে। কবীরদাসের গুরু রামানন্দ ছিলেন পরম বৈষ্ণব আর বলতে পারা যায় কবীরদাস নিজেও মূলত বৈষ্ণবই ছিলেন। কাজেই, কবীরপন্থীদের উপর বৈষ্ণব প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক।

কবীরপন্থীদের দীক্ষার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দীক্ষা সবাইকেই নিতে হয়। দীক্ষা ছাড়া কেউ কবীরপন্থী হ'তে পারে না। অনুষ্ঠান করে দীক্ষা দেওয়া হয়। দীক্ষার্থীকে প্রথমে গুরু ও পন্থের অন্যান্য সাধু ও 'ভগৎ'দের সামনে পন্থের পালনীয় নিয়মাদি মেনে চলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। এই সব নিয়মাদি ভঙ্গ করলে যে ভয়ানক অনিষ্ঠ হয় একথা গুরু প্রথমেই ভাল করে বুঝিয়ে দেন। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস যারা এই সব নিয়ম-ভঙ্গ করে তাদের ভীষণ বিপদ হয়, শক্ত অসুখ করে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দীক্ষার সময় দীক্ষার্থীকে এই ধরণের কতগুলো প্রতিজ্ঞা করতে হয়, যেমন—প্রতিমাপূজা করব না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করব, সকাল সন্ধ্যা উপাসনা করব, যে আমার প্রতি অন্যায় করবে তাকে তিনবার পর্যন্ত ক্ষমা করব, নষ্টচরিত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিহার করব, কোনো রকম অশ্লীল ঠাট্টা করব না, ধর্মপত্নীকে কখনো তাড়িয়ে দেবো না, সদা সত্য কথা বলব, অন্যের ধন অপহরণ করব না, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না, পরনিন্দা করব না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব প্রতিজ্ঞা দেখে মনে হয় কবীরপন্থীরা একটি চারিত্রিক আদর্শ মেনে চলেন। উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি যথাযথভাবে যে মেনে চলে সে যে-কোনো দেশের একজন সৎ গৃহস্থ বা সৎ নাগরিক হতে পারবে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে কবীরপন্থীদের অতি উন্নত চরিত্রের মানুষ হবার কথা। অবশ্যি, সব ধর্মমতেরই আদর্শ থাকে উচ্চ কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার যথাযথ অনুসরণকারীদের সংখ্যা বেশী হয় না। কবীরপন্থীদের বেলাও এই সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম হয়েছে বলা যায় না।

দীক্ষার্থী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলে পর দীক্ষার অন্যান্য অনুষ্ঠান চলে। প্রথমে গুরু দীক্ষার্থী বাঁ কানে বীজমন্ত্র দেন। কবীরচৌরা ও ছত্তিশগড়ী শাখার মন্ত্র আলাদা। কবীরচৌরায় একটিমাত্র মন্ত্র দেওয়া হয়। কিন্তু ছত্তিশগড়ী শাখায় দীক্ষার সময় গুরুমন্ত্র ও 'তিনকা' মন্ত্র এই দু'টি এবং পরে 'পাঁচনাম', 'সৎনাম' ও 'হরনাম' নামে আরও তিনটি মন্ত্র দেওয়া হয়। মন্ত্র দেবার পর গুরু শিষ্যের হাতে দুর্ব্বা, পান এবং শাদা ফুল দেন। শিষ্য তখন একজন বৈরাগীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে এই জিনিসগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেন। বৈরাগী শিষ্যকে নিয়ে যাবার সময়ই এক পিতলের ঘটি ভর্তি করে জল নিয়ে যান। এই জলে আচমন করে শিষ্য বৈরাগীর সঙ্গে সঙ্গে আবার গুরুর কাছে ফিরে আসেন। এরপর হয় 'গাওয়াহী' বা সাক্ষ্য অনুষ্ঠান। গুরু একজন বৈরাগীর হাতে একটি কণ্ঠি দেন। বৈরাগী সেটি উপস্থিত প্রত্যেক কবীর-পন্থীর কাছে নিয়ে যান এবং তিনি তা স্পর্শ করে দেন। বৈরাগী তখন কণ্ঠিটি গুরুর কাছে ফিরিয়ে দেন। গুরু তখন সেটি নিয়ে গদীর পূজা করেন; তারপর কণ্ঠিটি শিষ্যের গলায় পরিয়ে দেন। এরপর শিষ্যের ডান কানে পুরো বীজমন্ত্রটি আর একবার বলে দেন। জীবহিংসা কবীরপন্থীদের মতে মহাপাপ। এইজন্য, এই সময়ে গুরু নূতন শিষ্যকে ডুমুর ফল খেতে নিষেধ করেন। কারণ ডুমুর ফলে অনেক ছোট ছোট পোকা থাকে এবং ফলটি খেতে গেলেই এসব পোকার কিছু না কিছু অবশ্যই মারা পড়বে। তারপর গুরু শিষ্যের হাতে একটি নারকেল দেন। শিষ্য সেটাকে ডান কাঁধে বুকে এবং কপালে ঠেকিয়ে একটি টাকা প্রণামীসহ আবার গুরুকে ফিরিয়ে দেন। জলে পান চুবিয়ে নিয়ে গুরু সেই জল দিয়ে নারকেলটি ধোন। তারপর পাথরের উপর আছড়ে সেটি ভাঙ্গেন এবং শাঁসটা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে একটি থালায় রাখেন। এই সময় শিষ্যকে

চরণামৃত খেতে দেওয়া হয়। তারপর তাকে প্রসাদ দেওয়া হয়। গুরু একটি আস্ত পান নিয়ে তার উপর পরওয়ানা[১] কিছুটা নারকেল, কয়েকটি বাতাসা, কিছু গুড়, কিছু কিসমিস ও মনক্কা দিয়ে শিষ্যের হাতে দেন। শিষ্য তক্ষুণি পরমভক্তিভরে এই প্রসাদ খান। একটু আগে যে নারকেলের কথা বলা হ'ল তা অতি পবিত্র বলে কবীরপন্থীরা মনে করেন। পন্থের বাইরের কোনো লোককে এটি দেওয়া হয় না। উপস্থিত কবীরপন্থীদের মধ্যে বিতরণ করে নারকেলের যা উদ্‌বৃত্ত থাকে তা গুরু রেখে দেন এবং যখন তিনি সফরে বেরোন তখন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শিষ্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে নারকেলটি কা'র দীক্ষার সময়কার তাও জানিয়ে দেন।

প্রসাদ খাওয়ার পর ভোজ হয়। এই ভোজে অন্য সম্প্রদায়ের লোকও যোগ দিতে পারে। ভোজের সময় গুরুকে বহুত সম্মান করা হয় এবং ভগবানও কবীরদাসের স্তবগান করা হয়।

এই দীক্ষা অনুষ্ঠানটির নাম তিনকা অর্পণ। কবীরচৌরা ও ছত্তিশগড় শাখার মধ্যে এই অনুষ্ঠানটির একটু পার্থক্য আছে। ছত্তিশগড় শাখায় অনুষ্ঠানটি করেন প্রধান মহান্ত, অন্যে তা করতে পারে না। এদের দীক্ষার সময় প্রত্যেক দীক্ষার্থীকে একটি করে নারকেল ও কমপক্ষে একটি করে টাকা গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু কবীরচৌরা শাখায় দীক্ষার্থীকে ১৬টি নারকেল এবং প্রত্যেক নারকেলের সঙ্গে অন্তত চার আনা করে দক্ষিণা দিতে হয়। তাছাড়া এই শাখায় দুবার দীক্ষা হয়। একবার স্থানীয় মহান্ত বা বৈরাগীর কাছে এবং আর একবার কবীরচৌরায় প্রধান মহান্তের কাছে।

কবীরপন্থীদের পূজাআর্চা রীতি-নীতি উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি মোটের উপর অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মতই। তবে পন্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অবশ্য আছে।

কবীরপন্থীদের সকাল সন্ধ্যা ভগবদুপাসনা করতে হয়। উপাসনার সময় স্তোত্রপাঠ ও ভজন হয়। পন্থের থেকে 'কবীর-উপাসনাপদ্ধতি' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শাখার উপাসনার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ও স্থানীয় বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়।

কবীরপন্থীদের কাছে নারকেলের একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। নারকেল ছাড়া তাঁদের কোনো অনুষ্ঠান, কোনো উৎসব হয় না। বৈষ্ণব গৃহস্থ যেমন

১ বিশেষভাবে মন্ত্রপূত পান।

দুর্গাপূজা করলে মা দুর্গার কাছে পাঁঠা বলি না দিয়ে কুমড়ো বলি দেন তেমনি কবীরপন্থীরা নিরঞ্জনের কাছে নারকেল বলি দেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন এতে করে তাঁরা সত্যলোকে যেতে পারবেন। নারকেল বলি দেওয়া মানে অনুষ্ঠান করে নারকেল ভাঙ্গা। এ নিরামিষ বলি। শাক্তদের প্রভাবে এটি হয়েছে মনে হয়।

কবীরপন্থীদের মধ্যে চরণামৃতের ব্যবহার আছে। দীক্ষার সময় চরণামৃত পানের কথা আমরা আগেই বলেছি। কবীরচৌরায় কবীরদাসের যে কাষ্ঠপাদুকা রক্ষিত আছে তাই প্রক্ষালন করে সেই জল চরণামৃতরূপে ব্যবহার করা হয়। অন্যত্র গুরুর পাদোদকই চরণামৃত। অনেক সময় চরণামৃতের সঙ্গে মৃত্তিকা মিশিয়ে বড়ি তৈরি করা হয়। দূর দূরান্তের ভক্তদের সেই বড়ি দেওয়া হয়। তারা সেই বড়ি আস্ত গিলে খায় অথবা জলে গুলে নিয়ে খায়।

আমরা লক্ষ্য করেছি দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে পরওয়ানা দেন। প্রধান মহান্ত ছাড়া এই পরওয়ানা দেওয়ার অধিকার আর কারুর নেই। এই পরওয়ানাকে মুক্তির বা সৎলোকে যাওয়ার ছাড়পত্র বলা যায়। বিশেষ অনুষ্ঠান করে' এই পরওয়ানা প্রস্তুত হয় প্রধান মঠে। একটি বিশেষ স্থানে প্রচুর আস্ত পান মাটির উপর স্তূপ করে রাখা হয়। একটি বিশেষভাবে তৈরি জায়গায় আগের দিন রাত্রিবেলা একটি প্রকাণ্ড রূপদস্তার রেকাবী রাখা হয়। সারা রাত তাতে শিশির পড়ে। এই শিশিরের জলকে বলা হয় 'অমর'। কবীরপন্থীদের ধারণা এই জল সরাসরি স্বর্গ থেকে আসে। ভোরবেলা প্রধান মহান্ত সেই পানের স্তূপের সামনে বসে ধ্যান করেন। তারপর সবচেয়ে উপরের পানগুলির উপর 'অমর' দিয়ে বীজমন্ত্র লিখে দেন। এইবার পানগুলি পরওয়ানা হয়ে গেল। এরপর পানগুলি ছোট ছোট টুকরো করে সব মহান্তদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি টুকরোই পরওয়ানা। 'জোৎপ্রসাদ' বা দীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় এর বিশেষ প্রয়োজন হয়। কবীরপন্থীরা পরওয়ানাকে কবীরদাসের দেহের প্রতীক বলে মনে করেন।

কবীরপন্থীদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের নাম চৌকা। প্রতি রবিবারে এবং পূর্ণিমার দিন তাঁদের উপবাস করা বিধি। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যের সময় তাঁরা স্নান করে উপাসনার জন্য সমবেত হন। এই উপাসনাকেই বলে চৌকা। একটা চৌকো জায়গায় এই উপাসনা হয় বলে এর নাম হয়েছে

চৌকা। চৌকো জায়গাটির প্রত্যেক দিক সাড়ে পাঁচ হাত বা সাড়ে সাত হাত করে হয়। এর চারকোনে চারটি জল পূর্ণ ঘট রাখা হয়। ঘটের মাথায় সরায় করে ধান রাখা হয় এবং তার উপর তিসির তেলের প্রদীপ জ্বালা হয়। চৌকোর উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হয়। উৎসবের সময় দেওয়া হয় সাদা রঙের চাঁদোয়া কিন্তু কারও পারলৌকিক ক্রিয়া হিসাবে চৌকা হলে দেওয়া হয় লাল রঙের। চাঁদোয়ার ঠিক মাঝখানে একটি ফুলের তোড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এই চৌকোর মাঝখানে আর একটি ছোট চৌকো করা হয়। এর প্রত্যেকটি দিক হয় আড়াই হাত করে। এর মধ্যে ময়দা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রস্থলে সাতটি পদ্ম আঁকা হয়। এমনি সাধারণভাবে চৌকা হ'লে চৌকার উপরে শাদা ফুল দেওয়া হয় আর যদি পারলৌকিক ক্রিয়া হিসাবে চৌকা হয় তবে লাল ফুল দেওয়া হয়।

ছোট চৌকোর মধ্যে ভক্তদের দিকে মুখ করে বসেন মহান্ত। তাঁর ডানদিকে একটি ধাতুনির্মিত পাত্রে থাকে চরণামৃত আর পরওয়ানা আর একখানা থালায় সাজানো থাকে ১২৫টি পান। পানগুলো থালার কিনার ঘেঁষে গোল করে সাজানো হয়, আর থালার মাঝখানে রাখা হয় একটি বড় পান। তার উপরে এক টুকরো কর্পূর আর ময়দা দিয়ে মোমবাতির মত তৈরি করে রাখা হয়। একটি কাঠিতে তুলো জড়িয়ে ঘিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে এই বাতির মাথায় পুঁতে দেওয়া হয়। ছোটো চৌকোর মধ্যে মহান্তের বাঁ দিকে রাখা হয় একটি জলপূর্ণ ঘট আর একখানা থালায় বাতাসা, গুড় আর একটি নারকেল। ঘটের মাথায় ধান বা যব ভর্তি একখানা সরা রেখে তার উপর তিসির তেলের প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়।

চৌকার সময় মহান্তের সামনে একদিকে বসেন মেয়েরা আর একদিকে পুরুষেরা। মহান্ত প্রথমে তাঁর 'উপাসনা পদ্ধতি' গ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করেন। তারপর তিনি আরতি করেন। এই সময়ে পূর্বোক্ত ময়দার বাতি জ্বালান হয়। মহান্তের হাতের কাছে গোড়া থেকেই একখানা পাথরের উপর এক টুকরো কর্পূর রাখা হয়। এবার এই কর্পূরখণ্ড ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মহান্ত পূর্বোক্ত নারকেলটি ধুয়ে নিয়ে এই পাথরের উপর আছড়ে ভাঙ্গেন। তারপর পূর্বোক্ত পানের থালায় রাখা কর্পূরখণ্ড জ্বালিয়ে দিয়ে মহান্ত ঐ থালা নেড়ে নেড়ে আরতি করেন। আরতির শেষে তিনি থালাখানা

ভক্তদের হাতে দিয়ে দেন। থালাখানা তাঁদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে এবং প্রত্যেকেই তাতে কিছু প্রণামী দেন। এই অর্থ মঠের কাজে লাগান হয়।

এরপর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহান্ত পূর্বোক্ত নারকেলের অর্ধেকটা নিয়ে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাটেন। উপস্থিত কবীরপন্থীরা একে একে এসে প্রসাদের জন্য মহান্তের কাছে হাত পাতেন। মহান্ত প্রত্যেকের হাতে একটি পান, একটুকরো নারকেল, একটি বাতাসা ও একটু গুড় প্রসাদ দেন। ভক্তেরা হাঁটু গেড়ে বসে খুব ভক্তিভরে এই প্রসাদ খান। খাওয়ার সময় যাতে কণিকামাত্র প্রসাদও মাটিতে পড়ে না যায় সেদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। প্রসাদ খাওয়ার পর সবাই হাতমুখ ধুয়ে এসে আবার উপাসনার স্থানে বসেন। মহান্ত তখন প্রথমে নিজে নিজে নীরবে উপাসনা করেন। তারপর সকলের জন্য উচ্চৈস্বরে উপাসনা করেন এবং তারপর কিছু ধর্মোপদেশ দেন। এরপর চৌকাকে প্রণাম করেন এবং ভক্তরা মহান্তকে প্রণাম করেন। এই হ'ল চৌকা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে ধর্মসঙ্গীত গান করা হয়।

কখনো কখনো আরও সংক্ষেপে এবং মহান্ত ছাড়াও চৌকা হয়। তবে মহান্ত না থাকলে ভিতরের ছোট চৌকোটি করা হয় না আর পরওয়ানা ও চরণামৃতের ব্যবস্থাও থাকে না। আরও কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থার নিয়ম আছে। মহান্তের স্থলে কোনো একজন কবীরপন্থী উপাসনা করতে পারেন কিন্তু মহান্তের মত পুরোপুরি উপাসনা তিনি করতে পারেন না। আর এ রকম চৌকায় প্রসাদ দেবারও নিয়ম নেই।

পূর্ণিমা তিথি কবীরপন্থীদেয় কাছে বড় পবিত্র। সেদিন অবশ্যই চৌকা হয়।

পরওয়ানা ও চরণামৃতকে কবীরপন্থীরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন। এই পরম পবিত্র বস্তু দু'টি ছাড়া কোনো ধর্মানুষ্ঠান হয় না। কারুর অসুখ বিসুখ হ'লেও তাকে পরওয়ানা ও চরণামৃত দেওয়া হয়। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস তাতে রোগ সেরে যায়। মৃত্যুকালে কবীরপন্থীদের পরওয়ানা, চরণামৃত ও প্রসাদ দেওয়া হয়। এর ফলে মৃত্যুর পর নিশ্চিত সৎলোক-প্রাপ্তি হয় বলে এঁরা বিশ্বাস করেন। মহান্ত দূরে থাকলে তিনি কোনো একজন বিশ্বাসী কবীরপন্থীর কাছে পরওয়ানা ও চরণামৃত রেখে দেন। ইনি প্রয়োজনমত তা কবীরপন্থীদের দিতে পারেন। কিন্তু প্রসাদ মহান্ত ছাড়া

আর কারুর কাছে থাকতে পারে না। একমাত্র মহান্তই প্রসাদ বিতরণের অধিকারী।

কবীরপন্থীদের আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তার নাম 'জোৎপ্রসাদ'। এ অতি পবিত্র। চৌকার সঙ্গেই তার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে এটি হয়। সবাই এতে যোগ দেন না। যাঁরা নিজেদের যোগ্য মনে করেন শুধু তাঁরাই যোগ দেন। চৌকার সময় যে ময়দার বাতি দেওয়া হয় চৌকা হয়ে গেলে মহান্তের একজন পরিচারক সেটি নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আরও ময়দা, ঘি ও নারকেল মিশিয়ে খুব করে মেখে মহান্তের কাছে নিয়ে আসে। মহান্ত তখন তা দিয়ে কতগুলো ছোট ছোট চাকতি করে ভক্তদের আহ্বান করেন। তাঁরা এলে পর তিনি ছোট একটি ভাষণ দেন। এরপর সবাই খানিকক্ষণ নীরবে ধ্যান ধারণা করেন। তারপর প্রসাদ বিতরণ হয়। ধ্যান ধারণার পর ভক্তরা একে একে মহান্তের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ান। মহান্ত প্রত্যেকের হাতে একটি করে চরণামৃতের বড়ি ও এক টুকরো পরওয়ানা দেন। ভক্ত তৎক্ষণাৎ তা খেয়ে নেন। তখন মহান্ত পূর্বোক্ত একটি ময়দার চাকতি দেন। ভক্ত সেটি খান। এরপর দেওয়ান চৌকার কলসী থেকে একটু জল হাতে দেন। ভক্ত তাও খান। তারপর দূরে গিয়ে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নেন। এই প্রসাদকে কবীরদাসের বিশেষ প্রসাদ বলে মনে করা হয়। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস যিনি যথার্থ ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পবিত্র মনে এই প্রসাদ খান তিনি অবশ্যই সৎলোকে গমন করেন।

কবীরপন্থীদের শবসৎকারের ব্যবস্থা সাধারণ হিন্দুদের ব্যবস্থা থেকে একটু পৃথক। কখনো কখনো এঁরা শবদাহ করেন, কখনো বা সমাধি দেন। বৈরাগীদের সমাধিই দিতে হয়। গৃহস্থদের বেলা যার যেমন অভিরুচি। যেখানে সমাধি দেওয়া হয় সেখানে সমাধির উপর মহান্ত এবং আরও দু'চারজনের বসবার মত একটি বেদী তৈরি করা হয়।

কোনো কবীরপন্থীর মৃত্যু হ'লে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা দু'টি নারকেল কেনেন। এর একটি নাপিত শবযাত্রার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে চিতায় বা সমাধির মধ্যে শবের পাশে রেখে দেয়। অপরটি একুশ দিনের দিন যে শ্রাদ্ধের চৌকা হয় তাতে ব্যবহার করা হয়। এটিও সাধারণ চৌকার মতই। তবে কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাধারণ চৌকার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। যেখানে সমাধি দেওয়া হয় সেখানে সমাধির কাছেই চৌকা হয়। মহান্ত সমাধির

উপরকার বেদীতে বসেন। চৌকোর উপরকার চাঁদোয়া হয় লাল রঙ্গের। চৌকোর মধ্যে মৃতের প্রতীক হিসাবে একখণ্ড শাদা কাপড় রাখা হয়। মহান্ত প্রথমে মৃতের সৎলোকে নির্বিঘ্নগতির জন্য নীরবে প্রার্থনা করেন। তখন পাঁচটি শোকসঙ্গীত গাওয়া হয়। এরপর সবাই মিলে মহান্তকে ও মৃতের প্রতীক বস্ত্রখণ্ডকে প্রণাম করেন। এইবার যে নারকেলটি রেখে দেওয়া হয়েছিল মহান্ত সেটিকে অনুষ্ঠান করে ধৌত করেন এবং মৃতের কোনো আত্মীয় বা তদভাবে গুরুভাইয়ের হাতে নারকেলটি দেন। তিনি এটি নিয়ে ভক্তিভরে কপালে, কাঁধে ও বুকে ঠেকিয়ে কিছু দক্ষিণাসহ মহান্তের হাতে ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে কর্পূর ও বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যে পাথরের উপর কর্পূর জ্বালান হয় মহান্ত তার উপর আছড়ে নারকেলটি ভাঙ্গেন আর বলেন, এই আমি যমের মাথা ভাঙ্গছি। সমাধি দিলে এই পাথরটি সমাধির উপরেই রাখা হয়। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা এই চৌকার দিন চৌকার বাতির আলোতে মিশে যায়। বাতির আলো হচ্ছে কবীরদাসের আত্মার প্রতীক। কাজেই, মৃতের আত্মা কবীরদাসের মধ্যে লীন হয়ে যায়। এরপর সাধারণ চৌকার মতই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান হয়ে গেলে নারকেলের শাঁস কুচি কুচি করে কেটে ময়দার সঙ্গে মেশান হয় এবং তা দিয়ে ছোট ছোট লাড়ু তৈরি করা হয়। বৈরাগীরা এইগুলি কবীরপন্থীদের ঘরে ঘরে বিলি করেন।

কবীরপন্থীদের অভিবাদনেরও বিশেষত্ব আছে। তাঁরা পরস্পরকে যখন অভিবাদন করেন তখন বলেন 'সৎসাহেব' আর যখন অন্য হিন্দুদের অভিবাদন করেন তখন বলেন 'রাম রাম'।

আমরা এর আগে একাধিকবার বলেছি কবীরদাস প্রচলিত মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। মূর্তিপূজা কবীরপন্থীদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মূর্তিপূজার আনুষঙ্গিক বলি প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। কিন্তু এই দু'টি জিনিষই যে কবীর-পন্থীদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাও বলেছি। মনে হয় এর কারণ মূর্তিপূজা সাধারণ হিন্দুদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আর কবীরপন্থীদের অধিকাংশই হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর থেকে এসেছে। কাজেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বসংস্কার প্রভৃতিও অনেকগুলি এসেছে। পন্থে যোগ দেওয়ার পরও তারা সেগুলি ছাড়তে পারে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাণ্ডলার কবীরপন্থী মাহারদের কথা বলা যায়। এরা নাকি প্রতি তিন বছরে

একবার দুল্‌হাদেবের (ইনি বর-দেবতা) কাছে পাঁঠা বলি দিয়ে মাংস খায়। অনেক কবিরপন্থী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের নামে বাতি ও কর্পূর জ্বালে। এরা সত্যনারায়ণের প্রসাদ খায় এবং ভগবতীর ও নারকেল প্রসাদ খায়। অশিক্ষিত কবীরপন্থীরা বীজক গ্রন্থের রীতিমত পূজা করে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত কবীরপন্থীরাও কবীরদাসের খড়ম ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন তা মূর্তিপূজার থেকে ভিন্ন মনে হয় না। তা ছাড়া, এঁদের পরওয়ানা, চরণামৃত প্রভৃতিও মূর্তিপূজারই সমর্থক বলা যায়।

কবীর পন্থীরাও হিন্দুই। কাজেই এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

ভক্ত কবীরকে কেন্দ্র করে' এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে হিন্দী ভাষায়। কবীরপন্থীদের সাহিত্য বিপুলায়তন। তবে এঁদের অধিকাংশ গ্রন্থই আধুনিক। কতকগুলি গ্রন্থ অবশ্যি অষ্টাদশ শতাব্দীর হ'তে পারে[১]। বহু গ্রন্থ ছাপা হয়েছে এবং হাতে-লেখা অবস্থায় ও অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বীজক এবং সাখী ছাড়া অন্য যে সব গ্রন্থ ছাপান হয়েছে তার অধিকাংশই ছত্তিশগড়ী গুরুদের কর্তৃত্বে ছাপান হয়েছে। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলি আবার কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে রচিত[২]।

কবীরদাস স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। কাজেই, তিনি নিজে কিছু লিখে যান নি। তাঁর বাণী তাঁর শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত হ'ত। এই বাণীর সংখ্যা যে কত তাও সঠিক বলা যায় না। কবীরপন্থীরা ত বলেন কবীরদাসের বাণী সংখ্যাতীত। বলা বাহুল্য, এসব কথার বিশেষ কোন মূল্য নেই। কবে যে কবিরদাসের বাণী প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছে তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে কবীরদাসের জীবিতাবস্থায় হয়নি বলেই মনে হয়। হ'লে তার কোন নিদর্শন অবশ্যই পাওয়া যেত।

কবীরদাসের নামে প্রায় ছ' ডজনের উপর গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তবে এই সব গ্রন্থ যে কবীরদাসের রচনা নয় তা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যায়। সম্প্রদায়বাদ, বাহ্যাচার, বাহ্য বেশভূষা কবীরদাস ছিলেন এ সবের একান্ত বিরোধী। অথচ, এই সব গ্রন্থে এইগুলির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।[৩] এমনকি বীজকেও খানিকটা পরবর্তী রচনা স্থান পেয়েছে[৪]। কবীর-মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত শিখ প্রভৃতি পরবর্তী বিবিধ ধর্মসম্প্রদায় ও আপন আপন সম্প্রদায়ের মতানুকূল অনেক বাণী কবীরদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এতেও কবীরদাসের রচনার কলেবরবৃদ্ধি হয়েছে। এ ছাড়া শিষ্য গ্রন্থ রচনা করে' গুরুর নামে প্রচার করেছেন এরূপ বহু দৃষ্টান্ত

---

১ Kabir and His Followers p. 130.

২ ঐ পৃঃ—১১২—১১৩

৩ ডাঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ১৪—১৬

৪ ঐ পৃঃ ১৮

প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায়। এটি একটি প্রাচীন প্রথা। কবীরপন্থীরা ও এই প্রথার অনুসরণ করেছেন। তাঁরাও পরবর্তী অনেক রচনা কবীরদাসের নামে প্রচার করেছেন[১]।

কবীরমতের পুরোনো ও প্রাথমিক সংগ্রহ বীজক[২]। এটি কবীরপন্থীদের বেদ। বীজকের আছে ১১টি বিভাগ বা অঙ্গ। যথা—রমৈনী, শব্দ, জ্ঞান চৌতীসা, বিপ্রবতীসী, কহরা, বসন্ত, চাচর, বেলী, বিরহুলী, হিণ্ডোলা এবং সাখী। এর এক একটা বিভাগ নিয়ে আবার নূতন নূতন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থেও পরবর্ত্তী যোজনা যথেষ্ট পাওয়া যায়[৩]। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কবীরদাসের নামে হাজার পাঁচেক সাখী চলছে। তার মধ্যে মাত্র ৪০০ বীজকে আছে[৪]। কাজেই, বাকী গুলি যে কবীরদাসের রচনা নয় তা সহজেই বুঝা যায়। বীজকের মধ্যে সাখীই সবচেয়ে প্রামাণ্য। শব্দও অবশ্যি প্রায় সাখীরই মত প্রামাণ্য।[৫]

কবীরদাসের বাণীর একটি ধারা প্রচলিত ছিল বিহার প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে, আর একটি উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে। প্রথমটি থেকে হয় বীজকের সংগ্রহ আর দ্বিতীয়টি থেকে আদিগ্রন্থের[৪]। প্রবাদ আছে বীজক প্রচারিত হবার আগে অনেক কাল ছাপরা জেলার ধনৌতী মঠে পড়ে ছিল। পরে প্রচারিত হয়[২]। এর থেকে ও পূর্বোক্ত মত সমর্থিত হয়।

শিখগুরু অর্জ্জুনের আদেশে আদিগ্রন্থ সংকলিত হয়। এতে কবীরদাসের বাণীর সঙ্গে অন্য অন্য কয়েকজন ভক্তের বাণীও সংগৃহীত হয়েছে। আদিগ্রন্থের পদগুলিতে কবীরদাসের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ বেশী পাওয়া যায়। বীজক ও আদিগ্রন্থে সংগৃহীত কবীরদাসের পদগুলি আলাদা আলাদা। কয়েকটিমাত্র পদ উভয় সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। তবে ভাব ও ভাষা উভয় সংগ্রহেই একই রকম। উভয় সংগ্রহেরই অধিকাংশ পদ খাঁটি। তবে ভেজাল আছে উভয় সংগ্রহেই[১]।

---

১ Kabir and His Followers p 113

২ কবীর পৃঃ ১৮

৩ কবীর পৃঃ ১৭

৪ Kabir and his Followers pp 61

৫ কবীর পৃঃ ১৮

বীজকের বাইরে আদিগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেরও কবীরদাসের বাণী পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব বাণীর সবই খাঁটি কিনা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের অভিমত অধিকাংশই খাঁটি।[1]

কবীরদাসের বাণীর বহু সংগ্রহ এযাবত প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা সংগ্রহ হ'ল—

১। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে প্রকাশিত বাবু শ্যামসুন্দরদাস সম্পাদিত কবীরগ্রন্থাবলী।

২। ঐ সভা থেকেই প্রকাশিত পণ্ডিত অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় 'হরিঔধ'-এর 'কবীর রচনাবলী।' ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন এইটিই সব চেয়ে ভাল সুসম্পাদিত সংস্করণ।[2]

৩। প্রয়াগ বেলবেডিয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত কবীরদাসের শব্দাবলী।

কবীরপন্থীদের সাহিত্য-সৃষ্টি নগণ্য নয়। এই সবের সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক সংখ্যা কম নয়। আমরা তার থেকে অল্পাধিক নামকরা কয়েকখানার উল্লেখ করছি।[3]

১। সুখ নিধান—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা। এতে কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন-আকারে কবীরদাসের মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থখানিতে ধরমদাসের কবীরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণের কাহিনী আছে।

২। গুরু মাহাত্ম্য—সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত। গ্রন্থখানি পদ্যগ্রন্থ।

৩। গোরখগোষ্ঠী বা গোরখনাথকী গোষ্ঠী। ছোট পদ্যগ্রন্থ। কবীরদাস ও বিখ্যাত যোগী গোরখনাথের মধ্যে দার্শনিক আলোচনা এর বিষয় বস্তু। অবশ্যি, এ আলোচনা কাল্পনিক। তবে গ্রন্থখানার কাব্য সৌন্দর্য আছে।

৪। অমর মূল—রচনার কাল ১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। চৌপাঈ ও সাখী আকারে রচিত। বিরাটগ্রন্থ। ১০ খণ্ডে ৫০০০ স্তবকে সমাপ্ত। কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে লেখা। কবিত্ব কিছু নেই।

---

১ Kabir and His Followers Pp 59—60

২ কবীর পৃঃ ২০

৩ এই তালিকা Kabir and His Followers থেকে প্রধানতঃ নেওয়া হয়েছে।

৫। কবীর বাণী—১১০০ স্তবকে সমাপ্ত। চোপাঈ ও সাখী আকারে লেখা। কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা।

৬। আলিফ নামা—বীজকের চৌতীসী ধরণের রচনা। ফার্সি বর্ণমালার এক একটি অক্ষর নিয়ে এক একটি পদ রচনা করা হয়েছে। তবে ভাষা হিন্দী।

৭। মুক্তি মূল—কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে লেখা। এতে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভক্তি, যোগতত্ত্ব, ষড়দর্শন, আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সহজ হিন্দীতে লেখা। তাতে মনে হয় রচনা আধুনিক।

৮। ভবতারণ—পদ্যগ্রন্থ। কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে রচিত। এতে ভবসমুদ্র পার হবার উপায় আলোচিত হয়েছে।

৯। কর্মবোধ—অংশতঃ গদ্যে এবং অংশতঃ পদ্যে রচিত। কর্মবন্ধন সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১০। নিরঞ্জন বোধ—চোপাঈ ও সাখী আকারে লেখা। এর বিষয়বস্তু জ্ঞানীর সঙ্গে নিরঞ্জনের বিতর্ক ও নিরঞ্জনের পরাজয়।

১১। জ্ঞানবোধ—চোপাঈ, সাখী ও সরোঠা আকারে লেখা। বিষয়বস্তু কবীরমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

১২। মুক্তিবোধ—চোপাঈ ও সাখী আকারে লেখা। চৌকা অনুষ্ঠানের আলোচনা এতে আছে।

১৩। চৌকা স্বরোদয়—চোপাঈ ও সাখী আকারে লেখা। চৌকা অনুষ্ঠানের অলোচনা এতে আছে।

১৪। জীবধর্ম বোধ—মস্ত বড় কাব্য। এতে চোপাঈ প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক রচনা। এর অনেক বিষয়বস্তু 'কবীর-ই-মনশুর' থেকে নেওয়া হয়েছে। এতে ধর্মসংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা আছে।

১৫। কবীর-ই-মনশুর বা কবীর মনশুর—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দ উর্দু ভাষায় রচনা করেন। ১৯০৩ খৃঃ এর হিন্দী অনুবাদ হয়। বিরাট পদ্যগ্রন্থ। কবীরপন্থীদের সম্বন্ধে বহুপ্রকারের তথ্যের খনি বিশেষ। সাম্প্রদায়িক মতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে।

১৬। পঞ্চকগ্রন্থী—মহাত্মা রামরহেস (রামরহস্য) কৃত। এই গ্রন্থেই প্রথম কবীর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে দার্শনিক ও নৈয়ায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বীজকের সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করাই গ্রন্থের প্রধান

উদ্দেশ্য। সেইজন্য বহুক্ষেত্রে বীজকের শব্দ, রমৈণী প্রভৃতি প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থখানা পদ্যে রচিত। এতে পাঁচটি অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থের অনেক পদে 'কহৈঁ কবীর' বলে ভণিতা থাকায় এইগুলি সাধারণের মধ্যে কবীরদাসের রচনা বলে চল্ছে। গ্রন্থখানা কবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত। এইজন্য, একে সদ্গ্রন্থ পঞ্চকগ্রন্থী বলা হয়।

১৭। বীজকের টীকা—রেওয়ার মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহজী দেব কৃত। গ্রন্থখানি বঘেলখণ্ডী হিন্দীতে রচিত। বীজকের অনেক টীকা আছে। তার মধ্যে এই টীকাখানি এবং পূর্ণদাসজী কৃত 'ত্রির্ধা' নামক টীকা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। টীকাকার বিশ্বনাথ সিংহজী দেব একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সগুণ রামের উপাসক।এইজন্য, এই টীকা অনুসারে বীজকের প্রতিপাদ্য রাম সাকেতবাসী রাম। তবে তিনি সগুণ নির্গুণের অতীত একথা ও টীকাকার বলেছেন। এই টীকা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এতে ভাগবত, উপনিষদ, স্মৃতিশাস্ত্র, বৈষ্ণব সংহিতা প্রভৃতি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু কবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই টীকা প্রমাণ্য বলে গণ্য হয় না।

১৮। বীজকের টীকা—পূর্ণদাসজী কৃত। এই গ্রন্থের নাম ত্রির্ধা, এই টীকা কবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত। গ্রন্থের গোড়ার দিকটা পদ্যে রচিত আর শেষের দিকটা গদ্যে রচিত। ব্যাখ্যেয় পদগুলির এবং তৎসম্বন্ধীয় নানা সমস্যার আলোচনা এতে আছে। যে সব গ্রন্থে কবীরমতকে একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থ তাদের অন্যতম। তবে টীকাকার নিজের অভিপ্রায় অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে জোর করে শব্দের অর্থ করেছেন।

১৯। নির্ণয়সার—পূর্ণদাসজী রচিত। ক্ষুদ্র গ্রন্থ, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' মতের ভাঁওতায় পড়ে জীব নানা ভ্রান্তিতে ডুবেছে। এই ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারের উপায় কবীরদাসের 'পারখ পদ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাণীর মর্মোপলব্ধি। গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ছলে চৌপাঈ ও দোঁহা আকারে রচিত।

কবীরপন্থীদের এই সব রচনার অধিকাংশই কবীরদাসের নামে চালান হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থের বেলা ও এই রীতির ব্যতিক্রম হয় না। কাজেই প্রায় ক্ষেত্রেই সত্যিকারের লেখক কে জানবার উপায় নেই।

আর রচনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই কাব্যাকারে হ'লেও কাব্য-সৌন্দর্য বলতে এদের প্রায় কিছুই নেই। কাজেই এদের সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই।

তাছাড়া, রচনাগুলি একঘেয়ে। অধিকাংশ গ্রন্থই কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে লেখা। বিষয় বস্তুও একই—অন্যান্য মতের উপর কবীরমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সৎপুরুষ, সদ্‌গুরু ও শব্দের মাহাত্ম্য, সৃষ্টিতত্ব, কালের অত্যাচার, মুক্তির উপায়, ভক্তির প্রাধান্য, সাধুগুরু-সেবা, ধরমদাস ও তাঁর বংশের গুরুদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও অধিকার এই হ'ল অধিকাংশ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য।

কবীরপন্থীদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য থাক বা না থাক স্বয়ং কবীরদাসের রচনার যে বিশেষ সাহিত্যিক মূল্যও আছে এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলেও দ্বিমত নেই। তবে কবীরদাসের ভাষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যাঁরা হিন্দীভাষী নন তাঁদের কাছে ভাষাটা সহজ নয়। কবীরদাসের বাণী প্রাচীন পূর্বী হিন্দী ভাষায় রচিত। তিনি ব্যবহার করেছেন সেদিনকার কাশী অঞ্চলের জনসাধারণের ভাষা। ফলে অনেক স্থানীয় শব্দ, স্থানীয় উপমা, বিশেষ রকম বাগ্‌বিধি এবং বহু আরবী ফার্সি শব্দ তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এর জন্য অহিন্দীভাষীদের কাছে এ ভাষা সহজবোধ্য নয়। এ ছাড়া, কবীরদাস অনেক ক্ষেত্রে সন্ধা ভাষা ও যৌগিক রূপক ব্যবহার করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্যের কাছে ভাষা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যরসিকদের কাছে কবীরদাসের রচনা অনুপম। হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন[১], হিন্দী সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে কবীরদাসের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো লেখকের আবির্ভাব হয় নি। ব্যক্তিত্বের মহিমায় কবীরদাসের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তুলসীদাস। কিন্তু উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। দু'জনেই অবশ্যি ভক্ত ছিলেন। কিন্তু স্বভাব, সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গী দু'জনের ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। আপনভোলা ভগবৎপ্রেমে সদানন্দ উদাসীন মানুষ কবীরদাস। সব কিছুকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে যাবার যে দুর্দমনীয় তেজ ছিল তাঁর মধ্যে তাতে করেই তিনি হিন্দী সাহিত্যে অদ্বিতীয় হয়ে রয়েছেন। কবীরদাসের বাণীতে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর সর্বজয়ী ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই কবীরদাসের বাণী অনন্যসাধারণ জীবনরসে ভরে উঠেছে। এর জন্যই

১ কবীর পৃঃ ২১৭

কবীরদাসের বাণী অননুকরণীয়। আর এই জন্যই কবীরদাসের বাণী শ্রোতার চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে। সহৃদয় সমালোচক, এই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের পরিমাপ করতে পারেন না আর সেইজন্য মুগ্ধ হয়ে কবীরদাসকে 'কবি' বলে সন্তোষ লাভ করেন। যাঁর বাণীর এমন আকর্ষণ তাঁকে 'কবি' না বলে আর কি বলা যায়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কবীরদাসের এই কবিরূপটি একেবারে 'ফাউ' হিসেবে পাওয়া গেছে। কবীরদাস কবিতা লিখবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বাণী রচনা করেন নি। তাঁর ছন্দ যোজনা, উক্তিবৈচিত্র্য, অলংকারবিধান সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক আর অযত্নসাধিত। কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না আর তিনি এসব মানতেনও না। নিজের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যই সহৃদয়দের আকৃষ্ট করতেন।

হিন্দীসাহিত্যামোদীরা বলেন কবীরদাস ছিলেন বাণীর যাদুকর। যখন যেমন চেয়েছেন তখন তেমনি ভাষা ব্যবহার করেছেন। অনির্বচনীয়কে তিনি বাণীরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সাধারণ লোকের ভাষায়। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন-জীবনের নিত্য ব্যবহার্য অতি পরিচিত বস্তু উপমা ও রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি গূঢ় তত্ত্বকথাকে তাদের কাছে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন।

কবীরদাসের অনেক বাণী তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। এ বিষয়ে হিন্দী সাহিত্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ভাষা এমনি সহজ ও জোরালো যে সোজা মর্মে গিয়ে আঘাত করে। তাঁর প্রকাশভঙ্গীটী এমনি যে বিশেষ কিছু না বলেও তিনি সব কিছুই বলেন। কবীরদাস খাঁটি মানুষ ছিলেন। তাই কোথাও ভণ্ডামি বা মিথ্যাচার দেখলে মর্মঘাতী আঘাত হানতেন। পণ্ডিত, কাজী, অবধূত, যোগী, মোল্লা, মৌলভী কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা কন নি। ভণ্ডামি করে তাঁর কাছে কারুর রক্ষা ছিল না। এই ব্যঙ্গাত্মক রচনা অতিশয় উপভোগ্য।

ভারতীয় সাধকদের মধ্যে সন্ধা বা সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কবীরদাস এ বিষয়ে পূর্বজদেরই অনুসরণ করেছেন। সহজযানী বৌদ্ধরা প্রথমে এই ভাষা ব্যবহার করেন। পরে যোগী ও তান্ত্রিকেরা ব্যবহার করেন। 'সন্ধ্যা ভাষা'র অর্থ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, যে-ভাষার খানিকটা অংশ বুঝা যায় আর খানিকটা থাকে অস্পষ্ট, কিন্তু জ্ঞানদীপ জ্বালার পর সবই স্পষ্ট হয়ে যায় তার নাম সন্ধ্যা ভাষা। এই

ভাষার রচনার বাইরের অর্থ এক, তা অনেক সময় অর্থহীন ও উল্টোপাল্টা মনে হয় কিন্তু ভিতরের অর্থ অন্য, সেটি গভীর। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন 'কথাটা সন্ধ্যা ভাষা নয়, 'সন্ধা ভাষা' মানে অভিসন্ধিত বা অভিপ্রায়যুক্ত ভাষা।' অনধিকারীর পক্ষে এ ভাষার অর্থ বুঝা সম্ভবপর নয়।

কবীরদাস অনেক ক্ষেত্রে যৌগিক রূপক ব্যবহার করেছেন। যোগমার্গের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর বাণীর অর্থ করা অসম্ভব। যে সব রচনায় সন্ধা ভাষা বা যৌগিক রূপক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে সে সব রচনার অর্থ করতে গেলে দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক—শাস্ত্রীয় পরম্পরা, দুই—কবীরদাসের ব্যক্তিগত মতামত। তা নইলে অর্থ করা দুরূহ হবে।

কবীরদাসের বাণী সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কবীরদাস সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য কিছু রচনা করেন নি। তিনি সাহিত্যিকই ছিলেন না। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন[১]—কবীরদাস আসলে ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্য যা-কিছু প্রকাশ তা এই মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুক প্রেম যে কি জিনিষ তা বলে বুঝান যায় না, অনুভব করতে হয়। কবীরদাস এই ভক্তির বা প্রেমের কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় এমন সব কথা বলেছেন যা ভক্তি বা প্রেম নয় কিন্তু তার অনুভবের সহায়ক। মূল বস্তু অনির্বচনীয়। সেই অনির্বচনীয়কে ভাষাদ্বারা সংকেতিত করার, রূপের দ্বারা অরূপের ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন কবীরদাস। রূপের দ্বারা অরূপের ব্যঞ্জনা, বাক্যের দ্বারা অনির্বচনীয়ের ইসারা এইত শ্রেষ্ঠ কবিত্ব। কাজেই কবীরদাসের বাণী স্বভাবতই কাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাঁরা কবীরদাসের বাণী শুধু কাব্য হিসাবে পাঠ করেন তাঁদের মূলবস্তু সম্বন্ধে ভুল করার খুব সম্ভাবনা থাকে।

কবীরদাসের বাণী ভক্তের অন্তরের বাণী এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

ভাবনির্দেশক এমন বহু শব্দ আমরা জানি যেগুলির অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে কিন্তু শব্দগুলির সঠিক অর্থ যে কি তা আমরা অনেক সময় জানি না। এই ধরণের শব্দ কবীরদাসের রচনায়ও অনেক

১ কবীর পৃঃ ২২০

আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবীরদাস কতক শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন নি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এইজন্য তাঁর রচনায় বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত জানার চেষ্টা করা প্রয়োজন। নৈলে, তাঁর বাণীর ঠিকমত অর্থ বুঝা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ এখানে এরূপ কয়েকটি শব্দের আলোচনা করা গেল।

নিরঞ্জন—কবীরদাস নিরঞ্জনের কথা অনেক পদে বলেছেন। কে এই নিরঞ্জন। 'সাধারণ অর্থে নিরঞ্জন শব্দ নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝায়, বিশেষ অর্থে শিবকে। কবীরদাস নিজে নিরঞ্জনকে পরমারাধ্য মনে করতেন। কিন্তু পরে কবীরপন্থীদের হাতে পড়ে নিরঞ্জন হয়ে গেছেন পাক্কা সয়তান।'[১] কবীরদাস যে তাঁর পরমারাধ্য রামকেই নিরঞ্জন বলেছেন একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাঁর একাধিক পদে, যেমন একটি পদে বলেছেন নিরঞ্জন সব ঘটে বিরাজমান। নিরঞ্জন ছাড়া মুক্তি নাই।[২] আবার বলছেন গোবিন্দ, তুই নিরঞ্জন, তুই নিরঞ্জন, তোর রূপ নেই, রেখ নেই, মুদ্রা নেই, মায়া নেই, তুই সমুদ্র নস্, পাহাড় নস্, পৃথিবী নস্, আকাশ নস্, চন্দ্র সূর্য নস্, পবন নস্, নাদ নস্, বিন্দু নস্, তুইই রাম।

শূন্য ও সহজ—'বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের মতে শূন্য এক অনির্বচনীয় অবস্থা। শূন্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাগার্জুন বলেছেন একে শূন্য বলা যায় না, অশূন্যও বলা যায় না। আবার এও বলা যায় না যে এ শূন্যও নয় অশূন্যও নয়। এই ভাব বুঝাবার জন্য শূন্যের ব্যবহার।' নাথপন্থী যোগীদের মতে জীবাত্মা সকলের উপরের চক্র শূন্যচক্রে পৌছালে সকল দ্বন্দ্বের অতীত হয়ে 'কেবলরূপে' বিরাজমান হন। এঁদের মতে তাই শূন্যাবস্থা যা'তে আত্মার সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, হর্ষ অহর্ষ প্রভৃতি কোনো প্রকার অনুভূতিই হয় না। এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত অবস্থা কেবলাবস্থা, শূন্যাবস্থা, যোগীরা একে শূন্যাশূন্য অবস্থাও বলেন।

নাথপন্থীদেরও আগে সহজযানী সিদ্ধারা কেবলাবস্থাকে বারবার শূন্য বলেছেন। এঁরা আবার শূন্য ও সহজ এই কথা দু'টি একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এই পরম্পরা অর্থাৎ শূন্য ও সহজ শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহার

১ কবীর পৃঃ ৫২-৫৩
২ কবীরগ্রন্থ পদ সংখ্যা ৩৩৭

করার পরম্পরা নাথপন্থীরা মেনে চলেছেন। কবীরদাস প্রভৃতি সন্তরাও এটি বজায় রেখেছেন। কবীরদাস প্রায়ই 'সহজশূন্য' একসঙ্গে এবং বহুস্থানে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। নাথপন্থীদের চরম লক্ষ্য সহজাবস্থা আর শূন্যাবস্থা অভিন্ন। সহজযানী সিদ্ধাদের সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। তবে কবীরদাস শূন্য ও সহজ নিয়ে যে রকম সমাধির কথা বলেছেন তা যোগীদের সহজাবস্থা থেকে ভিন্ন।

কবীরদাস সেই সন্তকে জপতপ সব ভেট দিতে প্রস্তুত যিনি তাঁকে বিন্দুমাত্র রামরস চাখিয়ে দেবেন। এই রামই তাঁর সহজাবস্থার সুখ।

কবীরদাসের মতে তাই সহজাবস্থা যা'তে ভক্ত সহজেই ভগবানকে পেতে পারে। পুত্রকলত্র আর বিত্ত ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য কিন্তু এমন কোনো একটি যোগ আছে যাতে করে এইসব বন্ধন আপনি আলগা হয়ে যায়। কবীরদাস এই অনাসক্তি যোগ আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা এই 'সহজ' শব্দটিকেও 'লোক' বিশেষ বুঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন এবং সেই লোকে পৌছাবার নানা পন্থাও নির্দেশ করেছেন। এঁদের মতে সকলের উপর সত্যলোক, তার নীচেই 'সহজ লোক।'[১]

খসম—'সিদ্ধাদের গানে ও দোহায় খসম শব্দের ব্যবহার আছে। সেখানে শব্দটি সহজাবস্থা বা শূন্যাবস্থাবাচক।

সহজযানীরা শূন্যাবস্থা আর নৈরাত্ম্যভাব বুঝাবার জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যোগী আর তান্ত্রিকদের সাহিত্যে শব্দটির অর্থের একটু পরিবর্তন হয়েছে। নৈরাত্ম্য অবস্থার স্থলে তাঁরা ভাবাভাববিনির্মুক্ত অবস্থার কথা এই শব্দের দ্বারা সূচিত করেছেন। যোগীরা খসম শব্দের তুল্যার্থক গগনোপম শব্দও ব্যবহার করেছেন।

কবীরদাসের সময়ে আরবী খসম (পতি) শব্দ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে। কাজেই, এই উভয় অর্থেই তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হটযোগীদের মধ্যস্থতায় তিনি খসম শব্দের অর্থ জেনেছিলেন আত্মার শূন্যচক্রে সমভাব প্রাপ্ত হওয়া আর মুসলমানদের কাছে জেনেছিলেন খসম শব্দের অর্থ পতি।'[২]

এখানে বলা আবশ্যক যে খসম শব্দটি কবীরদাসের কাছে খুব সম্মানার্থক ছিল না। তিনি নিকৃষ্ট পতি অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডাঃ

---

১ কবীর পৃঃ ৭২, ৭৩, ৭৫

২ কবীর পৃঃ ৭৫-৭৮

দ্বিবেদীজী বলেন, 'কবীরদাস যোগীদের কৃচ্ছ্রাচার দ্বারা প্রাপ্ত সমাধিকে খুব উচ্চ স্তরের অবস্থা মনে করতেন না। এই জন্য তাঁদের গগনোপমাবস্থা বা খসমভাবকে সাময়িক আনন্দই মনে করতেন। কবীরদাস সব সময় সহজ সমাধিকে সকলের বড় মনে করতেন। এই কারণেই খসম শব্দের অর্থ তিনি সব সময়ে নিকৃষ্ট পতি মনে করেছেন। ইন্দ্রিয়বধূর খসমের সহিত শোওয়া কথাটা তিনি যৌগিক ক্রিয়াদ্বারা মুগ্ধ হয়ে থাকা এমনি কোনো অর্থে ব্যবহার করেছেন মনে হয়। আবার যে স্বামী স্ত্রীকে বশ করতে পারে না তাকেও খসম বলে। আর এই জন্য, কবীরদাস ইন্দ্রিয়ের দাস মনকে কখনো কখনো খসম বলেছেন।

কবীরদাসের নামে প্রচলিত পরবর্তী ভজনগুলিতে এই অর্থেই শব্দটির অধিক ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী টীকাকার ও ভক্তেরা শব্দটিকে কখনো জীব কখনো বা পরমাত্মা অর্থেও ব্যবহার করেছেন।'[১]

সুরত—কবীর-সাহিত্যে সুরত (সুরতি), নিরতি আর শব্দ এই কথা তিনটি পারিভাষিক। রতি অর্থ বহির্মুখী প্রবৃত্তি। অতএব নিরতি অর্থ বহির্মুখী প্রবৃত্তির নিরোধ। সুরতি (সুরত) মানে অন্তর্মুখী প্রবৃতি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সুরতির অর্থ করেছেন প্রেম আর নিরতির অর্থ বৈরাগ্য। শব্দ মানে ব্রহ্ম। নিরতি সুরতিতে তারপর সুরতি শব্দে মিশে গেলে তবেই জীবব্রহ্মের অভেদ দর্শন হয়।

ঘরনি—এই কথাটার সাধারণ অর্থ ঘরণী বা গৃহিনী। কিন্তু এটি যোগীদের একটি পারিভাষিক শব্দ। সহজযানী সিদ্ধারা যোগমার্গের সাধনার তিনটি পথের কথা বলেছেন। এক—অবধূতী, দুই—চাণ্ডালী, তিন—ডোম্বী বা বাঙ্গালী। অবধূতীর পথ ইড়া নাড়ী। অবধূতীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে। চাণ্ডালীর পথ পিঙ্গলা নাড়ী। চাণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছেও বলা যায় নেইও বলা যায়। আর ডোম্বী বা বাঙালীর পথ সুষুম্না নাড়ী। এতে একেবারে বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান বিরাজমান।[২] কবীরদাস কোথাও কোথাও এই পারিভাষিক অর্থে কথাটা ব্যবহার করেছেন।

দুল্‌হা—সাধারণ অর্থ বর, স্বামী। কিন্তু কবীরদাস শব্দটি কখনো জীবাত্মা, কখনো মন, কখনো বা রাম অর্থে ব্যবহার করেছেন।

---

১ কবীর পৃঃ ৭৮
২ কবীর পৃঃ ৭৮

কমল—পিণ্ডতে (শরীরে) যা শূন্য বা সহস্রার চক্র ব্রহ্মাণ্ডে তাই সর্বত্রব্যাপ্ত মহাকাশ। পিণ্ডের এই শূন্য বা সহস্রার চক্রকেই কবীরদাস বলেছেন কমল। এই কমল না ফোটেই বিকশিত হয়। এই যে শূন্য বা মহাকাশ বা কমল এইটেই সীমা ছাড়িয়ে অসীমে পৌছাবার উপযুক্ত স্থান।

কবীরদাস এমনি ধরণের বহু সাধারণ শব্দ অসাধারণ অর্থে, সাধনার কোনো এক সংকেত হিসাবে বা আধ্যাত্মিক কোনো এক ভাব বুঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন। একই শব্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকেত হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। আবার একই জিনিষ বুঝাবার জন্য বিভিন্ন শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন নানা জায়গায়। যেমন[১] মন বুঝাবার জন্য তিনি মচ্ছ, মাছ, মীন, জুলাহা, সাউজ, সিয়ার, হস্তী, মতঙ্গ, নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জীবাত্মা বুঝাবার জন্য পুত্র, পারথ, জুলাহা, দুল্‌হা, সিংহ, মূসা, ভোঁরা, যোগী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, ইন্দ্রিয় বুঝাবার জন্য সখী, সহেলরী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কবীরদাসের রচনায় অনেক 'উলটবাঁসিয়াঁ' বা উল্টো কথা পাওয়া যায়। বিশেষ করে তিনি যেখানে যৌগিক রূপক ব্যবহার করেছেন সেখানে এটি লক্ষ্য করা যায়। এটি কবীরদাসের উপর যোগীদের প্রভাবের ফল। যোগী এবং তান্ত্রিকরা সাধারণতঃ লোকে যে পথে চলে সে পথে চলেন না। তাঁদের পথ উল্টো। যেমন—সাধারণতঃ লোকে জানে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম। যোগীও তান্ত্রিকরা বলেন এ ভুল, চতুর্বর্গ হ'ল মোক্ষ-ধর্ম-অর্থ-কাম আর চতুরাশ্রম হ'ল সন্ন্যাস-বানপ্রস্থ-গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য।[২] এঁদের মতে সারা দুনিয়া চলছে উল্টো পথে, শুধু এঁরাই চলছেন ঠিক পথে। এই ধারণার জন্য যোগী আর তান্ত্রিকরা সবাই যা বলে তার উল্টো কথা বল্‌তে লাগলেন। যোগী এবং তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে ক্রমে এটি রেওয়াজ হয়ে গেল এবং পরম্পরাক্রমে চলতে লাগল। কবীরদাস এই পরম্পরার মধ্যে লালিত হন। এই জন্যই তাঁর বাণীতে উল্টো কথা বা 'উলটবাঁসিয়াঁ' দেখা যায়।

---

১ শ্রীবিচারদাসজী কৃত বিচার পৃঃ ৪।

২ ডাঃ দ্বিবেদীজী কৃত কবীর গ্রন্থের পৃঃ ৮০ তে ধৃত 'গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ'-এর উদ্ধৃতি থেকে তথ্য সংগৃহীত।

যোগী এবং তান্ত্রিকদের মধ্যে কতকগুলি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি পারিভাষিক শব্দ। কবীরদাস এইসব পারিভাষিক শব্দ যোগীদের মধ্যে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছেন আবার কোথাও কোথাও তিনি স্বয়ং কতকগুলি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। মায়া এবং জীব অর্থে 'বিলৈয়া', 'মূসা', 'পূত', 'বাঁঝমাতা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন যোগীদের সাহিত্যে এসব শব্দ পাওয়া যায় না।[1]

কবীরদাস অনেক ক্ষেত্রে হটযোগ সাধনার কথা বলেছেন অতি পরিচিত সাধারণ রূপকের সাহায্যে। যোগসাধনার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাক্‌লে এসব ক্ষেত্রে কবীরদাসের বাণীর অর্থ করাই সম্ভবপর হবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে এরূপ কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল।[2]

গঙ্গা = ইড়া নাড়ী
যমুনা = পিঙ্গলা নাড়ী
সরস্বতী = সুষুম্না নাড়ী।

ত্রিবেনী বা প্রয়াগ = ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গমস্থল আজ্ঞাচক্র।

কৈলাস = ষটচক্রের পরে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। তারপরে শূন্যচক্র বা গগনমণ্ডল। এইটি দেহের মধ্যেকার কৈলাস।

অমর বারুণী = ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার, তার মূলে ত্রিকোণাকার যোনি নামক শক্তিকেন্দ্র। এইটি চন্দ্রের স্থান। এর থেকে সর্বদা অমৃত ঝরছে। এই অমৃতই অমর বারুণী।

গোমাংস ভক্ষণ = খেচরীমুদ্রার সাহায্যে জিহ্বাকে উল্টিয়ে তালুদেশে নিয়ে যাওয়ার নাম গোমাংস ভক্ষণ। গো অর্থ জিহ্বা।

কিন্তু কবীরদাসের বাণী সম্বন্ধে যে কথাটা সকলের আগে মনে রাখা দরকার সেটি হ'ল কবীরদাসের বাণী ভক্তের বাণী, মরমী সাধকের বাণী। সে-বাণীর মর্মগ্রহণ করতে হ'লে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও অনুকূল মনোভাব নিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন। মরমিয়া ভক্ত সাধকদের সে এক আলাদা জগৎ। তাই সে জগতের ভাষাও আলাদা। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে ক্রমে সেই জগতের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন মরমী ভক্তের ভাষা বুঝতে পারা যায় আর তখনই তাঁর বাণীর মর্মোপলব্ধি করাও সহজ হয়।

---

১ কবীর পৃঃ ৮৪

২ কবীর পৃঃ ৮৫, ৮৮, ৮৯, থেকে উপাদান সংগৃহীত

১

ওরে বান্দা, আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস। আমি ত তোর পাশেই রয়েছি। আমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই, কাবাতে নেই, কৈলাসে নেই। আমি কোনো ক্রিয়া-কর্মতে নেই; যোগ বৈরাগ্যতেও নেই। যদি সন্ধানী হোস তা হ'লে খুব শিগ্‌গিরই পেয়ে যাবি, এক পলকের খোঁজাতেই। কবীর বল্‌ছে, ভাই সাধু শোনো, তিনি যে আছেন সব প্রাণের প্রাণে।

১

মোকোঁ কহাঁ ঢূঢ়ে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
নামৈঁ দেবল নামৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ।
না তো কৌন ক্রিয়া-কর্মমেঁ, নহীঁ যোগ-বৈরাগমেঁ,
খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলিহোঁ, পল-ভরকী তালাসমেঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব স্বাসোঁকী স্বাসমেঁ॥

২

ওরে নিগুণী সন্তের জাত জিজ্ঞেস করিস না। ব্রাহ্মণ সাধু, ক্ষত্রিয় সাধু, বানিয়া জাতিও সাধু। সাধুদের মধ্যে ছত্রিশ জাত রয়েছে। (কাজেই) তোর এই প্রশ্নটা অনুচিত। দেখ্ না নাপিত সাধু, ধোপা সাধু, বারী জাতির লোকও সাধু। আবার দেখ্ সাধুদের মধ্যে রৈদাস (রবিদাস) সন্ত। যে শ্বপচ ঋষির কথা শুনিস সে মেথর। এখন হিন্দু আর তুরুক (মুসলমান) এই দুই ধর্ম হয়েছে কিন্তু এদেরও আলাদা করে চিনবার উপায় নেই। অর্থাৎ সাধুদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। সাধু সাধুই। তার অন্য জাত নেই।

২

সন্তন জাত ন পূছো, নিরগুনিয়াঁ।
সাধ ব্রাহ্মণ সাধ ছত্তরী, সাধৈ জাতি বনিয়াঁ।

দ্রষ্টব্য—পাদটীকায় যে সব টীকা টীপ্পনী দেওয়া হ'ল তা প্রধানতঃ ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর কবীর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সাধনমাঁ ছত্তীস কৌম হৈ, টেঢ়ী তোর পুছনিয়াঁ।
সাধৈ নাউ সাধৈ ধোবী, সাধ জাতি হৈ বরিয়াঁ[১]।
সাধনমাঁ রৈদাস সন্ত হৈঁ স্নুপচ ঋষি[২] সো ভঁগিয়াঁ।
হিন্দু-তুর্ক ছুই দীন বনে হৈঁ, কছু নহীঁ পহচনিয়াঁ।

৩

এই ঘটের মধ্যে বাগ বাগিচা, এরই মধ্যে স্রষ্টা। এই ঘটের মধ্যেই সাত সমুদ্র, এরই মধ্যে নয় লাখ তারা। এই ঘটের মধ্যে আছে পরশমণি আর এরই মধ্যে তার জহুরীও রয়েছে। এই ঘটের মধ্যে হচ্ছে অনাহত শব্দ, এই ঘটেই উঠ্‌ছে ফোয়ারা। কবীর বলছে ভাই সাধু, শোনো, এরই মধ্যে আমার সাঁই (প্রভু) রয়েছেন।

৩

ইস ঘট[৩] অন্তর বাগ বগীচে, ইসীমেঁ সিরজনহারা।
ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর, ইসীমেঁ নৌ লখ তারা।
ইস ঘট অন্তর পারস মোতী, ইসীমেঁ পরখনহারা।

---

১ বরিয়াঁ—বারী জাতি। নিম্ন শ্রেণীর লোক। এরা পাতার ঠোঙা বানায়।

২ স্নুপচ ঋষি—শ্বপচ স্নুদর্শন। কবীর পন্থীদের গ্রন্থে এঁর সম্বন্ধে এই গল্পটি পাওয়া যায়। কলি যুগের প্রারম্ভে যখন কবীরদাস পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন কাশীর স্নুদর্শন তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে মেথর। স্নুদর্শন খুব উঁচুদরের সাধু ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে বল্‌লেন যখন ঘণ্টা আপনা আপনি সাতবার বেজে উঠ্‌বে তখনই পাপ দূর হয়েছে বুঝতে হবে। যজ্ঞ হ'ল। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সাধু সন্ন্যাসীর ভোজন হ'ল কিন্তু তবু ঘণ্টা বাজল না। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—স্নুদর্শন আসে নি যে, কাশীর স্নুদর্শন। নিয়ে এস তাকে। তখনই ভীম গেলেন সাধুকে আনতে। ভীম ছিলেন ভারী অহঙ্কারী। তাই স্নুদর্শন এলেন না। তখন ধর্মরাজ স্বয়ং গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন আর যত্ন করে ভোজন করালেন। অমনি ঘণ্টা সাতবার বেজে উঠল। এর পর শ্রীকৃষ্ণের কথায় সবাই গেলেন প্রয়াগ তীর্থে। আর জলে নিজ নিজ ছায়া দেখলেন। দেখা গেল জলে এক স্নুদর্শনেরই মানুষের মত ছায়া পড়েছে আর সবারই ছায়া কুকুর বেড়াল প্রভৃতি হীন জন্তু জানোয়ারের মত।

৩ ঘট—শরীর।

ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ, ইসীমেঁ উঠত ফুহারা।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, ইসীমেঁ সাঈঁ হমারা॥

৪

ওরে না-গড়া দেবতা, কে তোর সেবা করবে। গড়া দেবতার পূজা করে সবাই, নিত্য করে তার সেবা। কিন্তু যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি অখণ্ডিত (অর্থাৎ তার মূর্তি নেই) তিনিই স্বামী। তাঁর রহস্য জানা যায় না। লোকে বলে নিরঞ্জনের দশ অবতার কিন্তু সেত তোর আপন (আত্মা) নয়। এখানেত সবাই নিজের কর্ম ভোগ করছে কিন্তু মানুষের জীবনের কর্তা (নিরঞ্জন নয়) অন্য আর একজন কেউ। যোগী যতী তপস্বী সন্ন্যাসী সবাই আপনা আপনি লড়াই করছে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোনো, যে প্রেমকে দেখেছে সেই উদ্ধার পেয়ে গেছে।

৪

অনগঢ়িয়া দেৱা,[১] কৌন করৈ তেরী সেৱা।
গঢ়ে দেৱকে[২] সব কোই পূজৈ, নিত হীলাৱৈ সেৱা।
পূরণ ব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামী, তাকো ন জানৈ ভেৱা।
দস ঔতার নিরঞ্জন কহিএ, সো অপনা না হোঈ।
য়হ তো অপনী করনী ভোগৈঁ, কর্তা ঔর হি কোঈ।
জোগী জতী তপী সন্ন্যাসী, আপ আপমেঁ লড়িয়াঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, রাগ লখৈ সো তরিয়াঁ।

৫

সাধু, সেই সৎগুরুকে আমার ভাল লাগে, যিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে নিজে খান আর আমাকেও খাওয়ান। যিনি চোখের পরদা ঘুচিয়ে দেন, ব্রহ্ম দর্শন করান, যাঁর (ব্রহ্মের) দর্শনে সমস্ত লোক লোকান্তর দৃষ্ট হয়। শোনা যায় অনাহত শব্দ। একমাত্র সেই সদ্গুরুই দেখিয়ে দেন সুখ দুঃখের রহস্য। শব্দের (ব্রহ্মের) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন অন্তর্মুখী

---

১ অনগঢ়িয়া দেবা—যে দেবতার মূর্তি গড়া যায় না, যিনি রূপাতীত।

২ গঢ়ে দেৱ=মূর্তি, (মানস মূর্তিও মূর্তি)

বৃত্তিকে। কবীর বলেছে তাঁর কোনো ভয় নেই। তিনি নির্ভয় পদ স্পর্শ করিয়ে দেন।

৫

সাধো, সো সতগুরু মোঁহি ভাবৈ।
সত্ত প্রেমকা ভর ভর প্যালা আপ পিবৈ মোঁহি প্যাবৈ।
পরদা দূর করৈ আঁখিনকা, ব্রহ্ম-দরস দিখলাবৈ।
জিস দরসমেঁ সব লোক দরসৈ, অনহদ সব্দ সুনাবৈ।
একহি সব সুখ-দুখ দিখলাবৈ, সব্দমেঁ সুরত সমাবৈ।
কহৈঁ কবীর তাকো ভয় নাহীঁ, নির্ভয় পদ পরসাবৈ।

৬

ওরে আমার মন, মত্ত হয়ে নাচ রে। রাতদিন বাজে প্রেমের রাগিনী। সবাই শোনে সে শব্দ। তাই শুনে' রাহু কেতু নবগ্রহ নাচে, আনন্দে নাচে জন্মমৃত্যু। গিরি সমুদ্র ধরিত্রী নাচে, হাসি কান্নায় নাচে জগৎ। ওরে তোরা ফোঁটা তিলক কেটে মাচার উপর বসে (ভাবখানা মাচার উপর উঠ্‌লেই যেন জগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেল) ভাবছিস জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাবি। (তা হয় না) আমার মন কিন্তু সহস্র কৌশলে নাচে, যাতে করে সৃষ্টিকর্তা আনন্দ পাচ্ছেন।

৬

নাচু রে মেরে মন মত্ত হোয়।
প্রেমকো রাগ বজায় রৈনদিন শব্দ সুনৈ সব কোই।
রাহু কেতু নবগ্রহ নাচৈ জম জন্ম আনন্দ হোই।
গিরী সমুন্দর ধরতী নাচৈ, লোক নাচৈ হঁস-রোই।
ছাপা-তিলক লগাই বাঁস চঢ়, হো রহা জগসে ন্যারা।
সহস কলা কর মন মেরী নাচৈ, রীঝৈ সিরজনহারা।

৭

মন বিভোর (মত্ত) হয়ে গেলে আর কথা বল্‌বে কেন। যে-লোকটা হীরা পেল, তাকে গাঁঠে বাঁধল, সে বার বার তাকে খুল্‌বে কেন। যখন তুমি হালকা ছিলে তখন দাঁড়িপাল্লার উপর উঠেছিলে। এখন পূর্ণ হয়েছ

তবে আর ওজন কেন। ওরে আজ আমার সুরতিরূপিনী (ভগবদ্‌প্রেম বা স্মৃতিরূপিণী) সাকী মত্ত হ'ল। অপরিমাণ (ওজন না করে) খেয়ে নিল মদ। আজ হংস পেয়েছে মানস-সরোবর। সে আর দীঘি পুকুরে ঘুরে বেড়াবে কেন। ওরে তোর সাহেব আছেন ঘরেই, বাইরের দিকে তাকাচ্ছিস কেন। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, সাহেবকে পাওয়া গেল একটিমাত্র তিলের আড়ালে (অর্থাৎ এতটুকু একটি তিল তাই তাঁকে আড়াল করে রাখে)।

৭

মন মস্ত হুআ তব কেঁ্যা বোলে।
হীরা পায়ো গাঁঠ গঠিয়ায়ো, বার বার বাকো কেঁ্যা খোলে।
হলকী থী তব চঢ়ী তরাজূ, পূরী ভঈ তব কেঁ্যা তোলে।
সুরত-কলারী ভঈ মতবারী, মদবা পী গঈ বিন তোলে।
হংসা পায়ে মানসরোবর, তাল তলৈয়া কেঁ্যা ডোলে।
তেরা সাহব হৈ ঘরমাঁহী, বাহর নৈনা কেঁ্যা খোলে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সাহব মিল গয়ে তিল ওলে॥

৮

(১) সূর্যের প্রকাশ যেখানে সেখানে রাত কোথায় পাবে। আর যেখানে রাত সেখানে নেই সূর্যের দীপ্তি। জ্ঞানের প্রকাশ যেখানে সেখানে অজ্ঞান কোথায় পাবে। আর যেখানে অজ্ঞান থাকে সেখানে নষ্ট হয় জ্ঞান। কাম যেখানে বলবান সেখানে প্রেম কোথায় পাবে আর যেখানে প্রেম থাকে সেখানে নেই কাম। কবীর বলছে এই সত্য বিচার। বুঝে সুঝে বিচার করে দেখ।

(২) তলোয়ার নিয়ে রণে প্রবেশ করে' যতদিন দেহ থাকে ততদিন যুদ্ধ কর, ভাই। শত্রুদের মাথা কাট। যেখানে সেখানে দাবিয়ে দাও তাদের। মাথা নত করে আসবে দরবারে।

(৩) বীর যে সে যুদ্ধ দেখে পালায় না। যুদ্ধ দেখে যে পালায় সে বীর নয়। কাম, ক্রোধ, মদ আর লোভের সঙ্গে লড়তে হবে, দেহ-ক্ষেত্রে সুরু হয়েছে প্রচণ্ড লড়াই। শীল সত্য আর সন্তোষ সাথী হয়েছে, নামরূপ তলোয়ার ঝন ঝন করে' উঠ্‌ল। কবীর বল্‌ছে কোনো বীর যদি যুদ্ধ করে তবে সেখান থেকে চট্ করে কাপুরুষের ভিড় দূর হয়ে যায়।

(৪) সাধুদের খেলা ত বিকট প্রয়াস, সতী এবং বীরের চেষ্টারও বাড়া। বীরের ঘোর যুদ্ধ সে কেবল দুচার পলকের জন্য, সতীর যুদ্ধে লাগে এক পলক। ভাইরে, সাধুর যুদ্ধ কিন্তু এমনি যে যতদিন দেহ থাকে ততদিন তাকে রাতদিন লড়াই করতে হয়।

৮

(১) সূর-পরকাস তহঁ রৈন কহঁ পাইয়ে
রৈন-পরকাস নহিঁ সূর ভাসৈ।
জ্ঞান-পরকাস অজ্ঞান কহঁ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান তহঁ জ্ঞান নাসৈ।
কাম বলবান তহঁ প্রেম কহঁ পাইয়ে
প্রেম জহাঁ হোয় তহঁ কাম নাহী
কহে কবীর য়হ সত্ত বিচার হৈ
সমঝ বিচার কর দেখ মাঁহী।

(২) পকড় সমসের সংগ্রামমেঁ পৈসিয়ে
দেহ-পরজন্ত কর জুদ্ধ ভাই।
কাট সির বৈরিয়াঁ দাব জহঁকা তহাঁ
আয় দরবারমেঁ সীস নবাঈ।

(৩) সূর সংগ্রামকো দেখ ভাগৈ নহী,
দেখ ভাগৈ সোঈ সূর নহী।
কাম ঔর ক্রোধ মদ-লোভসে জূঝনা,
মচা ঘমসান তন-খেত মাঁহী।
সীল ঔর সাঁচ সন্তোষ সাথী ভয়ে,
নাম সমসের তহাঁ খূব বাজে।
কহৈ কবীর কোই জূঝিহৈ সূরমা।
কায়রাঁ ভীড় তহাঁ তুর্ত ভাজে॥

(৪) সাধকো খেল তো বিকট বেঁড়া মতী
সতী ঔর সূরকী চাল আগে,

স্থূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা
সতী ঘমসান পল এক লাগৈ।
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জূঝনা
দেহ পরজন্তকা কাম ভাঈ ॥

৯

ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। যেদিন মিলন হয় স্বামীর সঙ্গে সেদিন অন্ত থাকে না স্থরতের। চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দি না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ দেখি। যা বলি সে-ই নাম, যা শুনি সেই স্মরণ, যা কিছু করি সেই পূজা। বাড়ী আর পড়ো-বাড়ী সমান দেখি; দ্বৈতভাব দি মিটিয়ে। যেখানে সেখানে যাই তাই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শোই তখন সেইটেই হয় দণ্ডবৎ। অন্য দেবতার আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হয়ে আছে আমার মন, খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠ্‌তে বসতে কখনো (তাঁকে) ভুলে না। এমনি হয়েছে প্রগাঢ় মিলন। কবীর বল্‌ছে এমনিধারা আমার উন্মনিভাব অর্থাৎ সমাধির অবস্থা। তাই আমি প্রকাশ করে গান করলাম। সুখদুঃখের পরে এক পরম সুখ, তারই মধ্যে প্রবেশ করে থাকি।

৯

সন্তো, সহজ সমাধি ভলী।
সাঁঈ তে মিলন ভয়ো জা দিনতেঁ, স্থরত ন অন্ত চলী ॥
আঁখ ন মূঁদূঁ কান ন রূঁধূঁ, কায়া কষ্ট ন ধারূঁ।
খুলে নৈন মৈঁ হঁস হঁস দেখূঁ, সুন্দর রূপ নিহারূঁ ॥
কহূঁ সো নাম সুনূঁ সো সুমিরন, জো কছু করূঁ সো পূজা।
গিরহ-উদ্যান এক সম দেখূঁ, ভাব মিটাউঁ দূজা ॥
জহঁ জহঁ জাউঁ সোঈ পরিকরমা, জো কছু করূঁ সো সেবা।
জব সোউঁ তব করূঁ দণ্ডবত, পূজূঁ ঔর ন দেবা ॥
শব্দ নিরন্তর মনুআ রাতা, মলিন বচনকা ত্যাগী।
উঠত-বৈঠত কবহুঁ ন বিসরৈ, ঐসী তারী লাগী।

কহৈঁ কবীর য়হ উন্মুনি[১] রহনী, সো পরগট কর গাঈ।
সুখ-দুখকে ইক পরে পরম সুখ, তেহিমেঁ রহা সমাঈ।

১০

ওগো সাধু, সহজভাবে কায়া শোধন কর। যেমন বটের বীজ আর তা'তেই আছে পাতা, ফুল, ফল ছায়া (অর্থাৎ গাছের সত্তা) তেমনি কায়ার মধ্যে বিরাজ করে বীজ (আত্মা) আর বীজের মধ্যে কায়া। আগুন, বাতাস, জল, পৃথিবী, আকাশ তাকে ছাড়া (আত্মাকে ছাড়া) মিলিতই হয় না। কাজি, পণ্ডিত, তোমরা নির্ণয় কর আত্মার মধ্যে কি নেই। জলভরা কলসী জলে ডুবান আছে, বাইরে ভিতরে একই। ওঁর নাম লওয়া উচিত নয়। কেননা, তা'তে এই ভ্রম হ'তে পারে যে তিনি যেন (আমার থেকে) ভিন্ন। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোনো, সত্য শব্দই আমার নিজের সার। আত্মার মধ্যে আত্মাই কথা বলছে। আত্মাই সৃষ্টিকর্তা।

১০

সাধো, সহজৈ কায়া সোধো।
জৈসে বটকা বীজ তাহিমেঁ পত্র-ফুল-ফল-ছায়া।
কায়া-মদ্ধে বীজ বিরাজে, বীজা-মদ্ধে কায়া।
অগ্নি-পবন-পানী-পিরথী-নভ, তা-বিন মিলৈ নাহীঁ।
কাজী-পণ্ডিত করো নিরনয় কো ন আপা মাহীঁ।
জল-ভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া, বাহর-ভিতর সোঈ।
উনকো নাম কহনকো নাহীঁ দূজা ধোখা হোঈ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সত্য-শব্দ নিজ সারা।
আপা-মদ্ধে আপৈ বোলৈ, আপৈ সিরজনহারা॥

১১

ওগো সখিরা, আমার প্রিয়কে পাবার জন্য আমারও অত্যন্ত অভিলাষ হয়েছে। যৌবন এসেছে, বিরহ দিচ্ছে সন্তাপ, এখন জ্ঞান-গলি দিয়ে সগর্বে চলছি। জ্ঞান-গলিতে খবর পাওয়া গেছে; আমি পেয়েছি আমার প্রিয়ের

---

[১] উন্মুনি—অর্থাৎ উন্মুনী বা মনোন্মনী। এর অর্থ সমাধি। এই অবস্থায় বায়ু ভিতরে সঞ্চারিত হ'তে থাকে, মন স্থির হয়ে যায়। এই মন স্থির হয়ে যাওয়ার আবস্থাই মনোন্মনী অবস্থা।

চিঠি। সেই চিঠিতে আছে অগম্য সন্দেশ। এখন আমি আর মরতে ডরাই না। কবীর বলছে, আদরের ভাইটি আমার, শোন, অবিনশ্বর বর পেয়েছি।

১১

সখিয়ো, হমহুঁ ভঈ বলমাসী।
আয়ো জোবন ৱিরহ সতায়ো, অব মৈঁ জ্ঞানগলী অঠিলাতী।
জ্ঞান-গলীমেঁ খবর মিল গয়ে, হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী।
ৱা পাতীমেঁ অগম সঁদেসা, অব হম মরনেকো ন ডরাতী।
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে, বর পায়ে অবিলাসী।

১২

স্বামীর বিরহে হৃদয় ব্যথাতুর। দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও নেই ঘুম। দুঃখ কা'কে বল্‌ব। অর্দ্ধেক রাত গেল, রাতের শেষ প্রহরও গেল কেটে। কিন্তু স্বামী এলেন না। তিনি এই আস্‌ছেন এই আস্‌ছেন বলে প্রতীক্ষা করে' করে' শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। কবীর বলছে আদরের ভাইটি আমার শোন, স্বামীকে পেলেই তবে সুখ হয়।

১২

সাঈঁ বিন দরদ করেজে হোয়।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিঁদিয়া, কাসে কহূঁ দুখ হোয়।
আধী রতিয়াঁ পিছলে পহরৱা, সাঈঁ বিনা তরস তরস রহী সোয়।
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে, সাঈঁ মিলে সুখ হোয়॥

১৩

ভাই, স্বামীর সঙ্গে মিলন হওয়া কঠিন। চাতক যেমন বারিবিন্দুর পিয়াসী তেমনি (পিয়াসী হয়ে) প্রিয় প্রিয় বলে ডাকতে হবে। রাতদিন পিপাসায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে কিন্তু তবু অন্নজল তার ভাল লাগে না। শব্দ ভালবেসে মৃগ যেমন শব্দ শুন্‌তে যায়, শব্দ শুনে আর প্রাণ দেয়, একটুও ভয় করে না, সতী যেমন চিতায় আরোহণ করে, সে ভালবাসে স্বামীর অনুগমন, আগুন দেখে সে ভয় পায় না, সব সময়েই হাসিমুখে থাকে, তেমনি নিজের শরীরের আশা ছাড়, নির্ভয় হ'য়ে (স্বামীর) গুণগান কর। কবীর বলছে সাধুরে ভাই, শোন, নৈলে ত জন্মই ব্যর্থ হয়ে গেল।

১৩

সাঁঈসে লগন কঠিন হৈ ভাই।
জৈসে পপীহা প্যাসা বূঁদকা, পিয়া পিয়া রট লাঈ।
প্যাসে প্রাণ তড়ফৈ দিন-রাতী, ঔর নীর না ভাই।
জৈসে মিরগা শব্দ-সনেহী, শব্দ সুননকো জাঈ।
শব্দ সুনৈ ঔর প্রাণদান দে, তনিকো নাহিঁ ডরাঈ।
জৈসে সতী চঢ়ী সত-উপর, পিয়াকী রাহ মন ভাঈ।
পাৱক দেখ ডরে ৱহ নাহী, হঁসত বৈঠে সদা ভাঈ।
ছোড়ো তন অপনেকী আসা, নির্ভয় হৈৱ গুণ গাঈ।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, নাহিঁ তো জনম নসাঈ॥

১৪

যোগী, মন না রঙ্গিয়ে রঙ্গালি কাপড়। আসন করে বসলি মন্দিরে, ব্রহ্মকে ছেড়ে পূজো করতে লাগলি পাথর। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি হিজড়া। যোগীরে, মাথা মুড়ালি রঙ্গালি কাপড় আর গীতা পড়ে পড়ে হয়ে গেলি মিথ্যাবাদী। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোন্, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবে যমদরজায়।

১৪

মন না রঁগায়ে রঁগায়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম-ছাড়ি পূজন লাগে পথরা॥
কনরা ফড়ায়[১] জোগী জটৱা বঢ়ৌলে,
দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী হোই গৈলে বকরা।
জঙ্গল জায় জোগী ধুনিয়া রমৌলে
কাম জরায় জোগী হোয় গৈলে হিজরা॥

[১] কাণফাটা যোগীরা কাণে ছিদ্র করে' কুণ্ডল পরে।

মথরা মুঁড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৌলে,
গীতা বাঁচকে হোয় গৈলে লবরা
কহহিঁ কবীর স্থনো ভাঈ সাধো।
জম দররজরা বাঁধল জৈবে পকড়া ॥

১৫

জানিনা তোর প্রভু কি রকম। মোল্লা হয়ে যে আজান দিস্, তোর প্রভু কি কালা। ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তা'ও প্রভু শুন্‌তে পান। মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস লম্বা জটা। ওরে তোর ভিতরে যে রয়েছে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে করে প্রভুকে পাওয়া যায় না।

১৫

না জানৈ সাহব কৈসা হৈ!
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেরৈ,
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেরর বাজে,
সো ভি সাহব স্থনতা হৈ।
মালা ফেরী তিলক লগায়া,
লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ।
অন্তর তেরে কুফর-কটারী,
যোঁ নহিঁ সাহব মিলতা হৈ ॥

১৬

মুরলীর ধ্বনি শুনে আমি আর থাকতে পারছিনে। বসন্ত নেই তবু একটি ফুল ফুটল। ভ্রমর সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হৃদয়ে উঠ্‌ছে হিল্লোল। নাবল বৃষ্টি, বিকসিত হ'ল কমল আর চেয়ে রইল প্রভুর দিকে। সমাধি হ'ল, মন নিবিষ্ট হয়ে গেল তাতে। অদৃশ্য (বিজয়) ধ্বজা উড়ল। কবীর বলছে আজ আমার প্রাণ জ্যান্ত থেকেই যাচ্ছে মরে।

১৬

হমসোঁ রহা ন জায় মুরলিয়া কৈ ধুন সুনকে।
বিনা বসন্ত ফুল[1] ইক ফুলৈ ভঁবর[2] সদা বোলায়।
গগন গরজৈ বিজুলী চমকৈ, উঠতী হিয়ে হিলোর।
বিগসত কঁবল মেঘ[3] বরসানে চিতবত প্রভুকী ওর।
তারী লাগী তহঁা মন পহুঁচা, গৈব ধুজা ফহরায়।
কহৈঁ কবীর আজ প্রাণ হমারা, জীবত হী মর জায়॥

১৭

যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার? তীর্থ-মূর্তি সব রামের মধ্যেই রয়েছে। বাইরে কে খুজে মরে। পূব দিকে হরির বাস আর পশ্চিমে নাকি আল্লার মোকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবল মাত্র অন্তরেই খোঁজ, এখানে আছেন করীম, এখানেই আছেন রাম। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা রামের ছেলে। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

১৭

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মুল্লুক কেহি কেরা।
তীরথ-মূরত রাম-নিবাসী বাহর করে কো হেরা।
পূরব দিসা হরিকৌ বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজ দিলহিমেঁ খোজ ইহৈঁ করীমা-রামা।
জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোঁগড়া অলহ-রামকা সো গুরু পীর হমারা।

১৮

স্বামীর কাছে (শ্বশুর বাড়ী) যাবার দিন এল। উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল মন। যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই তেমনি ধারা নির্জন বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার ডুলি। ওরে কাহার (বেহারা), তোদের পায়ে পড়ি,

---

[1] ফুল— সহস্রদল পদ্ম, সহস্রার চক্র।

[2] ভঁবর—ভ্রমর, মন।

[3] মেঘ—পূর্ণ সমাধি অবস্থায় 'ধর্মমেঘের' ধারাবর্ষণ হয়।

একটু দেখা করে নি। দেখা করে নি আমার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। কবীরদাস গাইছে, ওরে সাধু, বিচার করে দেখ স্বামীটি নির্গুণ। কাজেই, ভালমন্দ (নরম গরম) সওদা যা করবার এই বেলা করে নে। সামনে কিন্তু হাট বাজার কিছুই নেই।

১৮

আয়ৌ দিন গৌনেকৈ[১] হো, মন হোত হুলাস।
ডোলিয়া উঠারে বীজা বনরাঁ হো, জহঁ কোঈ ন হমার॥
পইয়াঁ তেরী লাগৌ কহররা হো, ডোলি ধর ছিন বার।
মিল লেবেঁ সখিয়া সহেলর হো, মিলোঁ কুল পরিবার॥
দাস কবীর গাবৈঁ নিরগুণ হো, সাধো করি লে বিচার।
নরম-গরম সৌদা করি লে হো, আগে হাট না বাজার॥

১৯

বেদ বলে সগুণ গিয়ে শেষ হয় নির্গুণে। ওগো সৌভাগ্যবতী, সগুণ নির্গুণ ত্যাগ কর। নিজ ধামের মধ্যে দেখ সব কিছুকে। ওখানে সুখ দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না, দর্শন মিলে অষ্ট প্রহর। সেই ধামে জ্যোতিরই ওড়না, জ্যোতিরই বিছানা আর জ্যোতিরই রয়েছে বালিশ। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন সদ্‌গুরু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপ।

১৯

বেদ কহে[২] সরগুণকে আগে নিরগুণকা বিসরাম।
সরগুন-নিরগুণ তজহু সোহাগিন, দেখ সবহি নিজ ধাম।
সুখ-দুখ রহাঁ কছু নহিঁ ব্যাপৈ, দরসন আঠোঁ জাম।
নূরৈ ওঢ়ন নূরৈ ডাসন, নূরৈকা সিরহান।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সতগুরু নূর তমাম॥

---

১ গৌনা—পশ্চিমাঞ্চলে মেয়ে বিয়ের পর বাপের বাড়ীতে থাকে। দ্বিতীয় বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী যায়। একে বলে গৌনা।

২ বেদের মতে সগুণের পরে নির্গুণ। সেখানেই শেষ। কিন্তু কবীরদাসের মতে নির্গুণেরও পরে গিয়ে জীব পায় সত্যপুরুষকে আর সেখানেই রয়েছে তার আপন ধাম।

২০

ধার্মিক নই আমি, অধার্মিকও নই। আমি যতী নই, কামুকও নই। আমি কিছু বলিও না, শুনিও না। আমি সেবকও নই, স্বামীও নই। আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই; বিরক্তও নই, অনুরক্তও নই। কারুর থেকে আলাদা নই, কারুর সঙ্গীও নই। নরকে আমি যাচ্ছিনে, স্বর্গের পথিকও আমি নই। আমার সকল কর্মই করা হয়েছে কিন্তু কর্ম থেকে আমি আলাদা (কর্মে লিপ্ত নই)। এই মতটি খুব অল্প লোকেই বোঝে। কিন্তু যে বোঝে সে অটল হয়ে বসে। কবীর বলছে এ রকম লোক কাউকে প্রতিষ্ঠিতও করে না, উৎখাতও করে না (অর্থাৎ কারুর ভালমন্দের মধ্যে সে থাকে না)।

২০

না মৈঁ ধর্মী নাহীঁ অধর্মী, না মৈঁ জতী না কামী হো।
না মৈঁ কহতা না মৈঁ সুনতা, না মৈঁ সেৱক-স্বামী হো।
না মৈঁ বন্ধা না মৈঁ মুক্তা না মৈঁ বিরত ন রংগী হো।
না কাহূসে ন্যারা হূআ না কাহূকে সঙ্গী হো।
না হম নরক-লোককো জাতে না হম স্বর্গ সিধারে হো।
সব হী কর্ম হমারা কীয়া, হম কর্মনতেঁ ন্যারে হো।
যা মতকো কোই বিরলৈ বূঝে, সো অটর হো বৈঠে হো।
মত কবীর কাহূকো থাপৈ, মত কাহূকো মেটে হো॥

২১

ঝন্ ঝন্ করে' বাজছে। হাত পা ছাড়াই নাচছে। হাত ছাড়াই বাজায়, কান ছাড়াই শোনে, শ্রবণ আর শ্রোতা দুই লোপ পেয়েছে। পট্টবস্ত্র নেই, গন্ধ দ্রব্য নেই, সভা নেই (যেখানে লোকে নাচ দেখ্‌বে) আর অবসরও (যখন নাচ দেখান হবে) নেই। এইটে যে বুঝে সে-ই মুনি।

২১

ঝী ঝী জন্তর বাজৈ।
কর চরণ বিহূনা নাচৈ।
কর বিনু বাজৈ সুনৈ শ্রৱণ বিনু
শ্রৱণ শ্রোতা লোঈ।

পাট ন সুবাস সভা বিনু অরসর
বূঝৌ মুনি-জন সোঈ ॥

২২

আকাশে মেঘ[১] ঘনিয়েছে, ও সাধু, আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে। পূব দিক[২] থেকে বাদল করেছে। রিম ঝিম ঝরছে জল। আপন আপন ক্ষেতের আল বাঁধ[৩] ; এই জলটা যে বয়ে যাচ্ছে। সুরতি আর নিরতির বলদ হালে জুড়ে নির্বাণকামী চাষ করে। যে ধান কেটে কুটে[৪] তবে ঘরে আসে সেই ত কৌশলী চাষা। সামনে (সুরতি নিরতির) দুটো থালায় পরিবেশন করা হয়েছে আর জ্ঞানী ও মুনি দুইজনে খাচ্ছে।

২২

গগনঘটা ঘহরানী সাধো, গগনঘটা ঘহরানী।
পূরব দিসসে উঠী হৈ বদরিয়া, রিমঝিম বরসত পানী।
আপন আপন মেঁড় সম্‌হারো, বহ্যৌ জাত য়হ পানী।
সুরত-নিরতকা বেল নহায়ন, করৈ খেত নির্বানী।
ধান কাট মার ঘর আবৈ, সোঈ কুসল কিসানী।
দোনো থার বরাবর পরসৈঁ, জেবৈঁ মুনি ঔর জ্ঞানী।

২৩

বাপের বাড়ী থেকে আমার মন উঠে গেল। যার বাপের বাড়ীতে সুখ নেই কি হবে তার ঘরদোর দিয়ে। এখানে আমার একটুও মন লাগছে না। শরীর ও মন বড়ই উচাটন হয়েছে। এই আমার বাপের বাড়ীর শহরে লাখ দরজা আর মাঝখানে সমুদ্রের ঘাট। সখিরে, আমি কি করে পরপারে যাব, বিস্তার যে অপার। আমার বাপের বাড়ীতে বানিয়েছিল আজব তানপুরা ; তার তারের ঝঙ্কারেই মন মেতে উঠ্‌ত। এখন সে তানপুরার খুঁটি গেছে ভেঙ্গে, তার গেছে আলগা হয়ে, অথচ, তার জন্য কেউ কিছু জিজ্ঞেসও

১ মেঘ—সমাধি-অবস্থার ধর্মমেঘ।
২ পূর্বদিক—পূর্ব জন্মের পুণ্য।
৩ আল বাঁধা—নিয়ম সংযম পালন করা।
৪ ধান কাটা—পুরুষার্থ লাভ করা।

করেনা। আমার মা-বাবাকে হাসিমুখেই শুধালাম কাল ভোরে কি শ্বশুর বাড়ী যাব? (ওঁরা কিছুই বল্‌লেন না) এখন ওঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। ওঁরই হাতে আমার লজ্জা সরম। স্নানটান করে কনে হয়ে বসে আছি প্রিয়ের পথ চেয়ে। সখিরে, একটু ঘোমটা খুলে দেখতে দে আমায়, আজ আমার মিলনের রাত যে। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশাতেই আমার যা কিছু সব। ওরে বান্দা (ভৃত্য), শোন্, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা (শ্বশুর বাড়ী যাবার কথা) মনে করিয়ে দিবি। তা'ছাড়া আজ ত বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না।

২৩

নৈহরসে জিয়রা ফাট রে।
নৈহর নগরী জিসকে বিগড়ী, উসকা ক্যা ঘর-বাট রে।
তনিক জিয়ররা মোর ন লাগৈ, তনমন বহুত উচাট রে।
যা নগরীমেঁ লখ দররাজা, বীচ সমুন্দর ঘাট রে।
কৈসেকৈ পার উতরিহৈঁ সজনী, অগম পন্থকা পাট রে।
অজব তরহকা বনা তম্বুরা, তার লগৈ মন মাত রে।
খুঁটী টুটী তার বিলগানা, কোউ ন পুছত বাত রে।
হঁস হঁস পূছৈ মাতুপিতাসোঁ, ভোরেঁ সাস্থর জাব রে।
জো চাহৈ সো রো হী করিহৈঁ, পত রাহীকে হাথ রে।
ন্‌হায়-ধোয় দুল্‌হিন হোয় বৈঠী, জোহৈ পিয়কী বাট রে।
তনিক ঘুংঘটরা দিখার সখীরী, আজ সোহাগ কী রাত রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, পিয়া-মিলনকী আস রে।
ভোর হোত বন্দে য়াদ করোগে, নীঁদ ন আরে খাট রে।

২৪

জীবের মহলে শিব (পরমাত্মা) অতিথি। ওরে উন্মাদ কি করছিস তুই। যে দেবতাকে পাওয়া গেছে তাঁরই সেবা করে' নে। রাত যে চলে আসছে। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। প্রেম ও বৈরাগ্য ছাড়া পরম সুখ সাগরের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে শব্দ কানে শুনেছিলে তা প্রভুর কাছ থেকেই এসেছে জেনে রেখো। এতে তোমার পরিপূর্ণ

সৌভাগ্যই প্রকাশ পেয়েছে। কবীর বলছে, শোন তোমরা আমার ভাগ্যের কথা। আমি অবিচলিত স্বামী-সোহাগ পেয়েছি।

২৪

জীৱ মহলমেঁ সির পহুনৱাঁ, কহঁা করত উনমাদ রে।
পহুঁছা দেৱা করিলৈ সেৱা, রৈন চলী আৱত রে।
জুগন জুগন করৈ পতীছন, সাহবকা দিল লাগ রে।
সূঝত নাহিঁ পরম-সুখ-সাগর, বিনা প্রেম বৈরাগ রে।
সরৱন সুর বুঝি সাহেবসে, পূরণ প্রগট ভাগ রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাগ হমারা, পায়া অচল সোহাগ রে।

২৫

সংস্কৃত ভাষা পড়ে নিয়ে নিজেকে বলছ জ্ঞানী লোক। ও সজনি, তুমি যে আশাতৃষ্ণার স্রোতে যাচ্ছ ভেসে, সহ্য করছ কামের তাপ। মাথায় নিয়েছ মেনে চলার ও অন্যকে দিয়ে মানিয়ে নেবার কলসী। মিছি মিছি শুধু বোঝা-ই বয়ে মরছ। দাও ভেঙ্গে ঐ কলসী, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হও—কবীর সাহেব বলছেন।

২৫

সংসকিরত ভাষা পঢ়ি লীন্‌হা, জ্ঞানী লোক কহো রী।
আসা-তৃস্নামেঁ বহি গয়ো সজনী, কামকে তাপ সহো রী।
মান মনীকী মটুকী সিরপর, নাহক বোঝ মরো রী।
মটুকী পটক মিলো পীতমসে, সাহেব কবীর কহো রী।

২৬

সুরতিরূপী বিরহিণীর চরখা চলছে। কায়ানগরী অতি সুন্দর করে তৈরি হয়েছে, তাতে করা হয়েছে চেতনার মহল। গগনে অর্থাৎ সহস্রারে চলছে সুরতিরূপী বধূ ও বরের অগ্নিপ্রদক্ষিণ আর তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে জ্ঞান-রত্নের পিঁড়ি। বিরহিণী কাটছে মিহি-সুতো, পরেছে প্রেম-ভক্তির হলুদে কাপড়। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোন, (ঐ মিহি সুতো দিয়ে) দিন আর রাতের মালা (বরমাল্য) গেঁথে ফেল। প্রিয় আমার এখানেই পদার্পণ করবেন, তাঁকে ভেট দেব নয়ন জলের।

২৬

চরখা চলৈ সুরত বিরহিনকা।
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর, মহল বনা চেতনকা।
সুরত ভঁাবরী[১] হোত গগনমেঁ[২] পীঢ়া জ্ঞান-রতনকা।
মিহীন সূত বিরহিন কাতৈঁ, মঁাঝা[৩] প্রেম-ভগতিকা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, মালা গূঁথো দিন রৈনকা।
পিয়া মোর ঐহৈঁ পগা রখিহৈঁ, আঁসু ভেঁট দেহৌঁ নৈনকা।

২৭

ওরে অবধূত, আমার দেশে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। রাজা ভিখারী বাদশা ফকির সবাইকে ডেকে বল্ব একথা। যদি পরম-পদ চাও তাহ'লে আমার দেশে গিয়ে বাস কর। যদি তুমি সূক্ষ্ম হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়ে এসে থাক তাহলে মানসিক কল্পনার বোঝা ঝেড়ে ফেলে দাও। ভাইরে এমনভাবে চলো যাতে সহজেই পার হয়ে যেতে পার সংসার। আমার দেশে ধরণী আকাশ গগন কিছুই নেই; নেই চন্দ্র, নেই তারা। শুধু আমার প্রভুর দরবারে প্রকাশ পাচ্ছে সত্য ও ধর্মের জ্যোতি। কবীর বলছে প্রিয় বন্ধুটি আমার শোন, সত্য ধর্মই একমাত্র সার বস্তু।

২৭

অবধূ বেগম দেস হমারা।[৪]
রাজা-রংক-ফকীর-বাদসা, সবসে কহৌঁ পুকারা।
জো তুম চাহ পরম-পদকো, বসিহো দেস হমারা॥
জো তুম আয়ে ঝীনে হোকে, তজো মনকী ভারা।
ঐসী রহন রহো রে প্যারে, সহজৈ উতর জাবো পারা।
ধরণ-আকাস-গগন কছু নহীঁ নহীঁ চন্দ্র নহীঁ তারা।

---

১ ভঁাবরী—বিয়ের সময় বরকনে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে তাকে বলে ভঁাবর, সপ্তপ্রদক্ষিণ।

২ গগন—সহস্রার চক্র।

৩ মঁাঝা—পশ্চিমে গায়ে হলুদের পর বরকনে যে হলদে কাপড় পরে তাকে বলে মাঞ্ঝা

৪ এই ছত্রের অন্য অর্থ আমার দেশ বেগমের (রাণীর) দেশ। তাই এর জন্য রাজা বাদশা ব্যাকুল।

সত্ত-ধর্মকী হৈঁ মহতাবেঁ, সাহেবকে দরবারা।
কহৈঁ কবীর স্থনো হো প্যারে, সত্ত-ধর্ম হৈ সারা॥

২৮

স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু আমি স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারলাম না, জানলাম না সেই সঙ্গের কি স্বাদ। স্বপ্নের মত কেটে গেল যৌবন। আমার সখী সঙ্গিনীরা মাঙ্গলিক গান করে, আমার মাথায় দেয় সুখদুঃখের হলুদ। আমার বিয়ে ত হয়ে গেল; কিন্তু বরকে ছাড়াই আমি চলছি। জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা আমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কবীর বলছে, আমি দ্বিরাগমনে যাব, প্রিয়তমকে নিয়ে তুরী বাজিয়ে চলে যাব।

২৮

সাঁঈকে সঙ্গ সাস্থর আঈ।
সঙ্গ না রহী স্বাদ না জান্যৌ, রয়ো জোবন স্থপনেকী নাঈ।
সখী-সহেলী মঙ্গল গাবেঁ, সুখদুখ মাথে হরদী চঢ়াঈ।
ভয়ৌ ৱিৱাহ চলী বিন দূলহ, বাট জাত সমধী সমঝাঈ।
কহৈঁ কবীর হম গৌণে জৈবে, তরব কন্ত লৈ তূর বজাঈ।

২৯

ওরে আমার মন, ওরে আমার প্রিয় বন্ধু, বিবেচনা করে' দেখ প্রণয়ী হলে কি শোয়া চলে। পেয়ে যদি থাকিস, বন্ধু, তাহলে দিয়ে দে নিজেকে; পেয়েছিস ত তার আবার হারানো কি। যখন চোখে জড়িয়ে আসে ঘুম তখন আর কিসের বিছানা কিসের বালিশ। কবীর বলছে প্রেমের পথ এমনি। মাথাই যদি দিতে হয় তবে কান্না কেন।

২৯

সমুঝ দেখ মন মীত পিয়রৱা,
আসিক হো কর সোনা ক্যা রে।
পায়া হো তো দে লে প্যারে,
পায় পায় ফির খোনা ক্যা রে।

জব আঁখিয়নমেঁ নঁীদ ঘনেরী,
তকিয়া ঔর বিছৌনা ক্যা রে।
কহৈঁ কবীর প্রেমকা মারগ,
সির দেনা তো রোঁনা ক্যা রে।

৩০

নিকটে এল ফাল্গুন মাস। কে মিলন ঘটাবে প্রিয়তমের সঙ্গে। প্রিয়তমের রূপ কি করে বর্ণনা করব, আমি যে রূপের মধ্যেই রয়েছি। রঙ্গে রঙ্গে আমি রঞ্জিত হয়েছি। সকল সৌন্দর্য পান করে বুঁদ হয়ে আছি। দেহমনের কথা গেছি ভুলে। এইটেকে সাধারণ ফাগ খেলা (হোলিখেলা) মনে করো না। এ এক অনির্বচনীয় কাহিনী। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোন, এই তত্ত্বটি অল্পলোকেই জানে।

৩০

রিতু ফাগুন নিয়রানী, কোঈ পিয়াসে মিলারে।
পিয়াকো রূপ কহাঁ লগ বরনূ, রূপহি মাঁহি সমানী।
জো রংগরংগে সকল ছবি ছাকে, তন-মন সভী ভুলানী।
যোঁ মত জানে যহি রে ফাগ হৈ, যহ কুছ অকহ কহানী।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, য়হ গত বিরলে জানী॥

৩১

কেউ আমার প্রেমের দোলায় দোল দাও। দুই ভুজের স্তম্ভের উপর প্রেমের বেগে আজ দেহমনকে ঝুলাও। আমার নয়নে বাদলের ধারা ঝরুক, হৃদয় ঢেকে যাক কালমেঘে। আমার কানের কাছে এসে এসে প্রিয়ের ব্যাকুলতার কথা শুনিয়ে দাও। কবীর বলছে, ভাইরে সাধু, শোন, প্রিয়তমের ধ্যানে চিত্ত নিয়োজিত কর।

৩১

কোঈ প্রেমকী পেঁগ ঝুলাবৈ।
ভুজকে খম্ভ ঔর প্রেমকে রসসে,
তন-মন আজু ঝুলাব রে।

নৈনন বাদরকী ঝর লাও,
শ্যাম ঘটা উর ছায় রে।
আরত আরত শ্রুতকী রাহপর,
ফিকর পিয়াকো সুনায় রে।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
পিয়াকো ধ্যান চিত্ত লায় রে।

৩২

ওগো মা, আমি ত প্রেমে পড়েছি। এখন কাপড় বুনবে কে! মাগো, আমি রাম রসায়ন পান করে' মত্ত হয়ে গেছি। এখন কাপড় বুনবে কে! তোর বিশ্বাস আমি কুঁচি[1] দিয়ে সুতোর জট ছাড়াবার কাজটা শেষ করেছি কিন্তু আমি যে জট ছাড়াবার কুঁচিটাই বেচে খেয়েছি। মাগো কে কাপড় বুনবে! এই প্রেমে এমন একটা রস জমে উঠেছে যে আমি সুতোর জট ছাড়ানোর উপরই এই রস সমস্তটাই ছড়িয়ে দিয়েছি। মাগো কাপড় বুনবে কে! (এই রসে মত্ত হয়েছি বলে আমি দেখ্‌ছি) তানা নাচছে, পোড়েন নাচছে, পুরোণো কুঁচিটা নাচছে। মাগো কাপড় বুনবে কে। মাগো, (আমি দেখছি) বুনবার জায়গায় বসে কবীর নাচছে, ইঁদুরে তানা কেটে দিয়েছে, কে কাপড় বুনবে।

৩২

কো বীনৈ প্রেম লাগো রী মাঈ, কো বীনৈ।
রাম-রসাইণ মাতে রী মাঈ কো বীনৈ।
পাঈ পাঈ তূঁ পতিহাঈ, পাঈকী তুরিয়াঁ বেঁচি খাঈ,
রী মাঈ কো বীনৈ।
ঐসৈঁ পাঈ পর বিথুরাঈ, ত্যূঁ রস আনি বনায়ৌ
রী মাঈ কো বীনৈ।
নাচৈ তানা নাচৈ বানা, নাচৈ কূঁচ পুরানাঁ
রী মাঈ কো বীনৈ।
করগহি বৈঠি কবীরা নাচৈ চূহৈ কাট্যা তানাঁ
রী মাঈ কো বীনৈ।

১ তাঁতিরা সুতোর জট ছাড়াবার জন্য যে লম্বা বুরুষ ব্যবহার করে।

৩৩

ওহে অবধূত, আমার মন মাতাল হয়েছে। সমাধিমগ্ন হয়ে পান করছে গগনরস[১]। ত্রিভুবন উজ্জ্বল হয়ে গেছে। জ্ঞানকে গুড় করেছে আর ধ্যানকে করেছে মহুয়া। সংসারকে ভাটি করেছে আর তার থেকে চোলাই করছে মহারসরূপী[২] মদ। দুই পাত্রের[৩] মুখ এক করে জুড়ে এই রস চুয়ান হয়েছে। (ভাটির আগুনের জন্য) কাম আর ক্রোধের দুই পলতে বানিয়েছে। সুষুম্না-নাড়ীরূপিণী নারী সহজের মধ্যে প্রবেশ করে এই রস পান করাচ্ছে আর যে পান করবার সে পান করছে। এই রস পান করলে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। শূন্যমণ্ডলে (শূন্যচক্রে) মাদল বাজছে, সেখানে নাচছে আমার মন। গুরুর প্রসাদে আমি সহজেই সুষুম্নার কাছে অমৃতফল পেয়েছি। পূর্ণ মিলন হ'লে (অর্থাৎ সহজ সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে) তবে সুখ জন্মে; তপস্যার অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনার তাপ দূর হয়। কবীর বলছে তখন ভববন্ধন টুটে যায়। জ্যোতির (পরমজ্যোতি) মধ্যে জ্যোতি (আত্মজ্যোতি) প্রবেশ করে।

৩৩

অবধূ মেরা মন মতিৱারা।
উন্মুনি চঢ়া গগন-রস পীৱৈ, ত্রিভুবন ভয়া উজিয়ারা।
গুড় করি জ্ঞান ধ্যান করি মহুৱা, ভৱ-ভাঠী করি ভারা।
সুষমন-নারী সহজি সমানী, পীৱৈ পীৱনহারা।
দোঈ পুড় জোড়ি চিগাঈ, ভাঠী চুআ মহারস ভারী।
কাম-ক্রোধ দুই কিয়া পলীতা, ছুটি গঈ সংসারী।
সুনি মণ্ডলমেঁ মঁদলা বাজৈ, তহঁ মেরা মন নাচৈ।
গুরুপ্রসাদি অমৃত-ফল পায়া সহজি সুষমনা কাছৈ।
পূরা মিল্যা তবৈঁ সুখ উপজ্যৌ তপকী তপনি বুঝানী।
কহৈ কবীর ভৱ-বন্ধন ছুটৈ জোতি হি জোতি সমানী॥

---

১ গগনরস—শূন্যচক্রে প্রাপ্ত আনন্দ; ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত অবস্থা।

২ মহারস—আনন্দ।

৩ দুই পাত্রের—জ্ঞান ও ধ্যানের।

৩৪

ওহে অবধূত ভজনের রহস্য অন্য রকম। যদি তত্ত্ববিচার না হয় তাহ'লে গান করলেই বা কি হবে, লিখে লিখে বুঝালেই বা কি হবে, সারা জগৎময় ঘুরে বেড়ালেই বা কি হবে। আর সন্ধ্যাতর্পণেই বা কি হবে। মাথা মুড়ালেই বা কি হ'বে। মাথায় জটা রাখলেই বা কি হ'বে, গায়ে ছাই মাখলেই বা কি হ'বে, পাথরের পূজা করলেই বা কি হবে, ফলমূল আহার করলেই বা কি হবে। পরিচয় (ভগবানের সঙ্গে) ছাড়াই তুমি মালিক হয়ে বসেছ আর বিষয় নিয়ে কারবার করতে লেগেছ। জ্ঞানধ্যানের মর্ম জাননা, শুধু বৃথাই অহংকার করছ। এ রকম অহংকারী অগম অপরিমিত অতি গভীর ভজনভেদরূপী বীজ আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করেনি। কিন্তু যে সাচ্চা ভক্ত এই অহংকার নষ্ট করেছেন তিনি কর্মের বন্ধন কেটে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। কবীর বলছে ওহে গোরখ, শোন, অন্তরে সর্বদা তত্ত্ববিচারই যাঁদের আহার তাঁরা পরিজনসহ উদ্ধার পেয়ে যান।

৩৪

অবধূ ভজন ভেদ হৈ ন্যারা।
ক্যা গায়ে ক্যা লিখি বতলায়ে, ক্যা ভর্মে সংসারা।
ক্যা সন্ধ্যা-তর্পনকে কীন্হেঁ, জো নহি তত্ত্ব বিচারা।
মূঁড় মুড়ায়ে সির জটা রখায়ে, ক্যা তন লায়ে ছারা।
ক্যা পূজা পাহনকী কীন্হেঁ, ক্যা ফল কিয়ে অহারা।
বিন পরিচে সাহিব হো বৈঠে, বিষয় করৈ ব্যোপারা।
জ্ঞান-ধ্যানকা মর্ম ন জানৈ, বাদ করৈ অহংকারা।
অগম অথাহ মহা অতি গহিরা, বীজ ন খেত নিৱারা।
মহা সো ধ্যান মগন হ্বৈ বৈঠে, কাট করমকী ছারা।
জিনকে সদা অহার অন্তরমেঁ কেৱল তত্ত্ব বিচারা।
কহৈঁ কবীর সুনো হো গোরখ তারেঁা সহিত পরিৱারা।

৩৫

গগন-গুহায় (সহস্রারে) নিত্য নবীন রস ঝরছে। সেখানে বিনা বাদ্যে উঠ্ছে ঝঙ্কার; ধ্যানমগ্ন হ'লে তা বুঝতে পারা যায়। সেখানে পুকুর নেই

অথচ পদ্ম ফুটে আছে আর তার উপরে চড়ে কেলি করছে হংস (শুদ্ধ জীবাত্মা)। চাঁদ ছাড়াই জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। যেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে হংসকে। দশম দুয়ারে গিয়ে সমাধি হয়েছে, তবেই সেখানে (যোগীদের) ধ্যেয় অলখ পুরুষকে দেখা গেল। করাল কাল তার কাছে ঘেঁসতে পারে না, তার কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ জীর্ণ হয়ে যায়। তার যুগযুগান্তরের তৃষ্ণা মিটে যায়। তার কর্ম-বন্ধন আধিব্যাধি সব দূর হয়ে যায়। কবীর বলছে ভাইরে সাধু শোন, এমনি লোকই হয় অমর, তার কখনো মৃত্যু নেই।

৩৫

রস গগন গুফামেঁ[১] অজর ঝরৈ।
বিন বাজা ঝনকার উঠৈ জহঁ সমুঝি পরৈ জব ধ্যান ধরৈ।
বিনা তাল জহঁ কঁৱল ফুলানে, তেহি চঢ়ি হংসা কেলি করৈ।
বিন চন্দা উজিয়ারী দরসৈ, জহঁ-তহঁ হংসা নজর পরৈ।
দসৱেঁ দ্বারে তারী লাগী, অলখ পুরুষ জাকো ধ্যান ধরৈ।
কাল করাল নিকট নহিঁ আৱৈ, কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ জরৈ।
জুগন জুগনকী তৃষা বুঝানী, কর্ম-ভর্ম-অধ-ব্যাধি টরৈ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, অমর হোয় কবঁহূ ন মরৈ।

৩৬

জলে[২] আগুন[৩] লেগেছে, পাকপাত্র[৪] একদম জ্বলে গেছে। এ নিয়ে উত্তর দক্ষিণের পণ্ডিতেরা[৫] কেবল বিচারই করছে। গুরু[৬] আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। চেলা[৭] জ্বলে গেল। আগুন লেগেছে বিরহের। নগণ্য তৃণ (নিরভিমান ভক্ত) বেঁচে গেল এবং পূর্ণের সঙ্গে প্রীতিতে মিলে গেল।

---

১ গগন গুফা—সত্যলোক। ব্রহ্মাণ্ডের তথা পিণ্ডের সর্ব্বোচ্চ স্থান। কবীরের মতে যা কিছু পিণ্ডে আছে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। পিণ্ডের বেলা গগন গুফা সহস্রার চক্র।

২ জল—ভবসাগর।

৩ আগুন—ভগবদ্‌-বিরহাগ্নি।

৪ পাকপাত্র—মন।

৫ উত্তর দক্ষিণের পণ্ডিত—উত্তরের জ্ঞানমার্গী যোগী আর দক্ষিণের বৈধমার্গী আচার্য।

৬ গুরু—ভগবান।

৭ চেলা—জীবের 'অহং' ভাব।

ব্যাধ (গুরু) লাগিয়ে দিল দাবাগ্নি (বিরহাগ্নি)। মৃগ (মন) কাঁদছে চীৎকার করে। সে যে বনে খেলা করে বেড়াত সেই বনই পুড়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে জ্বলে জ্বলে আগুন শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌ল। বহতী নদী রয়ে গেল, মাছ[১] রয়ে গেল জল ছেড়ে। সমুদ্রে (ভবসমুদ্র) লাগল আগুন। নদীগুলি (প্রবৃত্তিগুলি) জ্বলে জ্বলে কয়লা হয়ে গেল। কবীর জেগে দেখছে যে মাছগুলি গাছে (ঊর্ধ্ব ব্রহ্মাণ্ডে) উঠে গেছে।

৩৬

অগিনী জু লাগী নীরমেঁ, কন্দূ জলিয়া ঝারি।
উতর-দখিনকে পণ্ডিতা, রহে বিচারি বিচারি ॥১॥
গুরু দাঝা চেলা জলা, বিরহা লাগী আগি।
তিণকা বপুরা উবর্‌যা, গলি পূরেকৈ লাগি ॥২॥
অহেড়ী দোঁ লাইয়া, মিরগ পুকারে রোই
জা বনমেঁ ক্রীড়া করী, দাঝত হৈ ব্‌ন সোই ॥৩॥
পাণী মাহেঁ পরজলী, ভঈ অপ্রবল আগি।
বহতী সলিতা রহ গঈ, মচ্ছ রহে জল ত্যাগি ॥৪॥
সমঁদর লাগী আগি, নদিয়াঁ জলি কোইলা ভঈ।
দেখি কবীরা জাগি, মচ্ছী রূখাঁ চড়ি গঈঁ ॥৫॥

৩৭

ওহে পণ্ডিত, বুঝে দেখ, পুরুষ কি নারী বিচার কর। ব্রাহ্মণের ঘরে সে ব্রাহ্মণী, যোগীর ঘরে যোগিনী, আবার কলমা পড়ে তুরুকনী হয়েছে। কলিকালে সে কিন্তু একলাই থাকে। বরকে বরণ করলে না, বিয়ে করলে না, জন্ম দিলে পুত্রের। কালমাথাই (কাল চুলওয়ালা গৃহস্থ) হোক আর নেড়া-মাথাই (সন্ন্যাসী) হোক কাউকে ছাড়ল না; তবু এখনও আদি কুমারীই রয়েছে। বাপের বাড়ী থাকে না, শ্বশুরবাড়ীও যায় না, স্বামীর সঙ্গে শুয়ে থাকে। কবীর বলছে জাতকুল খুইয়ে যুগ যুগ ধরে এ বেঁচে থাকে।

---

১ মাছ—জীব।

৩৭

বূঝহু পণ্ডিত, করহু ৱিচারী, পুরুষ অহৈ কী নারী।
বাহ্মনকে ঘর বাহ্মনি হোতী, যোগীকে ঘর চেলী।
কলমা পঢ়ি পঢ়ি ভঈ তুরুকিনী, কলিমেঁ রহী অকেলী।
বর নহি বরৈ ব্যাহ নহিঁ করঈ, পুত্র-জন্ম-হোনিহারী।
কারে-মূঁড়ে এক নহিঁ ছাঁড়ৈ, অব হী আদিকুঁৱারী॥
রহৈ ন মৈকে জাই ন সসুরে সাঁঈকে সঙ্গ সোৱৈ।
কহ কবীর ৱহ জুগ জুগ জীৱৈ জাতি-পাঁতি-কুল খোৱৈ॥

৩৮

ভাই সন্ত, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। বল্‌লেও কেউ বিশ্বাস করে না। বিচার করে দেখ একই পুরুষ রয়েছেন আর নারীও রয়েছেন একই। চোরাশী যোনির একই অণ্ড। সংসারের যে নানাপথ তা ভুল। একই নারী জাল পেতেছে, জগতে একটা সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে। খোঁজ করে কেউ তার অন্ত পায় না, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নয়। ঘটের ভিতর লাগিয়েছে নাগ ফাঁস, ঠকিয়ে খাচ্ছে সারা জগৎ। জ্ঞান-খড়্গ ছাড়াই লড়াই করে সারা ছুনিয়া। তাই কেউ তাকে ধরতে পারে না। নিজেই মূল, নিজেই ফুল ফুল বাগিচা, নিজেই বেছে বেছে খাচ্ছে। কবীর বলছে, যাকে গুরু জাগিয়ে দিয়েছেন সেই উদ্ধার পেয়ে যায়।

৩৮

সন্তো য়হ অচরজ ভো ভাঈ, কহৌঁ তো কো পতিআঈ॥
একৈ পুরুখ এক হৈ নারী, তাকর করহু বিচারা।
একৈ অণ্ড সকল চৌরাসী, মার্গ ভূল সংসারা॥
একৈ নারী জাল পসারা, জগমেঁ ভয়া অঁদেসা।
খোজত কাহূ অন্ত ন পায়া, ব্রহ্মা-বিস্নু-মহেসা॥
নাগ-ফাঁস লীন্হেঁ ঘট ভীতর, মূসি সকল জগ খাঈ।
জ্ঞান খড়্গ বিন সব জগ জূঝৈ, পকরি কাহু নহিঁ পাঈ॥
আপহি মূল ফূল-ফুলৱারী, আপহি চুনি চুনি খাঈ।
কহ কবীর তেঈ জন উবরে, জেহিঁ গুরু লিয়ে জগাঈ॥

৩৯

এই রঘুনাথের উন্মত্তা মায়া শিকার করতে চলেছে। যত চতুর শৌখীন লোক তাদের বেছে বেছে মারে। কাউকে কাছে ঘেসতে দেয় না। মৌনী, বীর[১] দিগম্বরকে মারে, ধ্যানী যোগীকেও মারে। জঙ্গলের জঙ্গমকে[২] ও মারে। এই মায়াকে কেউ ভোগ করতে পারল না। যারা বেদ পড়ে সেই বৈদিকদের মারে। যারা পূজা করে সেই স্বামীদের (গুরুদের) মারে। যে সব পণ্ডিত অর্থ বিচার করে তাদের মারে, সবাইকে লাগাম দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বনের ভিতর শৃঙ্গী ঋষিকে[৩] মারে। ব্রহ্মার দিল মাথা ঘুরিয়ে (অর্থাৎ মতিভ্রষ্ট করে' দিল)। মৎস্যেন্দ্রনাথকেও হার মানতে হ'ল; তাঁকে সিংহলে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিল[৪]। শাক্তের বাড়ীতে সেই হর্তাকর্তা কিন্তু হরিভক্তদের বাড়ীতে সে দাসী। কবীর বলছে ওহে সন্ত, শোন, যদি সে আসে তবে তাকে ফিরিয়ে দিও।

৩৯

ঈ মায়া রঘুনাথকী বৌরী, খেলন চলী অহেরা হো।
চতুর চিকনিয়া চুনি চুনি মারে, কাহু ন রাখে নেরা হো।
মৌনী বীর দিগম্বর মারে, ধ্যান ধরতে জোগী হো।
জঙ্গলমেঁকে জঙ্গম মারে, মায়া কিন্হহুঁ ন ভোগী হো।
বেদ পঢ়ঁতে বেহুআ মারে, পুজা করঁতে সামী হো।
অরথ রিচারত পণ্ডিত মারে, বাঁধেউ সকল লগামী হো।
সিংগী রিষি বন ভীতর মারে, সির ব্রহ্মাকা ফোরী হো।
নাথ মছন্দর চলে পীঠি দৈ, সিংঘলহূমেঁ বোরী হো।
সাকটকে ঘর করতা-ধরতা, হরি-ভগতনকী চেরী হো।
কহহিঁ কবীর সুনহু হো সন্তো, জোঁ আবৈ তোঁ ফেরী হো।

---

১ বীর—শৈব বিশেষ।

২ জঙ্গম—জঙ্গম সন্ন্যাসী।

৩ শৃঙ্গী ঋষি—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।

৪ মৎস্যেন্দ্রনাথ সিংহলের নারীদের প্রেমে আসক্ত হয়ে আত্মবিস্মৃত হন। গোরক্ষনাথ এই অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন।

৪০

এখানে থাকতে হবে না। এদেশ মরুভূমি (এ দেশ অন্যের)। এ সংসার কাগজের পুরিয়া, একটু একটু করে ধূলিতে মিশে যাবে। এ সংসার কণ্টকাকীর্ণ, এখানে জড়িয়ে পড়ে মরতে হবে। এ সংসার কাঁটার ঝাড়, আগুন লেগে পুড়ে' যাবে। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, সদ্‌গুরুর নামই একমাত্র গতি।

৪০

রহনা নহিঁ দেস বিরানা হৈ।
যহ সংসার কাগদকী পুড়িয়া, বূঁদ পড়ে ধূল জানা হৈ।
যহ সংসার কাঁটকী বাড়ী, উলঝ-পুলঝ মরি জানা হৈ।
যহ সংসার ঝাড় ঔ ঝাঁখর, আগ লগে বরি জানা হৈ।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সতগুরু নাম ঠিকানা হৈ।

৪১

ও আমার ননদের ভাই, এবার আমাকে তোমার আপন দেশে নিয়ে চল। এই পাঁচটিতে[১] মিলে সব লুটে নিল। এরা বিদেশে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। গঙ্গাতীরে[২] আমার ক্ষেত কৃষি, যমুনাতীরে[৩] আমার খামার বাড়ী। আমার ক্ষেতে সাতটি বীজ[৪] উৎপন্ন হয়েছে। আমার কিষাণ পাঁচটি। কবীর বলছে একথা অকথনীয়, এ কাউকে বলা যায় না। যাদের মধ্যে সহজ বোধ জন্মে তারাই গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকে।

৪১

অব মোহি লে চলু ননদকে বীর অপনে দেসা।
ইন পঞ্চন মিলি লূটী হূঁ, সঙ্গ-সঙ্গ আহি ৰিদেসা।
গঙ্গতীর মোরী খেতী-বারী, জমুনতীর খরিহানা।
সাতোঁ বিররী মেরে নীপজৈ, পাঞ্চূ মোর কিসানা।

---

১ পঞ্চেন্দ্রিয়।
২ গঙ্গা—ইড়া।
৩ যমুনা—পিঙ্গলা।
৪ সাতটি বীজ—সপ্ত ধাতু, যথা চর্ম, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং বীর্য।

কহৈ কবীর য়হ অকথ কথা হৈ, কহতাঁ কহী ন জাঈ।
সহজ ভাই জিহি উপজৈ, তে রমি রহৈ সমাঈ।

৪২

ওরে বাবা, আগুন[১] লাগিয়ে ঘরটা[২] জ্বালিয়ে দাও। সেই ঘরের জন্যই আমার মন করছে নানা কাজ কারবার। এক ডাইনি[৩] বাস করছে আমার মনে। সে নিত্য দংশন করে আমার হৃদয়ে। সেই ডাইনির পাঁচ ছেলে[৪]। দিনরাত তারা আমায় নাচাচ্ছে। কবীর বলছে আমি তাদের দাস; ডাইনির সঙ্গে থেকেও উদাসীন রয়েছি।

৪২

লারৌ বাবা আগি জলারো ঘরা রে।
তা কারনি মন ধন্ধে পরা রে।
ইক ডাইনি মেরে মনমেঁ বসে রে,
নিত উঠি মেরে জিয়কো ডঁসে রে।
তা ডাইনিকে লরিকা পাঁচ রে।
নিসি-দিন মোহি নচাবৈ নাচ রে।
কহৈ কবীর হূঁ তাকৌ দাস,
ডাইনিকে সঙ্গ রহৈ উদাস॥

৪৩

এই দেশটা এমনি যে এখানে আর ফিরে আসতে হবে না। যারা যারা গিয়েছে তা'রা কেউই ফিরে আসে নি বা কোনো সংবাদও পাঠায় নি। দেবতা, মানুষ, মুনি, পীর, আউলিয়া, নানা দেবদেবী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাই জন্ম নিয়ে নিয়ে ঘুরে মরে। যোগী, জংগম, সন্ন্যাসী, দিগম্বর, দরবেশ, টিকিধারী সাধু, নেড়ামাথা সাধু এদের গতি—হয় স্বর্গে, না হয় রসাতলে। জ্ঞানী, গুণী, চতুর, ছোটলোক, রাজা, ভিখারী, কত রকমেরই না

১ আগুন—ভগবদ্‌বিরহের আগুন।
২ ঘরটা—মায়া মোহের সংসার।
৩ ডাইনি—মায়া।
৪ পাঁচ ছেলে—পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়।

লোক আছে। এরা কেউ করে রহিমের গুণগান কেউ বা রামের ; আবার কেউ কেউ 'আদেশ' 'আদেশ' বলে। এরা সবাই মিলে নানা বেশ ধরে চারদিকে খুঁজে খুঁজে ফিরে। কবীর বলছে সদগুরুর উপদেশ বিনা কেউ অন্ত পেতে পারে না।

৪৩

বহূরি নহিঁ আরনা যা দেস।
জো জো গয়ে বহুরি নহিঁ আয়ে, পঠরত নাহিঁ সঁদেস।
সুর-নর-মুনি ঔর পীর ঔলিয়া, দেরী-দের-গনেস।
ধরি ধরি জনম সবৈ ভরমে হৈঁ, ব্রহ্মা-বিস্নু-মহেস।
জোগী জংগম ঔর সন্ন্যাসী, দীগম্বর দরবেস।
চুণ্ডিত-মুণ্ডিত-পণ্ডিত লোঈ, সুর্গ রসাতল সেস।
জ্ঞানী গুণী চতুর ঔ কবিনা, রাজা রংক-নরেস।
কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোঈ কহৈ আদেস।
নানা ভেষ বনায় সবৈ মিলি, ঢূঁঢ়ি ফিরে চহুঁ দেস।
কহৈঁ কবীর অন্ত না পৈহো, বিন সতগুরু উপদেস।

৪৪

যদি তাঁকে ভারী বলি তা হ'লে ভয় বড় হয় আর যদি হাল্কা বলি তাহ'লে সে হবে মিথ্যা। আমি রামের কথা কি জানি। তাঁকে ত কখনো চোখে দেখিনি। এমনি অদ্ভুত যাঁর কথা সেই অদ্ভুত আপনাকে রেখেছেন লুকিয়ে। তিনি বেদ-কোরাণের অগম্য, একথা বললে পর কেউ বিশ্বাস করে না। প্রভুর গতিবিধি অগম্য। তুই চল্ নিজের অনুমান মত। ধীরে ধীরে পা ফেলে চল্। পরিণামে পৌছে যাবি।

৪৪

ভারী কহোঁ তো বহু ডরোঁ, হলকা কহোঁ তো ঝূঁঠা।
মৈঁ কা জাণো রাম কূঁ, নৈনূ কবহুঁন দীঠা॥ ১॥
ঐসা অদ্ভুত জিনি কথৈ, অদ্ভুত রাখি লুকাই।
বেদ কুরানোঁ গমি নহীঁ, কহ্যা ন কো পতিআই॥ ২॥

করতাকী গতি অগম হৈ, তূঁ চল অপনৈঁ উনমান।
ধীরৈঁ ধীরৈঁ পাঁব দে, পহুঁচৈঁগে পরবান॥ ৩॥

৪৫

ওরে আমার নিজের প্রিয়ের কথা কার কাছ থেকে বুঝব। আমার প্রাণের প্রাণ আমার প্রিয় ছাড়া আর সবই যে মুসাফির। আমার অগাধ আশা-নদীতে কুমতি-জলস্রোত বইছে। কেউ তাকে বাঁধতে পারে না। কাম ক্রোধ এই দু'টি তার দুই কুল। আমি মত্ত হয়েছি বিষয়-রসে। এই পাঁচটি আমার অপমানের সঙ্গী। এদের জন্য ভগবানের নাম স্মরণ করতে গেলে যত আলস্য দেখা দেয়। কবীর বলছে একবার বিচ্ছিন্ন হ'লে আর মিলিত হবে না, যেমন পারে না ঝরা পাতা গাছের সঙ্গে মিল্‌তে।

৪৫

মৈঁ কাসেঁ বুঝৌ অপনে পিয়াকী বাত রী।
জান সুজান প্রাণ-প্রিয় পিয় বিন, সবৈ বটাউ জাত রী॥
আসা নদী অগাধ কুমতি বহৈ, রোকি কাহূ পৈ ন' জাত রী।
কাম-ক্রোধ দোউ ভয়ে করারে, পড়ে বিষয়-রস মাত রী।
যে পাঁচো অপমান কে সঙ্গী, সুমিরন কো অলসাত রী।
কহৈঁ কবীর বিছুরি নহিঁ মিলিহৌ, জৌ তরবর বিন পাত রী।

৪৬

যেখানে বার মাসই বসন্ত সেই পরমার্থ পদ বুঝতে পারে এমন লোক বিরল। অখণ্ডধারে অগ্নিতেজ বর্ষিত হচ্ছে তবু বন সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে আছে। লোকে যদি জলের[১] যত্ন না করে তা' হ'লে বাতাসেই[২] ময়লা দূর হয়ে যাবে। সেখানে গাছ নাই তবু আকাশ ফুলে ভরে থাকে। শিব আর ব্রহ্মা সেই ফুলের গন্ধ উপভোগ করেন। সনকাদি মুনি ভ্রমর হয়ে ভুলে রয়েছেন আর চৌরাশী লক্ষ যোনিকে দেখছেন। সদ্‌গুরু তোমাকে যে সত্য দর্শন করাবেন তাতে করেই ভগবদ্ চরণে তোমার ভক্তি থাক্‌বে অটুট। এমনি যে করতে পারে সে অমরলোকে চতুর্বর্গ ফল লাভ করে। কবীর বলছে যে বুঝে সে-ই পায়।

---

১ জল—ভক্তি।

২ বাতাস—প্রাণায়াম।

৪৬

(জাকে) বারহমাস বসন্ত হোয়, (তাকে) পরমারথ বূঝৈ
বিরলা কোয়।

বরিসৈ অগিনি অখণ্ড ধার, হরিয়র ভৌ-বন (অ) ঠারহ ভার।
পনিয়া আদর ধরী ন লোয়, পবন গহৈ কস মলিন ধোয়।
বিন্থ তরিবর ফুলৈ আকাস, সিব-বিরঞ্চি তহঁ লেহি বাস।
সনকাদিক ভূলে ভঁবর বোয়, লখ-চৌরাসী জোইনি জোয়।
জো তোহি সতগুরু সত্ত লখাব, তাতে ন ছুটে চরণ ভাব।
অমর লোক ফল লাবৈ চাব, কহঁহি কবীর বূঝৈ সো পাব।

৪৭

ওগো বন্ধু, আমায় নিয়ে চল অমরপুরীতে। অমরপুরীর সঙ্কীর্ণ গলি, তাতে চলা কঠিন। গুরু-উপদিষ্ট জ্ঞানের শব্দের আঘাত লেগে ঝাপ গেছে খুলে। ঐ অমরপুরে একটি হাট বসে, সেখানে করতে হবে সওদা। ঐ অমরপুরেতেই যত সাধুসন্তের বাস। তাঁদের দর্শন করতে হবে। যেখানে বসে সন্ত সমাজের সভা সেখানেই থাকেন আমার আপন কাম্যপুরুষ। কবীর বলছে সাধু রে ভাই শোন, ভবসাগর পার হ'তে হবে।

৪৭

অমরপূর লে চলু হো সজনা।
অমরপুরীকী সঁকরী গলিয়াঁ, অড়বড় হৈ চঢ়না।
ঠোকর লগী গুরু জ্ঞান শব্দকী, উঘর গয়ে ঝপনা।
বোহি রে অমরপুর লগি বজরিয়া, সৌদা হৈ করনা।
বোহি রে অমরপুর সন্ত বসতু হৈঁ, দরসন হৈ লহনা।
সন্ত-সমাজ সভা জহঁ বৈঠী বহী পুরুষ অপনা।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, ভবসাগর হৈ তরনা।

৪৮

ওরে বাবা যিনি অগম আগোচর তিনি কি রকম তা আমি তোমাকে এইভাবে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যা দেখা যাচ্ছে সে তা নয় আর সে যা তার কথাত বলাই যায় না। ইসারায় বা কথায় বলে' কেমন করে বুঝাব। এ

ব্যাপারটা বোবার গুড় খাওয়ার মত। তাকে না দেখা যায় চোখে না ধরা যায় হাতের মুঠোয় অথচ তার থেকে (দেখা ও পাওয়া থেকে) দূরেও সে নয়। এমনি জ্ঞানের কথা আমার গুরু বলেছেন। পণ্ডিত এবার বিচার কর।

৪৮

বাবা অগম-অগোচর কৈসা, তাতেঁ কহি সমঝাওঁ ঐসা।
জো দীসৈ সো তো হৈ নাহঁী, হৈ সো কহা ন জাঈ।
সৈনা-বৈনা কহি সমঝাওঁ, গূংগেকা গুড় ভাঈ।
দৃষ্টি ন দীসৈ মুষ্টি ন আৱৈ, বিনসৌ নাহিঁ নিয়ারা।
ঐসা জ্ঞান কথা গুরু মেরে, পণ্ডিত, করৌ বিচারা।

৪৯

যার রূপ-রেখ কিছু নেই, সেই অধরা দেহ ধারণ করেন না। সেই বিদেহী পুরুষ গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে থাকেন। ওগো আমার প্রভু, একমাত্র তুমিই আছ আর দ্বিতীয় কেউ নেই। যে বলে প্রভুর দ্বিতীয় আছে সে অন্তকুলের মানুষ। সগুণের সেবা কর আর জ্ঞান লাভ কর নির্গুণের। সগুণ এবং নির্গুণ এই উভয়ের অতীত যে, আমি করব তারই ধ্যান।

৪৯

রেখ-রূপ জেহি হৈ নহঁী, অধর ধরো নহিঁ দেহ।
গগন-মণ্ডলকে মধ্যমেঁ, রহতা পুরুষ ৱিদেহ ॥১॥
সাঁঈ মেরা এক তূ, ঔর ন দূজা কোই।
জো সাহব দূজা কহৈ, দূজা কুলকো হোই ॥২॥
সর্গুণকী সেৱা করৌ, নির্গুণকা করু জ্ঞান।
নির্গুণ সর্গুণকে পরে, তহৈঁ হমারা ধ্যান ॥৩॥

৫০

আমার প্রভু বাস করেন অগম্য পুরীতে। সেখানেই আমি যাব। সেখানে আছে আটটি কুঁয়ো আর নয়টি বাপী[১] আর আছে ষোল জন মেয়ে[২],

১ আট কুঁয়ো আর নয় বাপী—আট দিক আর নব খণ্ড অর্থাৎ সারা জগৎ। জলের অন্য নাম জীবন। কুঁয়ো এবং বাপী থেকে জল সংগ্রহ করে অর্থাৎ জগৎ থেকে জীবন-রস সংগ্রহ করে।

২ ষোল জন মেয়ে—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ এবং মন।

তারা জল আনে। ভরা (?) কলসীর[১] জল ছলকে প'ড়ে গেল[২]। বধূ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনের একটি ছোটখাট ডুলি তার ছোট চারটি বাহক। যেখানে আমার কেউ নেই সেইখানে আমাকে নাবিয়ে দেয়। আমার প্রভুর উঁচু মহল তার সঙ্গে আছে এক ভীষণ বাজার। সেখানে আছে পাপ আর পুণ্য এই দুই বেণে আর আছে অসংখ্য হীরামোতি। কবীর বলছে শোন, বন্ধু, এইটিই আমার দেশ। সেখানে যে যায় সে আর ফিরে না। সেখানকার খবর বলবে কে ?

৫০

সাঁঈ মোর বসত অগম পুরৱা জহঁ গমন হমার।
আঠ কুঁআ নৱ বারড়ী সোরহ হৈঁ পনিহার।
মহল[৩] ? ঘয়লৱা ঢরকি গয়ল রে ধন ঠাড়ী মনমার।
ছোট মোট ডঁড়িয়া চন্দনকৈ হো, ছোট চার কহার।
জায় উতরিহৈঁ ৱাহী দেসৱাঁ হো, জহাঁ কোই না হমার।
উঁচী মহলিয়া সাহেবকৈ হো, লগী বিখমী বজার।
পাপ-পুন্ন দোউ বনিয়া হো, হীরালাল অপার।
কহ কবীর সুন সাইয়াঁ মোর যাঁহিয় দেস।
জো গয়ে সো বহুরে না কো কহত সন্দেস ॥

৫১

ওহে পাঁড়ে, বুঝে সুঝে জল খাও। যে-মাটির ঘরে বসে আছ সেই মাটির দ্বারাই সব সৃষ্টি হয়েছে। এই মাটিতে ছাপান্ন কোটি যাদব গলে মিশে গেছে, মিশেছে অষ্টাশী হাজার মুনি। এর প্রতি পদে কত পয়গম্বরকে গোর দেওয়া হয়েছে। সে সবই পচে মাটি হয়ে' গেছে। ওহে পাঁড়ে, সেই যে মাটি তার ভাঁড়ে তুমি বুঝে সুঝে জল খাও। আবার জলে মাছ কচ্ছপ ঘড়িয়াল এসব বাচ্চা দিচ্ছে। তাদের রক্ত জলে মিশে যাচ্ছে। নদীর জল ত নরক বহন করে

---

১ কলসী—শরীররূপী ঘট।

২ জল ছলকে পড়ে গেল জীবনী—শক্তি ক্ষয় হয়ে গেল।

৩ মহল শব্দটির এখানে অর্থ হয়না। শব্দটি সম্ভবতঃ ভরল। লিপিকর প্রমাদের জন্য মহল হয়ে গেছে মনে হয়।

আনছে। কেননা, তাতে পশু মানুষ সব পচছে। হাড় থেকে ঝরে ঝরে এবং মাংস থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে দুধ হচ্ছে তা কোথা থেকে আসছে জান কি? ওহে পাঁড়ে, তুমি সেই দুধ নিয়ে খেতে বসেছ আর এদিকে আবার মাটি নিয়ে ছুঁয়াছুঁয়ি বিচার করছ। পাঁড়েজী, বেদ কিতাব এসব ছেড়ে দাও। এই সমস্তই মনের ভ্রম। কবীর বলছে, ওহে পাঁড়ে শোন, এই সবই ত তোমার কাজ।[১]

৫১

পাঁড়ে বুঝি পিয়হু তুম পানী।
জিহি মিটিয়াকে ঘরমঁহ বৈঠে, তামঁহ সিষ্টি সমানী।
ছপন কোটি যাদর জহঁ ভীজে, মুনিজন সহস অঠাসী।
পৈগ পৈগ পৈগম্বর গাড়ে, সো সব সরি ভৌ মাঁটী।
তেহি মিটিয়াকে ভাঁড়ে পাঁড়ে, বূঝি পিয়হু তুম পানী॥
মচ্ছ-কচ্ছ-ঘরিয়ার বিয়ানে, রুধির-নীর জল ভরিয়া।
নদিয়া নীর নরক বহি আরৈ, পসু-মানুস সব সরিয়া॥
হাড় ঝরী ঝরি গূদ গরী গরি, দূধ কহাঁতে আয়া।
সো লৈ পাঁড়ে জেরন বৈঠে, মটিয়হি ছুতি লগায়া॥
বেদ-কিতেব ছাঁড়ি দেউ পাঁড়ে, ঈ সব মনকে ভরমা।
কহহিঁ কবীর সুনহু হো পাঁড়ে, ঈ তুম্হরে হৈ করমা॥

---

১ এই পদটির সঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কমালী কবীরদাসের মেয়ে (মতান্তরে শিষ্যা) তখন তার বছর কুড়ি বয়স। একদিন সে কুঁয়ো থেকে জল তুলে ভরছিল মাটির কলসীতে। এমন সময় তৃষ্ণা-কাতর এক ব্রাহ্মণ এসে তার কাছে জল চাইল। জল দিল কমালী। জল খেয়ে ব্রাহ্মণটির যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে তখন পরিচয় জানতে চাইল মেয়েটির। কমালী সরলভাবে দিল আত্ম-পরিচয়। বল্‌ল আমি জোলাদের মেয়ে। শুনে ব্রাহ্মণটিত অগ্নিশর্মা। যা তা করে গালাগাল দিতে লাগল মেয়েটিকে। আর রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে গেল কবীরদাসের কাছে। বল্‌লে আমার জাত মেরেছে তোমার ঐ মেয়ে। আমি এর প্রতিকার চাই। তখন কবীরদাস তাকে এই পদটি শুনালেন। শুনে ব্রাহ্মণের জ্ঞাননেত্র খুলে গেল। সে লুটিয়ে পড়ল কবীরদাসের পায়ে। বল্‌ল প্রভু, উদ্ধার কর আমাকে। প্রসন্ন হ'লেন কবীর দাস, ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে নিলেন আর ঐ কমালীরই সঙ্গে দিলেন বিয়ে। (Kabir and His Followers p.16)

৫২

সাধু হে, পাঁড়ে একটি নিপুণ কসাই। ছাগী মেরেই ছুটেছে ভেড়ী মারার জন্য। ওর প্রাণে একটুও দরদ হয় না। স্নান করে ফোঁটা তিলক কেটে বিধিমত করে দেবী-পূজা। এক পলকের মধ্যে রক্তের নদী বহিয়ে দিয়ে সে নিজের আত্মাকেই বধ করে। বলে বেড়ায় অতি পবিত্র উচ্চ কুলে আমার জন্ম। সভামধ্যে সেই উচ্চ কুলের অধিকার দাবি করে। এর কাছেই আবার সবাই দীক্ষা নিতে যায়। শুনে আমার হাসি পায় রে ভাই। এই পাঁড়ে অন্যের পাপ দূর করবার জন্য পুরাণ পাঠ করে কিন্তু অন্যকে দিয়ে অতি হীন কাজ করায়। দেখা যাচ্ছে দুই-ই পরস্পরকে ডুবাচ্ছে আর দুজনকেই যম হাত ধরে টানছে। যে গোবধ করে তাকে বলে তুরুক। এই লোকটি তার চেয়ে কম কিসে। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোন, কলির বামুন অতি বদলোক।

৫২

সাধো, পাঁড়ে নিপুন কসাঈ।
বকরী মারি ভেড়িকো ধায়ে, দিলমেঁ দরদ ন আঈ।
করি অস্নান তিলক দৈ বৈঠে, বিধিসোঁ দেবি পুজাঈ।
আতম মারি পলকমে বিনসে, রুধিরকী নদী বহাঈ।
অতি পুনীত উঁচে কুল কহিয়ে, সভা মাহি অধিকাঈ।
ইনসে দিচ্ছা সব কোঈ মাঁগে, হঁসি আবৈ মোহি ভাঈ।
পাপ-কটনকো কথা সুনাবৈঁ, করম করাবৈঁ নীচা।
বূড়ত দোউ পরস্পর দীখে, গহে বাঁহি জম খীঁচা।
গায় বধৈ সো তুরুক কহাবৈ, য়হ ক্যা ইনসে ছোটে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, কলিমে বাম্হন খোটে।

৫৩

যদি ভগবানই বীজরূপী হন তাহ'লে, হে পণ্ডিত, তুমি আর কি জ্ঞানের কথা শোনাচ্ছ। তাহ'লে তাঁকে ছেড়ে শরীর নেই, মন নেই, অহংকার নেই, সত্ত, রজ, তম এই তিন গুণও নেই। বেদ আর বেদের বোধক (জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতা) উভয়ই একই গাছ। তাতে বিষ অমৃত নানা রকম

ফল ফলে রয়েছে। কবীর বলছে এই সারা প্রপঞ্চই মনের কল্পনা। এতে কে দেয় মুক্তি আর কেই বা রাখে জড়িয়ে।

৫৩

জো পৈঁ বীজরূপ ভগবানা,
তৌ পণ্ডিতকা কথিসি গিয়ানা ॥
নহিঁ তন নহিঁ মন নহিঁ অহংকারা
নহিঁ সত-রজ-তম তীনি প্রকারা ॥
বিষ-অমৃত-ফল ফলে অনেক,
বেদ রু বোধক হৈঁ তরু এক ॥
কহৈঁ কবীর ইহৈ মন মানা.
কেহিধূঁ ছূট করন উরঝানা ॥

৫৪

পণ্ডিত মিছে কথা বলে। রাম রাম বললেই যদি দুনিয়ার লোক উদ্ধার পায় তাহ'লে চিনি চিনি বল্‌লে ও ত মুখ মিঠে হ'বে। আগুন আগুন বল্‌লে পুড়ে যাবে, জল জল বল্‌লে তৃষ্ণা মিটবে, আর ভোজন ভোজন বল্‌লে ক্ষিধে দূর হবে। এই যদি হয় তাহ'লে ত সবাই তরে যাবে। টিয়া পাখী যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ হরি হরি বলে কিন্তু তার উপর হরিনামের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায় তাহ'লে সে নামের কথা তার আর মনেই পড়ে না। (যারা মুখে শুধু রাম রাম বলে) ওদের সত্যিকারের প্রীতি বিষয়-মায়ার প্রতি, যে মায়া হরিভক্তদের দাসী। কবীর বলছে যার অন্তরে প্রেম জন্মায়নি তাকে বেঁধে যমপুরীতে নিয়ে যাবে।

৫৪

পণ্ডিত বাদ বদন্তে ঝূঠা।
রাম কহ্যাঁ দুনিয়া গতি পাবৈ,
খাঁড় কহ্যাঁ মুখ মীঠা ॥

পারক কহঁ্যা পার জে দাঝৈ,
জল কহি ত্রিষা বুঝাঈ ।
ভোজন কহঁ্যা ভূখ জে ভাজৈ,
তো সব কোই তিরি জাঈ ॥
নরকৈ সাথি সূরা হরি বোলে,
হরি পরতাপ ন জারৈ ।
জো কবহূঁ উড়ি জাঈ জঙ্গলমেঁ
বহুরি ন স্বুরতৈঁ আনৈ ॥
সাঁচী প্রীতি ।বষৈ মায়াস্থঁ,
হরি ভগতনি-স্থঁ দাসী ।
কহৈ কবীর প্রেম নহিঁ উপজ্যো,
বাঁধ্যৌ জমপুরি জাসী ॥

৫৫

ওহে পাঁড়ে, বাদবিসম্বাদ করো না। এই দেহে শব্দও নেই, স্বাদও নেই, এটি শুধু মাটি। অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড সবই মাটি, নবনিধিযুক্ত এই কায়া ও মাটি। মাটি খুঁজতে খুঁজতে দেখা হ'ল সদগুরুর সঙ্গে। তিনি অলখ কিছু দেখালেন (অর্থাৎ যা দেখা যায় না তার সামান্য কিছু দেখালেন)। জ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করে দেখ জীবনও মাটি মৃত্যুও মাটি। অতিশয় কাল মাটির উপর বেধেছ বাসা আর শুয়ে আছ পা ছড়িয়ে। এই চিত্রটি (দেহ) মাটির, দাঁড়িয়ে আছে বাতাসের স্তম্ভের উপর। এই দুইয়ের উৎপত্তি বিন্দু থেকে। তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন, তিনিই সাজান, এ সবই গোবিন্দের মায়া। মাটির মন্দির তাতে জ্বলছে জ্ঞানের দীপ। প্রাণের পলতে দিয়ে সে বাতি উজ্জ্বল করা হয়েছে। কবীর জ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করে বলছে সেই দীপের আলোতেই সারা দুনিয়া দেখা যাচ্ছে।

৫৫

পাঁড়ে ন করসী বাদ-বিবাদ।
যা দেহী বিন সবদ ন স্বাদ।

অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড ভী মাটী,
মাটী নৱনিধি কায়া।
মাটী খোজন সৎগুরু ভেট্যা,
তিন কছু অলখ লখায়া।
জীৱত মাটী মূৱা ভী মাটী
দেখৌ গ্যান বিচারী।
অতি কালী মাটীমেঁ বাসা
লেটৈ পাঁৱ পসারী॥
মাটীকা চিত্র পৱনকা থম্ভা
ব্যন্দ সংজোগী উপায়া।
ভাঁনৈ ঘড়ৈ সঁৱারৈ সোঈ,
য়হু গোব্যন্দকী মায়া।
মাটীকা মন্দির গ্যানকা দীপক
পৱন বাতি উজিয়ারা॥
তিহি উজিয়ারৈ সব জগ সূঝৈ,
কবীর গ্যান বিচারা॥

৫৬

পণ্ডিত, বুঝে দেখ এ কোন নারী। কেউ এর জন্ম দেয় নি। এ চিরকুমারী। সব দেবতা মিলে একে শ্রীহরিকে দান করলেন। তাঁর সঙ্গে সে চারযুগ ধরে বাস করল। প্রথমে এ ধরেছিল পদ্মিনীরূপ। এ নাগিনী সমস্ত জগৎকে তাড়া করে করে খাচ্ছে। এ যে সুন্দরী যুবতী; এর কোনো ঠিকানা জানা নাই। এ যেখানে থাকে সেখানে রয়েছে অতি উজ্জ্বল আলো আবার ঐ সঙ্গে রাতের অন্ধকার। কবীর বলছে সমস্ত জগৎ একে ভালবাসে। কিন্তু এ নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে' আপনি বেঁচে থাকে।

৫৬

তুম বূঝহু পণ্ডিত কৌন নারি।
কোই নাহিঁ বিআইল রহ কুমারি॥

যেহি সব দেৱন মিলি হরিহিঁ দীনহ।
তেহি চারহুঁ যুগ হরি সঙ্গ লীন্হ।'
যহ প্রথমহিঁ পদ্মিনি রূপ পায়।
হৈ সাঁপিনি সব জগ খেদি খায়॥
যা বর যুৱতী ৱে বার নাহ।
অতি তেজ তিয়া হৈ রৈনি তাহ॥
কহ কবীর সব জগ পিয়ারি।
য়হ অপনে বলকৱৈ রহৈ মারি॥

৫৭

সবাই বলছে চল চল (বৈকুণ্ঠে চল)। কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় জানি না। এক যোজন পরিমাণ পথ চিনে না আর বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে বলছে লম্বাচওড়া কথা। যতক্ষণ বৈকুণ্ঠের আশা থাকবে ততক্ষণ শ্রীহরির চরণে আশ্রয় মিলবে না। আর তা ছাড়া নিজে যতক্ষণ সেখানে (বৈকুণ্ঠে) না গিয়েছ ততক্ষণ লোকের কথা শুনে তা বিশ্বাস করবে কি করে। কবীর বলছে একথা কাকে বলব যে সাধুসঙ্গই বৈকুণ্ঠ।

৫৭

চলন চলন সবকোই কহত হৈ,
নাঁ জানৌ বৈকুণ্ঠ কহাঁ হৈ।
জোজন এক প্রমিতি নহি জানৈঁ,
বাতনি হী বৈকুণ্ঠ বখানৈঁ॥
জব লগ হৈ বৈকুণ্ঠকী আসা,
তব লগ নহিঁ হরি-চরণ-নিৱাসা॥
কহেঁ সুনেঁ কৈসেঁ পতিঅইয়ে,
জব লগ তহাঁ আপ নহিঁ জইয়ে॥
কহৈ কবীর যহু কহিয়ে কাহি,
সাধ সঙ্গতি বৈকুণ্ঠহিঁ আহি॥

৫৮

ওরে লোকগুলার মতিভ্রম হয়েছে। কবীর জিজ্ঞাসা করছে যদি কবীর কাশীতেই মরে তা হ'লে আর রামের কাছে কাকুতি মিনতি করা কেন। তখন আমি ঐ রকম ছিলাম এখন যে এইরকম হয়েছি এইটেই আমার জীবনের লাভ। রামের প্রতি ভক্তিতে যার চিত্ত নিবিষ্ট তার পক্ষে এ আর আশ্চর্য্য কি। ওরে গুরুর প্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দিয়ে জোলা জগৎ জয় করে যাবে। কবীর বলছে, ওহে সন্ত শোন, কেউ যেন ভ্রমে না পড়ে। কাশী এবং মগহর দুইই উষর স্থান (কোনোরূপ ফলপ্রসূ নয়)। হৃদয়ে যে রাম থাকেন তাই সত্য।

৫৮

লোকা মতিকে ভোরা রে।
জো কাসী তন তজৈ কবীরা,
তৌ রামহিঁ কহা নিহোরা রে।
তব হম বৈসে অব হম ঐসে,
ইহৈ জনমকা লাহা রে॥
রাম-ভগতি-পরি জাকৌ হিত চিত
তাকৌ অচিরজ কাহা রে।
গুর-প্রসাদ সাধকী সঙ্গতি,
জগ জীতেঁ জাই জুলাহা রে।
কহৈ কবীর সুনহু রে সন্তো,
ভ্রমি পরৈ জিনি কোঈ রে।
জস কাসী তস মগহর[১] উসর
হিরদৈ রাম সতি হোঈ রে।

৫৯

পূজা সেবা নিয়ম ব্রত এসব যেন ছোট মেয়ের পুতুল খেলা। যতক্ষণ প্রিয়তম স্পর্শ না করেছেন ততক্ষণ এসব অনেক সংশয় থাকে।

১ মগহর—গোরখপুর জেলায়। এখানে কবিরদাসের দেহান্ত হয়।

৫৯

পূজা-সেৱা-নেম-ব্রত, গুড়িয়নকা-সা খেল।
জব লগ পিউ পরসৈ নহ্ঁী, তব লগ সংসয় মেল॥

৬০

সাধুর জাতি জিজ্ঞেস করো না, তাঁর জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞেস কর। তলোয়ারের দাম কর তার খাপটা পড়ে থাকুক না। জ্ঞানের হাতী চড়; তার পিঠে বিছিয়ে নাও সহজের ছুলিচা। সংসারটা কুকুরের মত। সে আপশোস মিটিয়ে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করুক না।

৬০

জাতি ন পূছো সাধকী, পূছি লীজিয়ে জ্ঞান।
মোল করো তরৱারকা, পড়া রহন দো ম্যান॥
হস্তী চঢ়িএ জ্ঞানকৌ, সহজ ছুলীচা ডারি।
স্বান-রূপ সংসার হৈ, ভূঁকন দে ঝক মারি॥

৬১

ওরে তোর মন আর আমার মন কি করে এক হবে। আমি বলছি চোখে দেখি আর তুই বলছিস পুঁথিতে লেখা আছে। আমি একটি একটি করে পাক খুলে খুলে জট ছাড়াবার কথা বলি আর তুই আবার জট পাকিয়ে দিস। আমি বলি জেগে থাকিস আর তুই থাকিস ঘুমিয়ে। আমি বলি ওরে মোহমুক্ত হ’ আর তুই মোহেই পড়ছিস্। এমনি করে যুগ যুগ ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমি হার মেনে গেছি। তোরা কেউই আমার কথা শুনছিস না। তুই ত বেশ্যার (মায়ার) পিছনে পিছনে ঘুরছিস। সমস্ত সম্পত্তি তচনচ করে দিলি, সব ধন দিলি খুইয়ে। সদ্‌গুরুর নির্মল ধারা বয়ে যাচ্ছে তাতে তোর গা ধুয়ে নে। কবীর বলছে, ভাইরে সাধু শোন্, তবেইত ওরকম হবি।

৬১

মেরা-তেরা মনুআঁ কৈসে ইক হোঈ রে।
মৈঁ কহতা হৌ আঁখিন দেখী, তূ কহতা কাগদকী লেখী॥
মৈঁ কহতা সুরঝাৱন হারী, তূ রাখ্যৌ উরঝাঈ রে।
মৈঁ কহতা তূ জাগত রহিয়ো, তূ রহতা হৈ সোঈ রে।

মৈঁ কহতা নির্মোহী রহিয়ো, তূ জাতা হৈ মোহী রে।
জুগন জুগন সমুঝারত হারা, কহী ন মানত কোঈ রে।
তূ তো রণ্ডী ফিরৈ বিহণ্ডী, সব ধন ডারে খোঈ রে।
সতগুরু ধারা নির্মল বাহৈ, রামৈঁ কায়া ধোঈ রে।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, তব হী রৈসা হোঈ রে॥

৬২

ওগো নতুন বৌ, তুমি কাঁচুলি ধোওনি কেন। তোমার ছেলেবেলার ময়লা কাঁচুলি তাতে বিষয়ের দাগ লেগেছে। না ধুলে প্রিয়তম তোমার খুশি হবেন না আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন। স্মরণ ধ্যানকে সাবান করে নাও আর সত্যনামকে নদী। ওগো বৌ, দুটানার ভাবটা ঘুচিয়ে দাও, মনের ময়লা ধুয়ে ফেল। মনে করে দেখ তিন অবস্থা কেটে গেছে, এখন শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় হ'য়েছে। ভর্তা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন, এখন পছতিয়ে কি হ'বে। কবীর বলছে, বৌগো শোন, চিত্তে অঞ্জন পরে নাও।

৬২

দুলহিন অঙ্গিয়া কাহে ন ধোৱাঈ।
বালপনেকী মৈলী অঙ্গিয়া বিষয়-দাগ পরি জাঈ।
বিন ধোয়ে পিয় রীঝত নাহীঁ, সেজসে দেত গিরাঈ।
সুমিরন ধ্যানকৈ সাবুন করি লে সত্তনাম দরিয়াঈ।
দুবিধাকে[১] ভেদ খোল বহুরিয়া মনকৈ মৈল ধোৱাঈ।
চেত করো তীনোঁ পন বীতে, অব তো গৱন নগিচাঈ।
পালনহার দ্বার হৈঁ ঠাঢ়ে অব কাহে পছিতাঈ।
কহত কবীর সুনো রী বহুরিয়া চিত অঞ্জন দে আঈ।

৬৩

প্রিয়তম, আমার চুনরীতে (ওড়না) দাগ লেগে গেছে। পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী আমার চুনরী, তাতে রয়েছে ষোল শ' বাঁধন। এই চুনরী আমার বাপের বাড়ী থেকে এসেছে। শ্বশুরবাড়ী এসে আমার মন একে মাটি করে দিয়েছে।

১ একদিকে মায়ার টান আরেক দিকে ভগবানের টান।

রগড়ে রগড়ে ধুলাম তবু দাগ গেল না। তাই প্রিয়তম নিয়ে এসেছেন জ্ঞানের সাবান। কবীর বল্‌ছে, প্রভু যখন তোমাকে আপন করে নেবেন তখনই দাগ সব উঠে যাবে।

৬৩

মোরী চুনরীমেঁ পরি গয়ো দাগ পিয়া।
পাঁচ তত্তকী বনী চুনরিয়া, সোরহসৈ বঁদ লাগে জিয়া।
য়হ চুনরী মোরে মৈকেতেঁ আঈ, সসুরেমেঁ মনুৰাঁ খোয় দিয়া।
মলি মলি ধোঈ দাগ ন ছূটে, জ্ঞানকো সাবুন লায় পিয়া।
কহেঁ কবীর দাগ কব ছুটি হৈ, জব সাহব অপনায় লিয়া।

৬৪

বুঝনেওয়ালা বিচার করে দেখ, অবুঝ লোক আর কতদূর বুঝবে। রামচন্দ্রের মত কত তপস্বীকে এই জগৎ ভ্রমিয়ে মেরেছে। কত কৃষ্ণ হ'লেন মুরলীধর; তিনিও এর অন্ত পেলেন না। মৎস্য কচ্ছপ বরাহরূপ ধরলেন, ধরলেন বামনরূপ, তবু অন্ত পেলেন না কত বুদ্ধ কত কল্কী হলেন তবু তার অন্ত পেলেন না। কত সিদ্ধ সাধক সন্ন্যাসী সব বনে বাস করতে লাগলেন, কত মুনিঋষি, কত গোরখনাথ তাঁরাও অন্ত পেলেন না। যার গতি ব্রহ্মাও পেলেন না, শিব সনকাদিও হার মানলেন যার কাছে, তার গুণ মানুষ জানবে কি করে—কবীর চেঁচিয়ে এই কথা বলছে।

৬৪

অবুঝা লোগ কহাঁলোঁ বূঝৈ বুঝনহার বিচারো॥
কেতে রামচন্দ্র তপসীসে জিন জগ যহ ভরমায়া।
কেতে কান্‌হ ভয়ে মুরলীধর তিন ভী অন্ত ন পায়া॥
মচ্ছ-কচ্ছ-বারাহ স্বরূপী বামন নাম ধরায়া।
কেতে বৌধ ভয়ে নিকলঙ্কী তিন ভী অন্ত ন পায়া॥
কেতিক সিধ-সাধক-সন্ন্যাসী জিন বন বাস বসায়া।
কেতে মুনিজন গোরখ কহিয়ে তিন ভী অন্ত ন পায়া॥
জাকী গতি ব্রহ্মৈ নহিঁ পায়ে সিব-সনকাদিক হারে।
তোকে গুন নর কৈসে পৈহোঁ কবীর পুকারে॥

৬৫

সাধু, দেখ ছুনিয়াটা পাগল হ'য়ে গেছে। সত্য কথা বলতে গেলে মারতে আসে, মিথ্যাতেই জগতের বিশ্বাস। হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে আমার রহমান। তারপর দুইজন পরস্পর লড়াই করে মরে, মর্ম জানে না কেউই। আমার সঙ্গে এমন অনেক লোকের দেখা হয়েছে যারা নিয়ম ধর্ম মেনে চলে, করে প্রাতঃস্নান। এরা আত্মাকে ছেড়ে পূজা করে' পাথরের। এদের জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। আরও অনেকে যোগাসন করে এমন একটা ভাব দেখায় যেন তাদের মত আর কেউ নেই, এদের মন অহংকারে পূর্ণ। এরা গাছপাথরের পূজা করতে থাকে, তীর্থব্রত করে নিজেদের ভুলায়। আরও অনেকে মালা পরে, টুপী পরে, তিলক কাটে, ছাপ লাগায়, সাখী আর শব্দ গাইতে গাইতেই ভুলে যায়। এরা খবর জানে না আত্মার। আবার অনেকে মায়ার অভিমানে ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায়। এই সব গুরুর সঙ্গে তাদের শিষ্যেরাও সব ডোবে। শেষকালে এদের আপশোসের অন্ত থাকে না। অনেক পীর আর আউলিয়া দেখেছি, তারা কিতাব কোরাণ পড়ে, শিষ্য করে, কবর দেওয়ার বিধান দেয়। এরাও খোদাকে জানে না। আজ হিন্দুর দয়া নেই, মুসলমানের মেহর (দয়া) নেই, দুইই (দয়া ও মেহর) দেশছাড়া হয়েছে। এ জবাই করে ও বলি দেয়। উভয়েরই ঘরে আগুন লেগেছে। এমনি সব রীতিনীতি নিয়ে দুনিয়া চল্‌ছে হেসে খেলে আর আমরা নিজেদের বলছি সেয়ানা। কবীর জিজ্ঞেস করছে, সাধুরে ভাই, এর মধ্যে দেওয়ানা কে।

৬৫

সাধো, দেখো জগ বৌরানা।
সাঁচী কহৌ তৌ মারণ ধাবৈ ঝুঁঠে জগ পতিয়ানা।
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা মুসলমান রহমানা।
আপসমেঁ দোউ লড়ে মরতু হৈঁ মরম কোই নহিঁ জানা।
বহুত মিলে মোহিঁ নেমী ধর্মী প্রাত করৈঁ অসনানা।
আতম-ছোড়ি পষানৈঁ পূজৈ তিনকা থোথা জ্ঞানা।
আসন মারি ডিঁভ ধরি বৈঠে মনমেঁ বহুত গুমানা।
পীপর-পাথর পূজন লাগে তীরথ-বর্ত ভুলানা।

মালা পহিরে টোপী পহিরে ছাপ-তিলক অনুমানা।
সাখী সব্দৈ গাৱত ভূলে আতম খবর ন জানা।
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেন ফিরত হৈঁ মায়াকে অভিমানা।
গুরুৱা সহিত সিষ্য সব বূড়ে অন্তকাল পছিতানা।
বহুতক দেখে পীর-ঔলিয়া পঢ়েঁ কিতাব-কুরানা।
করৈঁ মুরীদ কবর বতলাবৈঁ উনহূঁ খুদা ন জানা।
হিন্দুকী দয়া মেহর তুরকনকী দোনোঁ ঘরসে ভাগী।
ৱহ করৈ জিবহ ৱাঁ ঝটকা মারে আগ দোউ ঘর লাগী।
যা বিধি হঁসত চলত হৈঁ হমকো আপ কহাবৈঁ স্যানা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো ইনমেঁ কৌন দ্বিৱানা॥

৬৬

মিঞা, তুমি কি আর বলবে। আমি খোদার একজন দীন বান্দা। তুমি যা খুশি ভাবতে পার। আল্হা দুর্বল দীনহীনের প্রভু। তিনি জোর চান না। তুমি যে মুরশিদ পীরের কথা বলছ কে তারা, কোথা থেকে এল। তারা রোজা করে, নামাজ পড়ে, কলমা পড়ে কিন্তু তাতে স্বর্গ মিলে না। এক মনের ভিতরেই আছে সত্তরটি কাবা। যে (দর্শন) করবে সে-ই জানবে। প্রিয়কে চেন, একটু দয়া কর আপনাকে। ধনসম্পদকে তুচ্ছ মনে করো। প্রভু কাছেই এসে রয়েছেন জেনো। যে এটি জানে সে হয় স্বর্গের সরিক। একই মাটি, রূপ শুধু ভিন্ন ভিন্ন। সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান। কবীর বলছে স্বর্গ ছেড়ে নরকই আমার মনের মত (অর্থাৎ স্বর্গ নরকে কোনো ভেদ নেই)।

৬৬

মীয়াঁ তুম্হসোঁ বোল্যাঁ বণি নহী আৱৈ।
হম মসকীন খুদাঈ বন্দে তুম্হরা জস মনি ভাৱৈ॥
অল্হ অৱলি দীনকা সাহিব, জোর নহীঁ ফুরমায়া।
মুরিসদ-পীর তুম্হরৈ হৈ কো, কহৌ কহাঁথৈ আয়া॥
রোজা করৈঁ নিৱাজ গুজারৈঁ কলমৈ ভিসত ন হোঈ।
সত্তরি কাবে ইক দিল ভীতরি জে করি জানৈ কোঈ॥

খসম পিছাঁনি তরস করি জিয়মৈঁ মাল মতাঁ করি ফীকী।
আয়া জাঁনি সাঁঈকূ জাঁনৈঁ, তব হ্বৈ ভিস্ত সরীকী॥
মাটী এক ভেষ ধরি নাঁনাঁ সবমে ব্রহ্ম সমানাঁ।
কহৈ কবীর ভিস্ত ছিটকাঈ দোজগ হী মনমানাঁ॥

৬৭

আমি প্রিয়ের খোঁজে চলেছি। (তাঁকে কি করে পাব) অন্তরের এই ভাবনা ঘোচেনি। বন্ধু আমার নিয়তই পাশে রয়েছেন তবু তাঁকে দেখতে পাইনে। বিহ্বল হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াই তবুও কান্তকে পাইনে। কি করে আমি ধৈর্য ধরে থাকব। আমার হাত থেকে যে হীরা পড়ে গেছে। যখন আমার চোখের পর্দা সরে গেল তখন তাকিয়ে দেখি প্রভু রয়েছেন গগনে (সহস্রারে)। কবীর বল্‌ছে আমার চোখেই বন্ধুর বাসা—একথা মুখে বলতে গেলে ভয় হয়।

৬৭

চলী মৈঁ খোজমেঁ পিয়কী। মিটী নহঁী সোচ য়হ জিয়কী॥
রহে নিত পাস হী মেরে। ন পাউঁ য়ারকো হেরে॥
বিকল চহুঁ ঔরকো ধাউঁ। তবহুঁ নহিঁ কন্তকো পাউঁ॥
ধরোঁ কেহি ভাঁতিসো ধীরা। গয়ৌ গির হাথসে হীরা॥
কটি জব নৈনকী ঝাঁঈঁ। লখ্যৌ তব গগনমেঁ সাঁঈ॥
কবীর শব্দ কহি ত্রাসা। নয়নমেঁ য়ারকো বাসা॥

৬৮

প্রিয়তমের বিরহে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। আমার দিনে শান্তি নেই, রাতে নেই ঘুম। আমার সব কাজকর্ম মাটি হ'ল। আমার দেহমন চরখার মত কাঁপছে। শূন্য শয্যায় আমার জন্ম কেটে গেল। চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু পথ চোখে পড়ল না। বেদরদী বন্ধু আমার খোঁজ নিল না। কবীর বলছে, ভাইরে সাধু শোন (বিরহের) দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে, এই বেদনা দূর কর।

৬৮

তলফৈ বিন বালম মোর জিয়া।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিদিয়া,
তলফ তলফকে ভোর কিয়া॥
তন-মন মোর রহঁট-অস ডোলৈ,
সূন সেজপর জনম ছিয়া।
নৈন থকিত ভয়ে পন্থ ন সূঝৈ,
সাঁঈঁ বেদরদী সুধ ন লিয়া॥
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
হরো পীর দুখ জোর কিয়া॥

৬৯

ভক্তের রক্ষাকারী অবিনাশী প্রিয়তম কবে তোমার দেখা পাব। আমার অবস্থাটা যেন সেই মাছের মত যে জলে জন্মে, জলই ভালবাসে, তবু জল জল করে চেঁচায়। প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় বিরহিণী আমি তোমার পথের দিকেই চেয়ে আছি, তোমার প্রেমের জন্য আমি ঘর ছেড়েছি, তোমার চরণে করেছি আত্ম-সমর্পণ। জলছাড়া মাছের যেমন হয় তেমনি ঘরের মধ্যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে। দিনের বেলা আমি খেতে পারিনে, রাতে আমার ঘুম হয় না, ঘরদোর আমার ভাল লাগে না। শয্যা আমার শত্রু হয়েছে। আমি জেগে রাত কাটিয়ে দি। বন্ধু, আমি ত তোমারই দাসী, তুমি আমার ভর্তা। দীনদয়াল, এস তুমি দয়া করে। তুমি শক্তিমান, তুমি স্রষ্টা। প্রিয়তম, হয় তুমি এসে আপন করে নাও, নয় আমি এই প্রাণ ত্যাগ করি। কবীরদাস বলছে বিরহ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে, আমাকে দর্শন দাও।

৬৯

অবিনাসী দুলহা কব মিলিহৌ, ভক্তনকে রছপাল।
জল উপজী জল হী সোঁ নেহা, রটত পিয়াস পিয়াস।
মৈঁ ঠাঢ়ী বিরহন মগ জোউঁ, প্রিয়তম তুমরী আস।

ছোড়ে গেহ নেহ লগি তুম-সোঁ, ভঈ চরণ লৱলীন।
তালা-বেলি হোতি ঘর ভীতর, জৈসে জল বিন মীন।
দিৱস ন ভূখ রৈন নহিঁ নিদ্রা, ঘর অঙ্গনা ন সুহায়।
সেজরিয়া বৈরিন ভঈ হমকো, জাগত রৈন বিহায়।
হম তো তুমরী দাসী সজনা, তুম হমরে ভরতার।
দীন-দয়াল দয়া করি আও, সমরথ সিরজনহার।
কৈ হম প্রান তজতি হৈঁ প্যারে, কৈ অপনী কর লেৱ।
দাস কবীর বিরহা অতি বাঢ়েৱ, হমকো দরসন দেৱ।

৭০

তুমি এস আমার চোখের মধ্যে, তা'হ'লে আমি চোখ বুজে ফেল্‌ব। আমি আর কাউকে দেখব না, তোমাকেও আর কাউকে দেখতে দেব না। কবীর বল্‌ছে যেখানে সিঁদুরের রেখা দিতে হয় সেখানে কাজল দেওয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ করছেন সেখানে অন্যের স্থান হবে কোথায়। মনে আমার বিশ্বাস নেই, নেই প্রেমরস। এই শরীরে (প্রিয়তমকে আকর্ষণ করার) কৌশলও নেই। কি করে সেই প্রিয়তমের সঙ্গে আমার রঙ্গরহস্য হবে জানি না।

৭০

নৈনা অন্তরি আৱ তূঁ, জ্যূঁ হৌঁ নৈন ঝঁপেউঁ।
না হৌঁ দেখৌঁ ঔরকূঁ, না তুঝ দেখন দেউঁ॥ ১॥
কবীর রেখ সিদূঁরকী, কাজল দিয়া ন জাই।
নৈনূঁ রমইয়া রৱি রহ্যা, দূজা কহাঁ সমাই॥ ২॥
মন পরতীতি ন প্রেম-রস, না ইস তনমে ঢংগ।
ক্যা জাণৌ উস পীৱসূঁ, কৈসেঁ রহসী রঙ্গ॥ ৩॥

৭১

চোখকে করলাম কামরা, তাতে পাতলাম আঁখি-তারার পালং। তারপর ফেলে দিলাম চোখের নিমেষের চিক, তাতে প্রসন্ন হ'লেন আমার প্রিয়তম। প্রিয়তম আমার বিদেশে থাকলে তবে তাঁকে চিঠি লিখতাম। তিনি যে শরীরে, মনে, নয়নে রয়েছেন। তাঁকে আর কোথায় খবর পাঠাব।

৭১

নৈনোকী করি কোঠরী, পুতরী পলঙ্গ বিছায়।
ফলকোঁকী চিক ডারিকৈ, পিয়াকো লিয়া রিঝায়॥ ১॥
প্রীতমকো পতিয়া লিখূঁ, জো কহুঁ হোয় বিদেস।
তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ, তাকৌ কহা সঁদেস॥ ২॥

৭২

পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে আমার ছানি পড়ে গেল। নাম নিতে নিতে জিভে ফোস্কা পড়ে গেল। বিরহের কমণ্ডলু হাতে নিয়ে আমার চোখ দুটি বৈরাগী হয়ে গেল। তারা চাইছে 'দর্শন-মাধুকরী'; তা নিয়েই দিনরাত বিভোর হয়ে আছে। এই দেহ রবাব। রগগুলি সব তার। তাতে নিত্য বাজছে বিরহের সুর আমার প্রভু আর আমার চিত্ত ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পায় না।

৭২

অঁখিয়াঁ তো ঝাঈ পরী পন্থ নিহারি নিহারি।
জীহড়িয়াঁ ছালা পড়্যা, নাম পুকারি পুকারি॥ ১॥
বিরহ কমণ্ডল কর লিয়ে, বৈরাগী দো নৈন।
মাঁঙ্গৈ দরস মধূকরী, ছকে রহৈঁ দিন-রৈন॥ ২॥
সব রঙ্গ তাঁত রবাব তন, বিরহ বজাবৈ নিত্ত।
ঔর ন কোঈ সুনি সকৈ, কৈ সাঁঈ কৈ চিত্ত॥ ৩॥

৭৩

পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করে সারা জগৎ ভুলে রয়েছে। যে কোনো পক্ষ না নিয়ে শ্রীহরির ভজনা করে সেই সন্তই বুদ্ধিমান। অমৃতের মোট মাথা থেকে নামিয়ে রেখে দিয়েছি। যাকে বলছি একই রয়েছেন সে-ই আমাকে দুচারটে কথা শুনিয়ে দিচ্ছে।

৭৩

পছা পছীকে কারনৈ, সব জগ রহা ভুলান।
নিরপছ হ্বৈকে হরি ভজৈ, সোই সন্ত সুজান॥ ১॥

অমৃত কেরী মোটরী, সিরসে ধরী উতার।
জাহিঁ কহোঁ মৈঁ এক হৈ, মোঁহি কহৈ দো-চার ॥ ২ ॥

৭৪

ওগো কনে, তোমাকে স্বামীগৃহে যেতেই হবে। তবে কেন কান্নাকাটি কর, গান গাও কেন, কেনই বা বায়না ধর। সবুজ সবুজ চুড়ি পরেছ কেন, প্রেমের পোষাক পর। কবীর বলছে ভাইরে সাধু, শোন, প্রিয়তম ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

৭৪

ডুলহিনি তোহি পিয়কে ঘর জানা।
কাহে রোবো কাহে গাবো কাহে করত বহানা ॥
কাহে পহিরো্যা হরি হরি চুরিয়াঁ পহিরো্যা প্রেমকৈ বানা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, বিন পিয়া নাহি ঠিকানা ॥

৭৫

আমি ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছিলাম। প্রিয়তম আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়ে নিয়েছি তাঁর চরণ-কমলের অঞ্জন। যাতে আর ঘুম না আসে, শরীরে আলস্য না লাগে তাই করব। প্রিয়তমের কথা সে যে প্রেমের সমুদ্র তাতেই আমি স্নান করতে যাই। জন্ম জন্মান্তরের পাপ এক মুহূর্তে ধুয়ে ফেলব। এই দেহকেই করব জগতের দীপ, তাতে দেব প্রীতির সলতে। আর পঞ্চতত্ত্বের তেল দিয়ে ব্রহ্ম-অগ্নিতে জ্বালিয়ে নেব। আমাকে পেয়ালা ভরে প্রেমসুধা পান করিয়ে প্রিয়তম ও মত্ত হয়ে তা পান করে নিলেন। বিরহ আগুনে দেহ জ্বলে পুড়ে গেল আর কিছুই ভাল লাগে না। আমি সেই উঁচু অট্টালিকার উপর চড়ে বসেছি সেখানে কালের গতি নেই। কবীর বিচার করে বলছে সেখানে আমাকে দেখে যমও ভয় পায়।

৭৫

সূতল রহলূ মৈঁ নঁীদ ভরি হো, পিয়া দিহলৈঁ জগায়।
চরণ-কঁবলকে অঞ্জন হো নৈনা লে লূঁ লগায়া ॥
জাসোঁ নিঁদিয়া ন আবৈ হো নহি তন অলসায়।
পিয়াকে বচন প্রেম-সাগর হো, চলূঁ চলী হো নহায় ॥

জনম জনমকে পাপরা ছিনমে ডারব ধোরায়।
যহি তনকে জগ দীপ কিয়ৌ প্রীত বতিয়া লগায় ॥
পাঁচ তত্তকে তেল চুআএ ব্রহ্ম অগিনি জগায়।
প্রেম-পিয়ালা পিয়াইকে হো পিয়া পিয়া বৌরায় ॥
বিরহ অগিনি তন তলফৈ হো জিয় কছু ন সোহায় ॥
উঁচ অটরিয়া চঢ়ি বৈঠ লূ হো জহঁ কাল ন জায়।
কহৈঁ কবীর ৰিচারিকে হো জম দেখ ডরায় ॥

৭৬

হে রাম, হে আমার প্রিয়, আর আমি তোমাকে যেতে দেব না। তোমার যেমন করে ভাল লাগে তেমনি করে আমার হও। বহুকালের পর হরিকে পেয়েছি। আমার বড় ভাগ্য। ঘরে বসেই ছিলাম তবু তিনি এসেছেন। চরণ পাবার জন্য পাগল হয়ে ছিলাম। এবার তাঁকে প্রেম-প্রীতির বাঁধনে আটকে রাখব। (হে প্রিয়,) আমার এই মন-মন্দিরে নিরত ভালভাবে থাক। কবীর বলছে আর ধোকাতে পড়ো না।

৭৬

অব তোঁহি জান ন দৈহূঁ রাম পিয়ারে,
জ্যুঁ ভাৱৈ ত্যূঁ হোহ হমারে ॥
বহুত দিননকে বিছুরে হরি পায়ে,
ভাগ বড়ে ঘর বৈঠেঁ আয়ে।
চরননি লাগি করোঁ বরিয়াঈ,
প্রেম-প্রীতি রাখোঁ উরঝাঈ।
ইত মন-মন্দির রহৌ নিত চোষৈ,
কহৈ কবীর পরহু মতি ঘোষৈ ॥

৭৭

ভাইরে নামের নেশা কখনো ঘুচে না। অন্য নেশা ক্ষণে ক্ষণে চড়ে আর কমে কিন্তু নামের নেশা দিন দিন সওয়াগুণ করে বাড়তে থাকে। নামের দিকে দৃষ্টি দিলে নেশা বাড়ে, নাম শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে ৰায়, আমার নাম স্মরণ করলেই শরীর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পেয়ালা

ভরে যে পান করে নাম-রস সে মাতাল হয়ে যায়। যে নাম পেয়েছে তার দুটানার ভাব ঘুচে গেছে। যে নামের অমল রস একটু চেখেছে গণিকা হোক আর সদন কসাই হোক সে তরে গেছে। কবীর বলছে বোবার গুড় খাওয়ার মত ভাষা নেই ত এই নামের বড়াই করব কি করে।

৭৭

নাম অমল উতরৈ না ভাঈ।
ঔর অমল ছিন ছিন চঢ়ি উতরৈ,
নাম-অমল দিন বঢ়ৈ সরাঈ॥
দেখত চঢ়ৈ সুনত হিয় লাগৈ, সুরত কিয়ে
তন দেত ঘুমাঈ।
পিয়ত পিয়ালা ভয়ে মতৱালা,
পায়ো নাম মিটী দুচিতাঈ।
জো জন নাম অমল রস চাখা,
তর গঈ গণিকা সদন কসাঈ[১]।
কহ কবীর গূঁগে গুড় খায়া বিন রসনা
কা করৈ বড়াঈ॥

৭৮

আমার দুষ্টা ননদিনী জেগে রয়েছে। কুমতির লাঠি দিনরাত উচিয়ে আছে। সুমতিকে দেখলে তার ভাল লাগে না। নিশিদিন আমি প্রভুর নাম নি। রহি রহি আমার চিত্তে রং লাগে। দিনরাত সখীদের সঙ্গে

১ "সদন ভক্ত ছিলেন জাতিতে কসাই। ভক্তমালে আছে, তাঁর মাংস বিক্রয় করিবার তুলাদণ্ডে ওজনের জন্য একটি শালগ্রাম থাকিত। শালগ্রামের এই দুর্গতি দেখিয়া এক সাধু তাহা প্রার্থনা করেন। সদন তৎক্ষণাৎ সাধুকে শিলাটি দেন। রাত্রে সাধু স্বপ্ন দেখেন দেবতা বলিতেছেন আমাকে সেই সদনের বাড়ী রাখিয়া আইস। আমি তাঁর সহজভাবে ভক্তিতে মুগ্ধ। সাধু তাহাই করিলেন।

কেমন করিয়া কাম-ক্রোধ জয় করিয়া দেহ-দুঃখ সহ্য করিয়া সদন ধর্মজীবনে অগ্রসর হন সে কথা ভক্তমালে আছে। পরিশেষে পুরীধামে জগন্নাথ দেব স্বয়ং তাহাকে আপনার আসনে ডাকিয়া লন।"

ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা পৃ: ৫৩, ৫৪

খেলা করে কাটিয়েছি তাই আমার বড় ভয় করছে। আমার প্রভুর উঁচু অট্টালিকা। তার উপরে উঠতে গেলে আমার প্রাণ কাঁপে। তবে সুখ চাইলে লজ্জা ছাড়তে হবে, প্রিয়তমের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে হ'বে। ঘোমটা খুলে ফেল; সর্ব অঙ্গ দাও উপহার; নয়নে কর আরতি-সজ্জা। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন, যে চতুর সে-ই জানে যার নিজ প্রিয়তমের আশা নেই সে-ই মিছিমিছি কাজল তৈরি করে।

৭৮

হমরী ননঁদ নিগোড়িন জাগে।
কুমতি লকুটিয়া নিসি-দিন ব্যাপৈ, সুমতি দেখি নহিঁ ভাবৈ।
নিসিদিন লেত নাম সাহবকো রহত রহত রঙ্গ লাগৈ।
নিসিদিন খেলত রহী সখিয়ন-সঙ্গ, মোহিঁ বড়ো ডর লাগৈ।
মোরে সাহবকী উঁচী অটরিয়া চঢ়তমেঁ জিয়রা কাঁপৈ।
জো সুখ চহৈ তো লজ্জা ত্যাগৈ, পিয়সে হিলি-মিলি লাগৈ।
ঘূঁঘট খোল অঙ্গ-ভর ভেঁটৈ, নৈন-আরতী সাজৈ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, চতুর হোয় সো জানৈ।
নিজ প্রীতমকী আস নহীঁ হৈ নাহক কাজর পারৈ।

৭৯

প্রিয়তমকে ছাড়া বিরহিনী কেমন করে বাঁচবে। ওগো, তোমরা এর কোনো একটা উপায় কর। দিনে তার আহার নেই, রাতেও ঘুম নেই। তার কাছে এক একটি প্রহর যেন এক একটি যুগ। সে সুন্দর ফাগ খেলা ছেড়ে চলে যায়, ছেড়ে চলে যায় ঘর বাড়ী, ধনদৌলত। বনে গিয়ে নাম জপ করে। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনেই তার সুখ। জল ছাড়া মাছ যেমন ছটফট্ করে তেমনি ছট্‌ফট করতে করতে সে ছুটে প্রিয়তমের দর্শনের জন্য। সেই প্রিয়তমের আকার নেই, নেই রূপ, নেই রেখা, তার সঙ্গে কে গিয়ে মিলিত হবে। ওগো সুন্দরী, আপন পুরুষের বিষয় যদি বুঝতে পার তা হ'লে দেখতে পাবে তিনি তোমার দেহেই নৃত্য করছেন। এইটে বুঝো যে শব্দ-স্বরূপী জীবই প্রিয়; সব ভুল জেদ ছেড়ে দাও। কবীর বলছে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যুগে যুগে তুমি আমি এক।

৭৯

কৈসেঁ জীৱেগী ৱিরহিনী পিয়া বিন, কীজে কৌন উপায়।
দিৱস ন ভূখ রৈন নহিঁ সুখ হৈ, জৈসে করি জুগ জাম।
খেলত ফাগ ছাঁড়ি চলু সুন্দর, তজ চলু ধন ঔ ধাম।
বন-খণ্ড জায় নাম লৌ লাৱো, মিলি পিয়সে সুখ পায়।
তলফত মীন বিনা জল জৈসে, দরসন লীজে ধায়।
বিনা অকার রূপ নহিঁ রেখা, কৌন মিলেগী আয়।
আপন পুরুষ সমঝিলে সুন্দরি, দেখো তন নিরতায়।
সব্দ সরূপী জিৱ পিৱ বূঝো ছাঁড়ো ভ্রমকী টেক।
কহৈঁ কবীর ঔর নহিঁ দূজা, জুগ জুগ হম-তুম এক॥

৮০

বিন্দু বিন্দু প্রেমরসে ভিজে গেছে চুনরী (বুঁটিদার ওড়না)। আপন প্রিয়তমের খোঁজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো তোর চুনরিয়া কি দিয়ে তৈরী; তার চারদিকে ঝুলছে কিসের ঝালর। পঞ্চতত্ত্বের তৈরি চুনরিয়া আর তাতে ঝুলছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয়তমের মহলে উঠে যা; দুয়ার খোলে গেছে। কবীরদাস তাই দেখে আনন্দে দোল খাচ্ছে।

৮০

ভীজৈ চুনরিয়া প্রেম-রস বূঁদন।
আরত সাজকে চলী হৈ সুহাগিন পিয় অপনেকো ঢূঁঢ়ন।
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনরিয়া কাহেকে লগে চারোঁ ফূঁদন।
পাঁচ তত্তকী বনী হৈ চুনরিয়া নামকে লাগে ফূঁদন।
চঢ়িগে মহল খুল গঈ রে কিবরিয়া দাস কবীর লাগে ঝূলন॥

৮১

আমি চলব আমার নিজের প্রভুর সঙ্গে। হাতে নেব নারকেল, মুখে দেব পানের খিলি। সীঁথি ভরে পরব মোতি। নীল ঘোড়ীর হলদে রঙের বাচ্চা। তার পিঠে চড়ে যাব। নদীর ধারে সদ্‌গুরুর দর্শন মিলবে। অবিলম্বে আমার জন্মের সংস্কার হয়ে যাবে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন, আমি দুই কূল উদ্ধার করে চল্‌লাম।

৮১

মৈ অপনে সাহব সঙ্গ চলী।
হাথমেঁ নরিয়ল মুখমেঁ বীড়া, মোতিয়ন মাঁগ ভরী।
লিল্লী ঘোড়ী জরদ বছেড়ী, তাপৈ চঢ়িকে চলী॥
নদী কিনারে সতগুর ভেঁটে, তুরত জনম সুধরী।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, দোউ কুল তারি চলী॥

৮২

গুরু আমাকে অজর সিদ্ধিঘোটা খাইয়ে দিয়েছেন। যেদিন থেকে গুরু আমাকে সিদ্ধিঘোটা খাইয়েছেন সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে, আমার সকল দু'টানার ভাব দূর হয়ে গেছে। অধর-কটোরায় নাম-ঔষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। এটি ব্রহ্মা বিষ্ণু খেতে পান নি ; শম্ভু এর খোঁজে জন্ম কাটালেন। কবীর বলছে সুরতি ধ্যানে বসে এ যে খেতে পারে সে-ই অমর হয়।

৮২

গুরু মোহিঁ ঘুঁটিয়া অজর পিয়াঈ।
জবসে গুরু মোহিঁ ঘুঁটিয়া পিয়াঈ, ভঈ সুচিত মেটী দুচি-তাঈ।
নাম-ঔষধী অধর-কটোরী, পিয়ত অঘায় কুমতি গঈ মোরী।
ব্রহ্মা-বিস্নু পিয়ে নহিঁ পায়ে, খোজত সম্ভূ জন্ম গঁবায়ে।
সুরত নিরত করি পিয়ৈ জো কোঈ, কহৈঁ কবীর অমর
হোয় সোঈ॥

৮৩

আমার চোখ সেয়ানা হয়ে গেছে। আমার দেওর ননদ শ্বশুর এঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেখানে আছে প্রিয়তম শ্রীহরি সেখানে চলে গেছে। আমার ছেলেমানুষি সব কাজ। ভাগ্যগুণে তার বাঁধন কেটে গেছে। দয়া করে তিনি আমার হাত ধরে নিজের কাছে নিয়েছেন। জলের বিন্দু থেকে যিনি পিণ্ড (শরীর) সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে অধিক প্রীতি হ'ল। কবীরদাসের তাঁর প্রতি ক্ষণেকের জন্যও প্রেম জন্মাল না। তবু তাঁর প্রীতি দিন দিন নব নব রূপে দেখা দিচ্ছে।

৮৩

মেরী অঁখিয়াঁ জান সুজান ভঈ।
দেবর ননদ সুসর সঙ্গ তজি করি, হরি পীর তহাঁ গঈ॥
বালপনৈকে করম হমারে, কাটে জানি দঈ।
বাঁহ পকরি করি কিরপা কীন্হীঁ, আপ সমীপ লঈ॥
পানীকী বূঁদসে জিনি প্যঁড সাজ্যা, তা সঙ্গি অধিক রঈ।
দাস কবীর পল প্রেম ন ঘটঈ, দিন দিন প্রীতি নঈ॥

৮৪

এইভাবে রামের প্রতি প্রীতি কর। চরণরূপ পাখার উপর ভর করে নৃত্য কর। জিহ্বা ছাড়া (মুখে উচ্চারণ না করে, সহজে) গুণগান কর। যেখানে স্বাতি নক্ষত্রে পড়া জলবিন্দু নেই, ঝিনুক নেই, সমুদ্র নেই সেখানে সহজে উৎপন্ন মোতি তোমার আছে। এই সহজ মোতির জল দিয়ে তোমার পবন ও আকাশ (প্রাণায়াম ও সমাধি) ধুয়ে নাও। এমন একটি স্থান আছে যেখানে পৃথিবী বর্ষণ করে আর আকাশ সিক্ত হয়; চন্দ্রসূর্য যেখানে মিলিত হয়; যেখানে দুইয়ে মিলে জড়াজড়ি করে আর হাঁস খেলা করে বেড়ায়। এক বৃক্ষের ভিতর নদী বয়ে চলেছে; সেই নদী একটি কনক কলসে গিয়ে পড়ছে। সেই বৃক্ষের উপর পাঁচটি শুকপাখী এসে বসেছে আর তাতে প্রসন্ন হয়েছে বনরাজি। যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে সেখানে সংলগ্ন হও; আকাশে গিয়ে বস, ভক্তকবীর পথিক। সে পথ চিনে নিয়েছে। সেই পথের কথা বলছে।

৮৪

ইহি বিধি রামসূঁ ল্যৌ লাই।
চরণ পাযৈ নিরতি করি, জিভ্যা বিনা গুণ গাই।
জহাঁ স্বাঁতি বূঁদ ন সীপ সাইর, সহজি মোতী[১] হোই।
উন মোতিয়ন মৈঁ নীর পোয়ৌ পৱন অম্বর ধোই।

[১] মোতী—বিরহের অশ্রু।

জহাঁ ধরনি[২] বরষৈ গগন[৩] ভীজৈ, চন্দ[৪]-সূরজ[৫] মেল।
দোই মিলি তহাঁ জুড়ন লাগে, করত হংসা কেলি।
এক বিরষ[৬] ভীতরি নদী[৭] চালী, কনক কলস[৮] সমাই।
পঞ্চ সুরটা[৯] আই বৈঠে, উদৈ ভঈ বনরাই।
জহাঁ বিছুট্যো তহাঁ লাগ্যো, গগন বৈঠো জাই।
জন কবীর বটাউরা, জিনি মারগ লিয়ৌ চাই।

৮৫

সখিরে, স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য যত্ন কর। ছোটবড় পুতুল, খেলার কুলোটুলো ছোট মেয়ের এইসব খেলার জিনিষ ফেলে দে। দেবতা, পিতৃগণ, স্থানীয় দেবতা, মা ভবানী এঁদের পূজো—এ হচ্ছে চৌরাশী যোনিতে ভ্রমণের পথ। উঁচু মহল, তার ছাতের উপর রয়েছে আজব রঙ্গের কামরা। সেখানে আছে আমার স্বামীর পুষ্পশয্যা। তনু মন ধন সব ওখানেই অর্পণ কর। সুরতির কথা স্মরণ কর। পায়ে পড় প্রিয়তমের। কবীর বলছে হে হংস (জীব), নির্ভয় হও। তালা খোলার চাবি কোন্‌টি তা তোমাকে বলে দিলাম।

৮৫

করো জতন সখী সাঁঈ মিলনকী।
গুড়িয়া গুড়বা সূপ সুপলিয়া,
তজি দে বুধি লরিকৈয়াঁ খেলনকী।
দেবতা পিত্তর ভূইয়াঁ ভবানী
যহ মারগ চৌরাসী চলনকী।

---

২ ধরনি—মূলাধার।
৩ গগন—সহস্রার।
৪ চন্দ—ব্রহ্মরন্ধ্র, ইড়া নাড়ী
৫ সূরজ—নাভির উপরের মণিপুর পদ্ম, পিঙ্গলা নাড়ী।
৬ বিরষ—বৃক্ষ, শরীর।
৭ নদী—কুলকুণ্ডলিনী।
৮ কনক কলস—সহস্রার।
৯ পঞ্চ সুরটা—পঞ্চ প্রাণ।

উঁচা মহল অজব রঙ্গ বঙ্গলা,
সাঁঈঁ কী সেজ ৱহাঁ লগী ফুলনকী।
তন মন ধন সব অপনি কর ৱহাঁ,
সুৱথ সম্‌হার পরু পইয়াঁ সজনকী।
কহৈঁ কবীর নির্ভয় হোয় হংসা,
কুঁজী বতা দ্যোঁ তালা খুলনকী॥

৮৬

প্রিয় আমার জেগে রয়েছেন, আমি কি করে ঘুমিয়ে পড়লাম। পাঁচজন সখী আমার সঙ্গিনী। তাদের রঙ্গেই আমার রঙ্গ লেগেছে; প্রিয়তমের রঙ্গ ত লাগল না। আমার সেয়ানা শাশুড়ী, ননদ এবং জা এদের ভয়ে আমি প্রিয়তমের মর্ম জান্‌তে পারি নে। দ্বাদশের উপর রয়েছে শয্যা বিছান। তার উপর আমি উঠ্‌তে পারি নে। সেই লজ্জায় মরে যাই। দিনরাত আমার বুকে ব্যথা (বিরহের) বাজে কিন্তু আমি না পেলাম তাঁর (প্রিয়ের) কথা শুন্‌তে, না জান্‌তে পারলাম তাঁর সঙ্গসুখ কেমন। কবীর বলছে, ওগো আমার সেয়ানা সখি, শোন কথা, সদ্‌গুরু বিনা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হয় না।

৮৬

পিয়া মেরা জাগে মৈঁ কৈসে সোঈ রী।
পাঁচ সখী মেরে সঙ্গকী সহেলী,
উন রঙ্গ রঙ্গী পিয়া রঙ্গ ন মিলী রী।
সাস সয়ানী ননদ-দ্যোরানী,
উন ডর ডরী পিয় সার ন জানী রী।
দ্বাদস[১] উপর সেজ বিছানী,
চঢ় ন সকৌঁ মারী লাজ লজানী রী।
রাত দিৱস মোহিঁ কূকা মারে,
মৈঁ ন সুনী রচি নহি সঙ্গ জানী রী।
কহৈঁ কবীর সুনু সখী সয়ানী,
বিন সতগুরু পিয়া মিলে ন মিলানী রী॥

১ দ্বাদস—১০ ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি এই দ্বাদশ।

৮৭

হে রাম, বহুকাল ধরে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে, মনে একটুও সুখ নেই। হে রাম, তোমার দর্শনের জন্য বিরহিনী উঠে দাঁড়াচ্ছে আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে। মরবার পর তুমি যে দর্শন দেবে তা কোন্ কাজে লাগ্‌বে। কবীর বল্‌ছে, হে রাম, মরবার পর তোমায় পেতে চাইনে। সব লোহা যদি পাথরই হয়ে যায় তাহ'লে স্পর্শমণি কোন্ কাজে আস্‌বে। কবীর বলছে রামকে ছেড়ে দিনে সুখ নেই, সুখ নেই রাতে, স্বপ্নে সুখ নেই, রোদে সুখ নেই, ছায়াতেও সুখ নেই।

৮৭

বহুত দিননকী জোৱতী, বাট তুম্‌হারী রাম।
জিৱ তরসৈ তুঝ মিলনকূঁ, মনি নাহীঁ বিসরাম॥ ১॥
বিরহিনি উঠৈ ভী পড়ে, দরসন কারনি রাম।
মূৱা পীছে দেহুগে, সো দরসন কেহি কাম॥ ২॥
মূৱা পীছে জিনি মিলৈ, কহৈ কবীরা রাম।
পাথর-ঘাটা-লোহ সব, পারস কৌণৈঁ কাম॥ ৩॥
বাসরি সুখ না রৈঁণি সুখ, না সুখ সুপিনৈ মাহি।
কবীর বিছুট্যা রামসূঁ, নাঁ সুখ ধূপ ন ছাঁহি॥ ৪॥

৮৮

পাহাড়ে পাহাড়ে আমি ঘুরে মরেছি, কেঁদে কেঁদে চোখ খুইয়েছি। কিন্তু যাতে করে প্রাণ বাঁচে সে জড়ি পাইনি। আমার চোখ জ্বলে গেল, প্রতিক্ষণে তোমাকে চেয়েছি। না পেলাম তোমাকে, না হ'লাম খুশি, এমনি আমার বেদনা। সকল সংসার সুখী। লোকে খায় দায় আর ঘুমোয়। দুঃখী শুধু কবীরদাস। সে জেগে থাকে আর কাঁদে।

৮৮

পরবতি পরবতি মৈঁ ফির্‌য়া, নৈন গঁৱাএ রোই।
সো বূটী পাউঁ নহীঁ, জাতৈ জীৱন হোই॥ ১॥
নৈঁন হমারে জলি গএ, ছিন ছিন লোড়ৈ তুজ্ঝ।
নাঁ তূঁ মিলৈ ন মৈঁ খুসী, ঐসী বেদন মুজ্ঝ॥ ২॥

সুখিয়া সব সংসার হৈ, খায়ে অরু সোৱৈ ॥
দুখিয়া দাস কবীর হৈ, জাগৈ অরু রোৱৈ ॥ ৩ ॥

৮৮

না আসতে পারলাম তোমার কাছে, না পারলাম তোমাকে ডেকে পাঠাতে। বিরহে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তুমি এমনি আমার প্রাণ নিয়ে নেবে। এই দেহ পুড়িয়ে ছাই করব, সেই আগুনের ধোঁয়া গিয়ে পৌঁছবে স্বর্গে। সেই রাম যেন দয়া না করেন। তিনি যেন বর্ষণ করে এই আগুন নিবিয়ে না দেন। এই দেহ পুড়িয়ে কালি বানাব। সেই কালি দিয়ে লিখব রামের নাম। বুকের পাঁজর দিয়ে বানাব কলম আর লিখে লিখে রামকে পাঠাব। এই দেহকে করব প্রদীপ আর আমার প্রাণকে করব তার পল্‌তে। রক্ত হবে তেল; তা দিয়ে সিক্ত করব সেই পলতে। এই প্রদীপের আলোতে কবে আমার প্রিয়তমের মুখ দেখব। হয় বিরহিণীকে মৃত্যু দাও, নয় নিজেকে দেখাও। অষ্ট প্রহরের দহন এ যে আমি সহ্য করতে পারছি নে।

৮৯

আই ন সকৌঁ তুজ্‌ঝপৈ, সকূঁ ন তুজ্‌ঝ বুলাই।
জিয়রা যৌহী লেহুগে, ৱিরহ তপাই তপাই ॥ ১ ॥
যহু তন জালোঁ মসি করূঁ, জ্যূঁ ধূৱা জাই সরগ্‌গি।
মতি ৱৈ রাম দয়া করৈ, বরসি বুঝাৱৈ অগ্‌গি ॥ ২ ॥
যহু তন জালোঁ মসি করোঁ, লিখোঁ রামকা নাউঁ।
লেখণি করূঁ করংককী, লিখি লিখি রাম পঠাউঁ ॥ ৩ ॥
ইস তনকা দীৱা করৌ, বাতী মেলূঁ জীৱ।
লোহী সীঞ্চোঁ তেল জ্যূঁ, কব মুখ দেখৌঁ পীৱ ॥ ৪ ॥
কৈ বিরহিনকূঁ মীঁচ দে, কৈ আপা দিখলাই।
আঠ পহরকা দাঝণাঁ, মোপৈ সহা ন জাই ॥ ৫ ॥

৯০

সব দুনিয়া সেয়ানা আর আমি পাগল। আমি বিগড়েছি কিন্তু আর কেউ যেন না বিগড়ায়। আমি পাগল নয়, রামই আমাকে পাগল করে দিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় আমার ভ্রম দূর হয়ে গেছে। লেখাপড়া শিখিনি,

বিচার বিতর্ক জানিনে। হরিগুণ কীর্ত্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্ত্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি। কাম ক্রোধ এই দু'টি বিকৃত হয়েছে। সংসারটা নিজে নিজেই জ্বলে যাচ্ছে। মিষ্টি কোথায়, না, যার যা ভাল লাগে তাই মিষ্টি। তবে কবীরদাস রামগুণ গান করছে।

৯০

সব দুনী সয়ানী মৈঁ বৌরা,
হম বিগরে বিগরৌ জনি ঔরা।
মৈঁ নহিঁ বৌরা রাম কিয়ো বৌরা,
সতগুরু জার গয়ৌ ভ্রম মোরা।
বিদ্যা ন পঢ়ূঁ, বাদ নহিঁ জাঁনূঁ,
হরি গুন কথত-সুনত বৌরাঁনূঁ॥
কাম-ক্রোধ দোউ ভয়ে বিকারা,
আপহি আপ জরৈঁ সংসারা॥
মীঠো কহা জাহি জো ভাবৈ
দাস কবীর রাম গুন গাবৈ॥

৯১

আকাশের আড়ালে রয়েছে লক্ষ্য। ডান দিকে সূর্য, বাঁয়ে চন্দ্রমা, তাদের মাঝখানটাই আড়াল করা হয়েছে। দেহ ধনু, সুরতি তার ছিলা; তাতে লাগান হয়েছে শব্দ-বাণ। বাণ মারল। তাতে দেহ বিদ্ধ হ'ল। এই সদ্‌গুরুর আদেশ। বাণ মারল তবু শরীরে ঘা হ'ল না। এ আঘাত কেমন যার লাগে সে-ই জানে। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোনো, যে জেনেছে সে-ই বুঝেছে।

৯১

গগনকী ওট নিসানা হৈ।
দহিনে সূর চন্দ্রমা বায়েঁ, তিনকে বীচ ছিপানা হৈ।
তনকী কমান সুরতকা রোদা, সব্দ-বান লে তানা হৈ।
মারত বান বেধা তন হী তন, সতগুরুকা পরৱানা হৈ।

মারো্যা বান ঘার নহিঁ তনমেঁ, জিন লাগা তিন জানা হৈ ॥
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, জিন জানা তিন মানা হৈ ॥

৯২

ওহে অভিমানী, ভেবে চিন্তে দেখো তোমার এই চাদর পুরোণো হয়ে গেছে। সংসার একে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে আর তুমি তাই জোড়াতালি দিয়ে গায়ে জড়িয়েছ। পাপের দ্বারা, লোভ-মোহের দ্বারা তুমি একে ময়লা করে দিয়েছ। এতে না লাগালে জ্ঞানের সাবান, একে না ধুলে ভাল জলে। এইটে পরেই সারা জীবন কাটিয়ে দিলে। ভালমন্দ কিছুই দেখলে না। এর জন্য তোমার যত শঙ্কা, একে মনে কর তোমার জানপ্রাণ। এটিই তোমার মান সম্মান। কিন্তু জিনিষটা যে অন্যের। কবীর বলছে একে এখন যত্ন করে ধরে রাখ। কেননা, একবার হারালে আর একে দখল করতে পারবে না।

৯২

সোচ-সমুঝ অভিমানী, চাদর ভঈ হৈ পুরানী।
টুকড়ে টুকড়ে জোড়ি জগত-সোঁ, সীকে অঙ্গ লিপটানী।
কর ডারী মৈলী পাপন-সোঁ, লোভ-মোহমেঁ সানী।
না যহি লগ্যো জ্ঞানকৈ সাবূন, ন ধোঈ ভল পানী।
সারী উমির ওঢ়তে বীতি, ভলী বুরী নহিঁ জানী।
সংকা মান জান জিয় অপনে, য়হ হৈ চীজ বিরানী।
কহত কবীর ধরি রাখু জতনসে, ফের হাথ নহিঁ আনী ॥

৯৩

ওরে আমার চিত্ত উদাস হয়ে ফিরছে। রামকে পাইনি তবু আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল না। আজ আমার আর কি আশা আছে। যেখানে যেখানে যাই কোথাও কেউ রামকে পাওয়ার উপায় করে দেয় না। ওগো সন্ত, বলো দেখি কেমন করে আমার প্রাণ বাঁচে। আমার শরীর আমার এই দেহ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু এ আগুন কেউ নিভিয়ে দিচ্ছে না। আমি আগুনে পুড়ছি। রাতে আমার ঘুম নেই। চন্দন ঘসে ঘসে শরীরে লাগাই। রামের বিরহে আমি দারুণ দুঃখ পাচ্ছি। সৎসঙ্গে মতি আর মন স্থির করা রামকে পাওয়ার এই সহজ উপায়। এইটে জেনে কবীরদাস তারই সাধনা করছে।

৯৩

জিয়রা মেরা ফিরৈ রে উদাস।
রাম বিন নিকাসে ন জাঈ সাস,
অজহূঁ কৌন আস।
জহাঁ জহাঁ জাউঁ রাম মিলাবৈ ন কোঈ।
কহৌ সন্তো কৈসে জীবন হোঈ ॥
জরৈ সরীর যহু তন কোঈ ন বুঝাবৈ।
অনল দহৈ নিস নীঁদ ন আবৈ ॥
চন্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউঁ।
রাম বিনা দারুণ দুঃখ পাউঁ ॥
সত-সঙ্গতি মতি মন করি ধীরা।
সহজ জানি ভজৈ রাম কবীরা ॥

৯৪

এখন আমি আর মাটির ঘরে থাকব না। এখন আমি গিয়ে হরির সঙ্গে একত্র থাকব। ভাঙ্গাটুটা ঘর, তার বেড়াও ঝর্ঝরে। মেঘ গর্জাচ্ছে। ভয়ে কাঁপছে আমার বুক। দশ দুয়ারে তালা লেগে গেল। দূরে যাওয়া আসা করা আমার পক্ষে কঠিন। চারদিকে চার পাহারা বসে গেছে। এদের জেগে থাকা অবস্থায়ই আমার ঘরে চুরি হয়ে গেছে। কবীর বলছে ওরে তুই শোন, সেই ভাঙ্গে সেই গড়ে আর সেই সাজায়।

৯৪

ইব ন রহূঁ মাটীকে ঘর[১] মৈঁ,
ইব মৈঁ জাই রহূঁ মিলি হরি মৈঁ ॥
ছিনহর ঘর অরু ঝিরহর টাটী
ঘন গরজন কঁপৈ মেরী ছাতী ॥
দসবৈ দ্বারি লাগি গঈ তারী
দূরি গবন আবন ভয়ৌ ভারী ॥

---

১ মাটীকে ঘর—মাটির দেহ।

চহুঁ দিসি বৈঠে চারি পহরিয়া[১]
জাগত মূসি গয়ে মোর নগরিয়া ॥
কহৈ কবীর সুনহু রে লোঈ,
ভাঁনড় ঘড়ণ সংৱারণ সোঈ ॥

৯৫

বিছানায় শুয়ে থাকি, চোখে দেখতে পাইনে। হে দয়াল, বহু দুঃখ আমার, তার কথা কা'কে বল্‌ব। শাশুড়ী আমায় দুঃখ দেন, শ্বশুর ভালবাসেন। ভাসুরের দয়াকে আমি বড্ড ভয় করি। আমার সুন্দরী ননদ বড়ই অহংকারী। হে দয়াল, আমি দেবরের বিরহে বড়ই কাতর। বাপ আমার সবার সঙ্গে লড়াই করে, মা প্রমত্ত। নিজের ভাইকে নিয়ে চিতায় চড়েছি। তবে ত প্রিয়ের পিয়ারী হ'ব। মনে মনে ভেবে চিন্তে দেখ। শুভযোগ এসে পড়েছে। কবীর বল্‌ছে, ওগো সুন্দরী, আমার পরামর্শ শোন, রাজা রামের অনুরাগিণী হও।

৯৫

সেজৈঁ রহূঁ নৈন নহীঁ দেখৌঁ
বহু দুখ কাসোঁ কহূঁ হো দয়াল ॥
সাসুকী দুখী সুসরকী প্যারী
জেঠকৈ তরসি ডরোঁ রে।
ননদ সুহেলী গরব গহেলী
দেৱরকৈ ৱিরহ জরোঁ হোঁ দয়াল।
বাপ সবনকৌ করৈ লরাঈ
মায়া সোউ মতৱালী ॥
সগৌ ভঈয়া লৈ সলি চঢ়ি হূঁ
তব হ্বৈ হূঁ পীয়হি পিয়ারী ॥

---

১ চারি পহরিয়া—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চার পাহারা।

সোচি বিচারি দেখৌ মন মাঁহী
ঔসর আই বনূঁ্য রে ॥
কহৈ কবীর সুনহু মতি সুন্দরি
রাজা রাম রমূঁ রে ॥

৯৬

ওরে মাতাল পেয়ালা ভরে নামের অমৃতরস পান করে নে। সমস্ত ছেলেবেলাটা কাটিয়ে দিলি খেলা করে। তারপরে যখন তরুণ হ'লি তখন হ'লি নারীর বশ। তারপরে হ'লি বৃদ্ধ। বাতে আর কফে ধরল, বিছানা নিলি। এখন আর একটু নড়তে চড়তেও পারিস না।

নাভিকমলের মধ্যে আছে কস্তুরী, তার গন্ধে বনে বনে ফিরে মৃগ। সদ্‌গুরু পাওনি বলেই এত দুঃখ পেলে। তোমার এই দেহের বৈদ্য পেলে না। মাতাপিতা বন্ধু স্ত্রীপুত্র কেউত তোমার সঙ্গে যেতে পারবে না। যতদিন বাঁচবে আশ্রয় নেবে গুরুর। ধন যৌবন দিন দশেকের বইত নয়। চৌরাশী যোনি ভ্রমণ থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাও তবে ব্যর্থ কামনার বেদনা ত্যাগ কর। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই শোন, তোমার নখ থেকে চুল পর্যন্ত বিষে ভরা।

৯৬

পীলে প্যালা হো মতৱালা, প্যালা নাম অমীরসকা রে।
বালপনা সব খেলি গঁৱায়া, তরুন ভয়া নারী বসকা রে।
বিরধ ভয়া কফ-বায়নে ঘেরা, খাট পড়া ন জায় খসকা রে।
নাভিকঁৱল বিচ হৈ কস্তূরী, জৈসে মিরগ ফিরে বনকা রে।
বিন সতগুরু ইতনা দুখ পায়া, বৈদ মিলা নহি ইস তনকা রে।
মাত পিতা বন্ধু সুত তিরিয়া, সঙ্গ নহী কোই জায় সকা রে।
জব লগ জীৱৈ গুরু গুত লেগা, ধন জোবন হৈ দিন দসকা রে।
চৌরাসী জো উবরা চাহে ছোড় কামিনাকা চসকা রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, নখ-সিখ পূর রহা বিসকা রে।

৯৭

ওরে ভোমরা, আমি না তোকে বনে বনে গন্ধ নিয়ে বেড়াতে বারণ করেছিলাম। একদিন কোনো লতায় আটকে পড়বি আর ছটফট করে প্রাণ দিবি। ফুলের বাগানে ছিল ভ্রমর। সেখানে ফুলের কলির গন্ধ নিয়ে বেড়াত। বাগানের আশা ছেড়ে দিয়ে সে ভ্রমর ত উড়ে চলে গেল।

৯৭

মৈঁ ভঁবরা[1] তোঁহি বরজিয়া, বন বন বাস ন লেয়।
অটকেগা কহুঁ বেলসে, তড়পি তড়পি জিয় দেয়॥ ১॥
বাড়ীকে[2] বিচ ভঁবর থা, কলিয়াঁ লেতা বাস।
সো তো ভঁবরা উড়ি গয়া, তজি বাড়ীকী আস॥ ২॥

৯৮

জাঁতা ঘুরছে দেখে কবীর কেঁদে ফেল্‌ল। দুই পাটের ভিতরে পড়লে কেউই অক্ষত থাকে না। ওরে ভাই বীর পথিক, অমনি করে অঝোরে কেঁদো না। যার জিনিষ ছিল সে নিয়ে নিয়েছে, দুদিনের জন্যই ত দিয়েছিল।

৯৮

চলতী চক্কী দেখিকে, দিয়া কবীরা রোয়।
দুই পট ভীতর আয়কে, সাবিত গয়া ন কোয়॥ ১॥
ভাঈ বীর বটাউআ, ভরি ভরি নৈন ন রোয়।
জাকা থা সো লে লিয়া, দীন্হা থা দিন দোয়॥ ২॥

৯৯

ওরে তোর সঙ্গে প্রিয়তমের মিলন হবে। এবার সরিয়ে দে ঘোমটার কাপড়। ওরে ঘটে ঘটে সেই প্রভুই বিরাজ করছেন। কাউকে কটু কথা বলো না। ধন যৌবনের গর্ব করো না। এই পাঁচরঙ্গা কাপড় মিথ্যা। শূন্য মহলের বাতিটি জ্বালিয়ে নাও। আশায় আশায় ভুলে থেকো না। যোগ সাধনা করে সেই রঙমহলে অমূল্য সম্পদ প্রিয়তমকে পেয়েছি। কবীর বলছে ভারী আনন্দ হ'ল রে, অনাহত ঢোল বাজ্‌ছে।

---

১ ভঁবরা—মুগ্ধজীব।
২ বাড়ী—সংসার।

৯৯

তোকো পীর মিলৈঙ্গে ঘূঁঘটকে পট খোল রে।
ঘট ঘটমেঁ রহী সাঈঁ রমতা, কটুক বচন মত বোল রে।
ধন জোবনকো গরব ন কীজৈ, ঝুঠা পঁচরঙ্গ চোল[১] রে।
সুন্ন মহলমেঁ দিয়না বার লে, আসাসোঁ মত ডোল রে।
জোগ জুগত সো রঙ্গ মহলমেঁ, পিয় পাঈ অনমোল রে।
কহৈঁ কবীর আনন্দ ভয়ো হৈ, বাজত অনহদ ঢোল রে।

১০০

ওহে মুরশিদ, নয়নের মধ্যেই আছেন নবী। তোমার চোখের কাল এবং শাদা অংশের মধ্যবর্ত্তী তারার পিছনে অনির্বচনীয় অলক্ষ্যভাবে ভগবান বর্তমান আছেন। আঁখির মধ্যে পক্ষ্ম শোভা পাচ্ছে আর পক্ষ্মের মধ্যে আছে দ্বার। সেই দ্বারে দূরবীন যে লাগাবে সেই ভব সাগরের পারে যেতে পারবে। শূন্য সহরে আমার বাস, অখণ্ড ভাবের উপলব্ধি হ'লে সেখানে যাওয়া যায়। কবীর প্রভুর নিত্য সঙ্গী। প্রভু তাকে শূন্য মহলে নিয়ে আসবেন।

১০০

মুরসিদ[২] নৈনোঁ বীচ নবী[৩] হৈ।
স্যাহ সপেদ তিলোঁ বিচ তারা, অবগতি অলখ রবী হৈ।
আঁখী মদ্ধে পাঁখী চমকে, পাঁখী মদ্ধে দ্বারা।
তেহি দ্বারে দুর্বীন লগাবৈ, উতরৈ ভবজল পারা।
সুন্ন সহরমে বাস হমারী তহঁ সরবঙ্গী জাবৈ।
সাহব কবীর সদাকে সঙ্গী, সব্দ মহল লে আবৈ॥

১০১

প্রিয়, তোমার উঁচু অট্টালিকা দেখতে চলেছি। অট্টালিকা উঁচু আর তার কিনারা পীত রঙ্গের। তাতে বাঁধা রয়েছে নামের দড়ি। চন্দ্র-

১ পঁচরঙ্গ চোল—শরীর।
২ মুরসিদ—গুরু, উপদেষ্টা।
৩ নবী—পয়গম্বর, রসূল।

সূর্যের মত দুই বাতি জ্বলছে আর মধ্যে গিয়েছে পথ। পাঁচ পঁচিশ এবং তিনে মিলে বানিয়েছে ঘর। এদের সর্দার হ'ল মন। মুনসী হ'লেন জ্ঞানের কতোয়াল। চারদিকে হাট বসেছে। ঘরের আটটি খণ্ড বা অংশ। দশ দরজা। তার নয়টিতেই কপাট দেওয়া। জানালায় বসে তাকিয়ে রয়েছে রূপসী নারী। তার মাথার উপরে সাজান রয়েছে ঝাঁপি পেটরা। কবীর বলছে ভাইরে সাধু শোন, গুরুর চরণ-বলিহারি যাই। সাধু সন্ত মিলে সওদা করেছে আর আনাড়ি মূর্খেরা পছ্‌তাচ্ছে।

১০১

পিয়া উচী রে অটরিয়া তোরী দেখন চলী।
উঁচী অটরিয়া জরদ কিনরিয়া, লগী নামকী ডোরী।
চাঁদ সুরজ সম দিয়না বরতু হৈ, তা বিচ ঝুলী ডগরিয়া।
পাঁচ[১] পচীস[২] তীন[৩] ঘর বনিয়াঁ, মনুয়াঁ হৈ চৌধরিয়া।
মুন্সী হৈ কুতৱাল জ্ঞানকো, চহুঁ দিস লাগী বজরিয়া।
আঠ মরাতিব[৪] দস দরাজা[৫] নৌমেঁ লগী কিৱরিয়া।
খিরকী বৈঠ গোরী চিতৱন লাগী, উপরাঁ ঝাঁপ ঝোপরিয়া।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, গুরুকে চরণ বলিহরিয়া॥
সাধ সন্ত মিলি সৌদা করি হৈঁ, ঝাঁখৈ মূরখ অনরিয়া॥

১০২

প্রভু আমার রংরেজ। রাঙিয়ে দিয়েছেন আমার চুনরী। কালীর রং উঠিয়ে দিয়ে তাতে লাগিয়েছেন মঞ্জিষ্ঠার রং। এই রং ধূলে যায় না রে বরং দিন দিন আরও সুন্দর হয়। ভাবের কুণ্ডে স্নেহের জল নিয়ে তা'তে প্রেমের রং গুলে দিয়েছেন। দুঃখের আঘাত দিয়ে দিয়ে তিনি সব ময়লা ঝেড়ে ফেলেছেন; আর নেড়ে নেড়ে খুব করে লাগিয়েছেন রং। আমার প্রভু আমার প্রিয়তম আমার চুনরী রাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত চতুর

---

১ পাঁচ—পঞ্চপ্রাণ।
২ পচীস—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।
৩ তিন—তিন গুণ
৪ আঠ মরাতিব—আট খণ্ড ; সপ্ত ধাতু এবং কেশ এই আট।
৫ দশ দররাজা—২ চোখ, ২ কান, ২ নাকের ছিদ্র, মুখ, মূত্রদ্বার, মলদ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র।

তিনি, পরম জ্ঞানী। ওঁর উপরেই আমার তনু, মন, ধন আর প্রাণ সব কিছুরই ভার দিয়ে দেব। কবীর বল্‌ছে ওগো রংরেজ, ওগো আমার প্রিয়, আমায় দয়া কর। শীতল চুনরী গায়ে দিয়ে, আমি আনন্দে ডুবে আছি, আমি পূর্ণকাম হয়েছি।

১০২

সাহেব হৈ রঙ্গরেজ চুনরী মেরী রঙ্গ ডারী॥
স্যাহী রঙ্গ ছুড়ায়কে রে দিয়ো মজীঠা রঙ্গ।
ধোএসে ছুটে নহঁী রে দিন দিন হোত সুরঙ্গ॥
ভাৱকে কুণ্ড নেহকে জলমেঁ প্রেম রঙ্গ দেহ বোর।
দুখ দেই মৈল লুটায় দে রে খূব রঙ্গী ঝকঝোর॥
সাহিবনে চুনরী রঙ্গী রে পীতম চতুর সুজান।
সব কুছ উনপর বার দূঁ রে তউ মন ধন ঔর প্রাণ॥
কহেঁ কবীর রঙ্গরেজ পিয়ারে মুঝপর হুএ দয়াল।
সীতল চুনরী ওঢ়িকে রে ভঈ হৌ মগন নিহাল॥

১০৩

সখি রে, খুঁজে খুঁজে কবীর আপনাকেই খুইয়ে ফেলেছে। বিন্দু সমুদ্রের মধ্যে মিশে গেছে, কি করে তাকে দেখা যাবে। সখি রে, খুঁজে খুঁজে কবীর আপনাকেই হারিয়ে ফেলেছে। সমুদ্র বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাকে কি করে খুঁজে বের করা যাবে।

১০৩

হেরত হেরত হে সখী, রহ্যা কবীর হিরাই।
বূঁদ সমানী সমঁদমেঁ, সো কত হেরী জাই॥ ১॥
হেরত হেরত হে সখী, রহ্যা কবীর হিরাই॥
সমঁদ সমানা বূঁদমেঁ, সো কত হের্যা জাই॥ ২॥

১০৪

সীমা ছেড়ে অসীমেতে পৌছালাম, শূন্যেতে স্নান করলাম। মুনিরা যেখানে জায়গা পান না সেখানে বিশ্রাম করলাম। কবীরের কর্মটি দেখ।

এ আর কিছু নয় জন্মান্তরের ললাট লিপি। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য সেই অলখ পুরুষকে করল বন্ধ।

১০৪

হদ্দ ছাঁড়ি বেহদ গয়া, কিয়া স্থন্নি অসনান।
মুনিজন মহল ন পাৱঈ, তহাঁ কিয়া বিশ্রাম॥ ১॥
দেখৌ কর্ম কবীরকা, কছু পূরব-জনমকা লেখ।
জাকা মহল ন মুনি লহৈঁ, সো দোসত কিয়া অলেখ॥ ২॥

১০৫

দেবালয় আছে কিন্তু তার ভিত নেই। দেবতা আছে কিন্তু তার দেহ নেই। তারই মধ্যে ঝুলছে কবীর আর সেবা করছে অলখের। দেবালয়ের আছে দরজা, তিলমাত্র তার বিস্তার। ওরই মধ্যে আছে পত্রপুষ্প, আছে জল, আর আছে পূজারী।

১০৫

নীর বিহূঁণা দেহরা, দেহ বিহূঁণা দেৱ।
কবীর তহাঁ ৱিলম্বিআ, করৈ অলখকী সেৱ॥ ১॥
দেৱলমাঁহৈঁ দেহুরী, তিল জে হৈ বিসতার।
মাহৈঁ পাতী মাঁহি জল, মাঁহৈ পূজণহার॥ ২॥

১০৬

অগম অগোচর যাহা গম্য নয় তাতে দীপ্তি পাচ্ছে জ্যোতি। কবীর বলছে এখানে যে প্রণাম জানায় তার পাপপুণ্য কিছুই থাকে না।

১০৬

অগম অগোচর গমি নহী, তহাঁ জগমগৈ জোতি।
জহাঁ কবীরা বন্দগী, পাপ-পুন্ন নহী হোতি॥ ১॥

১০৭

যা বলবার ছিল বলে দিয়েছি। এখন আর কিছু বলা যাবে না। দুই গিয়ে এক রয়েছে, লহরী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে। সমাধিতে মন লেগেছে; সে পৌছে গেছে শূন্যে। চাঁদ নেই, চাঁদনি রয়েছে (অখণ্ড জ্যোতি)। এমনি আমার প্রভু অলখ নিরঞ্জন। ঘন মেঘ করেছে। নেবেছে বাদল। গগন

গর্জাচ্ছে আর বর্ষণ করছে অমৃত। চারদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কবীরদাস ভিজে যাচ্ছে।

১০৭

কহনা থা সো কহ দিয়া, অব কছু কহা ন জায়।
এক রহা দূজা গয়া, দরিয়া লহর সমায়॥ ১॥
উনমুনিসোঁ মন লাগিয়া, গগনহিঁ পহুঁচা আয়।
চাঁদ-বিহূনা চাঁদনা, অলখ নিরঞ্জন রায়॥ ২॥
গগন গরজি বরসৈ অমী, বাদল গহির গম্ভীর।
চহুঁ দিসি দমকৈ দামিনী, ভীজৈ দাস কবীর॥ ৩॥

১০৮

ওরে এরা দুজনেই পথ পায় নি। হিন্দু আপন হিন্দুয়ানির বড়াই করে, ছুঁতে দেয় না জলের কলসী। কিন্তু শুয়ে থাকে বেশ্যার পায়ের তলায়। দেখ এই ত হিন্দুয়ানি। মুসলমানের পীর আউলিয়ারা মুর্গী মোরগ খায়, মাসতুতো বোনকে বিয়ে করে, নিজের ঘরেই করে বিয়ের সম্বন্ধ। বাইরে থেকে এক মৃত প্রাণী এনে ধুয়ে মুছে তাকেই দেয় দেবতার নামে উৎসর্গ করে। তারপর সব সখিতে ভোজে লেগে যায় আর তা নিয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ বড়াই করে। হিন্দুর হিন্দুয়ানি আর মুসলমানের মুসলমানি দেখে কবীর শুধাচ্ছে সাধুরে ভাই শোন, কোন্ রাস্তায় যাই বল দেখি।

১০৮

অরে ইন দুন রাহ ন পাঈ।
হিন্দূ অপনী করৈ বড়াঈ গাগর ছুবন ন দেঈ।
বেস্যাকে পায়ন-তর সোবৈ যহ দেখো হিন্দু আঈ।
মুসলমানকে পীর-ঔলিয়া মুর্গী মুর্গা খাঈ।
খালা কেরী বেটী ব্যাহৈ ঘরহিমেঁ করৈ সগাঈ।
বাহরসে ইক মুর্দা লায়ে ধোয়-ধায় চঢ়বাঈ।
সব সখিয়াঁ মিলি জেবন বৈঠী ঘর-ভর করৈ বড়াঈ।
হিন্দুনকী হিন্দুবাঈ দেখী তুরকনকী তুরকাঈ।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো কৌন রাহ হৈবে জাঈ॥

১০৯

ভাইরে, দুই জগদীশ্বর এল কোত্থেকে। কে তোদের ঘুরিয়ে মারছে কোথায়। আল্লা রাম করীম কৃষ্ণ এ সব ত হজরতেরই নাম। একই সোনা দিয়ে গয়না গড়ান হয়েছে, এর মধ্যে ত দুয়ের কথা নেই। ওরে পাপি, কিছু বলিসও না, কিছু শুনিসও না, নমাজ আর পূজা একই। সে-ই মহাদেব, সে-ই মহম্মদ, ব্রহ্মা আদম তাকেই বলে। একই জমির উপর বাস করছে, অথচ কাউকে বলা হচ্ছে হিন্দু কাউকে তুরুক। এ পড়ে বেদাদি গ্রন্থ, ও পড়ে কোরাণ। এ পাঁড়ে, ও মৌলানা। একই মাটির ভাঁড় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তার নাম। কবীর বলছে ওরা দুজনেই ভুল করছে। কেননা, কেউ-ই রামকে পায় নি। শুধু এ খাসি কাটছে আর ও গরু জবাই করছে। বৃথা নষ্ট হল এদের জীবন।

১০৯

(ভাঈ রে) দুঈ জগদীস কহাঁতে আয়া, কহু কবনে ভরমায়া।
অল্লহ-রাম-করীমা কেসো, (হরী) হজরত নাম ধরায়া॥
গহনা এক কনকতেঁ গঢ়না, ইনি মহঁ ভাব ন দূজা।
কহন-সুননকো দুর কর পাপিন, ইক নিমাজ ইক পূজা॥
বহী মহাদেব বহী মহম্মদ ব্রহ্মা-আদম কহিয়ে।
কো হিন্দু কো তুরুক কহাবৈ, এক জিমীপর রহিয়ে॥
বেদ-কিতেব পঢ়েঁ বে কুতুবা বে মোলনা বে পাঁড়ে।
বেগরি বেগরি নাম ধরায়ে এক মটিয়াকে ভাঁড়ে॥
কহঁহি কবীর বে দূনোঁ ভূলে, রামহিঁ কিনহু ন পায়া।
বে খস্‌সী বে গায় কটাবৈঁ বাদহিঁ জন্ম গঁবায়া॥

১১০

সন্ত, আমি দু'টি পথই দেখেছি। হিন্দু তুরুক আমি আলাদা মনে করি না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা। দুধ পানিফল এসব দিয়ে হিন্দু করে একাদশী ব্রত। অন্ন ত্যাগ করে কিন্তু চিত্ত নিরোধ করতে পারে না। জ্ঞাতিবন্ধু নিয়ে করে পারণ। আর তুরুক রোজা রাখে, নমাজ পড়ে, বিসমিল্লা বলে আজান দেয়। কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই মুরগী মারে। এর বেহেস্তে যাওয়া হবে কি করে। হিন্দু বলে 'দয়া' আর তুরুক বলে 'মেহর' কিন্তু নিজ শরীর থেকে

(অর্থাৎ কাজের বেলায়) দুজনেই একে ত্যাগ করেছে। কারণ, একজন করে হালাল আর একজন এক কোপে বলি দেয়। দুজনেরই ঘরে আগুন লেগেছে। হিন্দু আর তুরুকের একই রাস্তা। এইটেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ। কবীর বলছে, ওহে সন্ত, শোন, রাম না বলে খোদা বল্‌লে কিছু এসে যায় না।

১১০

সন্তো, রাহ দুনো হম ডীঠা।
হিন্দূ-তুরুক হটা নহিঁ মানৈঁ, স্বাদ সবন্হিকো মীঠা॥
হিন্দূ বরত-একাদসি সাধৈঁ, দূধ-সিংঘারা সেতী।
অনকো ত্যাগৈঁ মনকো ন হটকৈ, পারন করৈঁ সগোতী॥
তুরুক রোজা-নীমাজ গুজারৈঁ, বিসমিল বাঁগ পুকারৈঁ।
ইনকী ভিশ্‌ত কহাঁতেঁ হোইহৈ সাঁঝে মুরগী মারৈঁ॥
হিন্দুকী দয়া মেহর তুরুকনকী, দোনোঁ ঘটসোঁ ত্যাগী।
বে হলাল বে ঝটকে মারৈঁ আগি দুনা ঘর লাগী॥
হিন্দু-তুরুককী এক রাহ হৈ, সতগুরু ইহৈ বতাঈ।
কহঁহি কবীর সুনহু হো সন্তো, রাম ন কহেউ খুদাঈ॥

১১১

বান্দা, সেবাই তোর কাজ। আমি জানি হরিভজন ছাড়া আর সবই অনুচিত। দূরে অপরিচিত স্থানে যেতে হবে। এখানে ত থাক্‌বার জায়গা নেই। এখানে বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, গাঁঠে পয়সা কড়িও নেই। একা একাই চল্‌তে হবে, মাঝপথে বিশ্রাম করাও চলবে না। সংসার সাগর পার হওয়া বড় কঠিন। হরিনাম স্মরণ কর। কবীর বলছে সেই নগরে গিয়ে থাক্‌ব যেখানে রত্নভাণ্ডার আছে।

১১১

বন্দে তোহি বন্দিগীসোঁ কাম, হরি বিন জানি ঔর হরাম।
দূরি চলণাঁ কূঁচ বেগা ইহাঁ নহীঁ মুকাম॥
ইহাঁ নহীঁ কোঈ যার দোস্ত, গাঁঠি গরথ না দাম।
এক একৈঁ সঙ্গি চলণাঁ বীচি নহীঁ বিশ্রাম॥

সংসার-সাগর বিষম তিরণাঁ, সুমরি লৈ হরি-নাম।
কহৈ কবীর তহাঁ জাই রহণা নগর বসত নিধাঁন॥

১১২

ভাই বেদ কোরাণ মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে মনের চিন্তা যায় না। যে প্রাণকে সামান্য মাত্র স্থির করতে পারে স্বয়ং খোদা তার সামনে হাজির হন। ওরে বান্দা, নিজ হৃদয়ে খোঁজ কর্, রোজ বৃথা পরিশ্রম করে মরিস্ না। এই যে দুনিয়া এটা একটা সহর, একটা মেলা। এখানে হাত পাতিস না। সবাই মিথ্যা শাস্ত্র পড়ে পড়ে খুশি হয়, নিজের সম্বন্ধে অসাবধান থাকে আর যত বাজে কথা বলে। সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মূর্তির মধ্যে নেই। আকাশের মধ্যে একটা সমুদ্র ভাস্‌ছে। তাতে স্নান করিস না কেন। এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখ চেয়ে তিনি যেখানে সেখানে (সর্বত্র) উপস্থিত আছেন। পবিত্র আল্লার উপস্থিতিতে সব কিছুই পবিত্র। যদি অন্য কিছু থাকে তা'হলে শঙ্কা করা উচিত। কবীর বলছে দয়াময়ের (ভগবানের) কাজ যে করে সেই ওঁকে জানে।

১১২

বেদ-কতেব ইফতরা ভাঈ দিলকা ফিকর ন জাঈ।
টুক দম করারী জো করহু হাজির হজুর খুদাঈ॥
বন্দে খোজু দিল হর রোজ না ফিরি পরেসানী মাহিঁ।
ইহ জু দুনিয়া সহরু মেলা দস্তগীরী নাহিঁ॥
দরোগ পঢ়ি পঢ়ি খুসী হোই বেখবর বাদ বকাহি।
হক সচ্ছু খালক খলকম্যানে স্যাম মূরতি নাহিঁ॥
অসমান ম্যানে লহঁগ দরিয়া গুসল করদ ন বূদ।
করি ফিকরু দাইন লাই চসমে জহঁ তহাঁ মৌজূদ॥
অল্লাহ পাক পাক হৈ সক করো জো দূসর হোই।
কবীর কর্ম করীমকা উহু করে জানৈ সোই॥

১১৩

ওরে মন তুমি মিছিমিছি গোলমাল বাধিয়েছ। স্নান করে কাউকে ছোঁও না। ফুলপাতা দিয়ে পূজা কর দেবতার। নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে

তার কাছে দুনিয়া ফল চায়। এই দুনিয়া দেবালয়ে পূজা করে, করে তীর্থ ব্রত। চলাফেরাতেই পায়ে ব্যথা ধরে যায়, এ দুঃখ কোথায় রাখব। মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া। মিথ্যায় মিথ্যায় মিলে সব মিথ্যা করে দিয়েছে। বাঁঝা গাই দুধ দেয় না। মাখন কোথায় পাবে। সত্যের সঙ্গেই সত্য থাকে, মিথ্যাকে দেয় মেরে তাড়িয়ে। কবীর বলে যেখানে সত্য বস্তু রয়েছে সেখানে সহজেই তার দেখা পাওয়া যায়।

১১৩

মন তুম নাহক দুন্দ মচায়ে।
করি অসনান ছুবো নহিঁ কাহু, পাতী ফূল চঢ়ায়ে।
মূরতিসে দুনিয়া ফল মাঁগে অপনে হাথ বনায়ে।
যহ জগ পূজৈ দেব-দেহরা, তীরথ-ব্রর্ত-অন্হায়ে।
চলত ফিরতমেঁ পাঁব থকিত ভে, য়হ দুখ কহাঁ সমায়ে।
ঝূঠী কায়া ঝূঠী মায়া, ঝূঠে ঝূঠে ঝূঠল খায়ে।
বাঁঝিন গায় দূধ নহিঁ দেহৈ, মাখন কহঁসে পায়ে।
সাঁচেকে সঙ্গ সাঁচ বসত হৈ, ঝূঠে মারি হটায়ে।
কহৈ কবীর জহঁ সাঁচ বস্তু হৈ, সহজৈ দরসন পায়ে॥

১১৪

এই জগৎ অন্ধ, আমি বুঝাব কাকে। একজন দুজন হ'লে তাদের বুঝাতাম কিন্তু সবাই ভুলে রয়েছে আপন আপন পেটের ধান্ধায়। জলের ঘোড়া, পবন তার সোয়ার। একটু কাত হ'লেই শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়ে যায়। গভীর নদী, অতল তার প্রবাহ। মাঝি ফাঁদে পড়েছে। ঘরে যে বস্তু রয়েছে তার কাছে যায় না। অন্ধ বাতি জ্বালিয়ে চারিদিক খুঁজে বেড়ায়। আগুন লেগে সব বন জ্বলে গেল। গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান না পাওয়ার জন্য লোকটা ঘুরে মরছে। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, বান্দাকে একদিন লেঙ্গট পর্যন্ত ঝেড়ে ঝুড়ে চলে যেতে হবে।

১১৪

যহ জগ অন্ধা মৈঁ কেহি সমুঝারোঁ।
ইক-দুই হোয় উনৈহ্ সমুঝারো সব হী ভুলানা পেটকে ধন্ধা।

পানীকৈ ঘোড়া[১]পৱন অসৱৱৱা[২] ঢরকি পরৈ জস ওসকে বুন্দা।
গহিরী নদিয়া অগম বহৈ ঘরৱা খেৱনহারা[৩] পড়িগা ফন্দা॥
ঘরকী ৱস্তু নিকট নহিঁ আৱত দিয়না বারিকে ঢূঁঢ়ত অন্ধা।
লাগী আগ[৪] সকল বন জরিগা বিন গুরুজ্ঞান ভটকিয়া বন্দা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো ইকদিন জায় লঙ্গোটী ঝার বন্দা॥

১১৫

সীমার মধ্যে চলে মানুষ, অসীমের মধ্যে চলে সাধু। যে সীমা অসীম দুই ত্যাগ করে তার ভাব অতি গভীর।

১১৫

হদ চলে সো মানৱা, বেহদ চলে সো সাধ।
হদ বেহদ দোউ তজে, তাকর মতা অগাধ॥

১১৬

উল্টে আপনার মধ্যে প্রবেশ করল। প্রকটিত হ'ল অনন্তজ্যোতি। প্রভু ভৃত্য একত্র হ'ল। নিয়ত চলছে বসন্তোৎসব। যোগী হ'ল, ক্ষণকালের জন্য পেল আভাস। দৃষ্টির বক্রতা গেল ঘুচে। উলটে প্রবেশ করল নিজের মধ্যে, হ'ল ব্রহ্মের সমান।

১১৬

উলটি সমানা আপমেঁ, প্রগটী জোতি অনন্ত।
সাহেব সেৱক এক সঙ্গ, খেলৈঁ সদা বসন্ত॥ ১॥
জোগী হুআ ঝলক লগী, মিটি গয়া ঐচাতান।
উলটি সমানা আপমেঁ, হূআ ব্রহ্ম সমান॥ ২॥

১১৭

এ লেখালেখির কথা নয়, এ হ'ল দেখাদেখির কথা। বর কনে মিলে গেল, ফিকে হয়ে গেল বরযাত্রীরা। কাগজ লেখে কাগজী। সে বিষয়ী

---

১ পানীকৈ ঘোড়া—ক্ষণভঙ্গুর শরীর।

২ পবন অসরররা—প্রাণ

৩ খেরনহারা—জীবাত্মা

৪ লাগী আগ—মোহের আগুন লেগেছে।

জীব। আত্মদৃষ্টির কথা লিখবে কিরূপে। যেদিকে দেখে সেদিকেই যে প্রিয়।

১১৭

লিখা লিখী কী হৈ নহীঁ দেখা দেখী বাত।
দুলহা দুলহিনি মিলি গয়ে, ফীকী পরী বরাত ॥ ১ ॥
কাগদ লিখৈ সো কাগদী, কী ব্যৱহারী জীৱ।
আতম দৃষ্টি কহা লিখৈ. জিত দেখৈ তিত পীৱ ॥ ২ ॥

১১৮

স্বপ্নে পেলাম প্রভুকে। ঘুম থেকে তিনি জাগিয়ে নিলেন। ভয়ে চোখ মেলি না পাছে স্বপ্ন যায় টুটে। প্রভুর অনেক গুণ। সব হৃদয়ের মধ্যে লিখে রাখি। ভয়ে জল খাইনা, পাছে ঐ লেখা যায় ধুয়ে।

১১৮

সুপনেমেঁ সাঈঁ মিলে, সোৱত লিয়া জগায়।
আঁখি ন খোলূঁ ডরপতা, মত সুপনা হ্বৈ জায় ॥ ১ ॥
সাঈঁকেরে বহুত গুন লিখে জো হিরদে মাঁহি।
পিউঁ ন পানী ডরপতা, মত বৈ ধোয়ে জাঁহি ॥ ২ ॥

১১৯

নারদ, প্রিয়ের থেকে আমার কোন ব্যবধান নেই। প্রিয় জেগে থাকলে আমিও জেগে থাকি, প্রিয় ঘুমুলে আমিও ঘুমুই। যে কেউ আমার প্রিয়কে কষ্ট দেয় আমি তাকে জড়েমূলে নষ্ট করি। য়েখানে আমার প্রিয়ের যশ গান করা হয় সেইখানে আমি বাসা বাঁধি। প্রিয় যখন কোথাও যান তখন আমি আগে উঠে ধেয়ে চলি প্রিয়ের আশায়। প্রিয়ের চরণে তীর্থের সীমা নেই, কোটি ভক্ত সেখানে স্থান পায়। কবীর বলছে প্রেমের মহিমা প্রেম বুঝিয়ে দেয়।

১১৯

নারদ, প্যার সো অন্তর নাহীঁ
প্যার জাগৈ তৌহী জাগূঁ প্যার সোৱৈ তব সোঁউ।
জো কোঈ মেরে প্যার দুখাৱৈ জড়া-মূলসো খোঁউ ॥

জহাঁ মেরা প্যার জস গাবৈ তহাঁ করৌ মৈঁ বাসা।
প্যার চলে আগে উঠ ধাউঁ মোহি প্যারকী আসা॥
বেহদ্দ তীরথ প্যারকে চরননি কোট ভক্ত সমায়।
কহৈঁ কবীর প্রেমকী মহিমা প্যার দেত বুঝায়॥

১২০

কাদার মধ্যে হারিয়ে গেছে তোর হীরা। কেউ খুঁজছে পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ জলে, পাথরের মধ্যে কেউ। কবীরদাস এই হীরা পরীক্ষা করে হৃদয়ের আঁচলে বেঁধে নিয়েছে।

১২০

তোর হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।
কোঈ ঢূঁঢ়ৈ পূরব কোঈ ঢূঁঢ়ৈ পচ্ছিম
কোঈ ঢূঁঢ়ৈ পানী-পথরেমে।
দাস কবীর যে হীরাকো পরখৈঁ
বাঁধ লিহলৈ জীয়রাকে অঁচরেমেঁ।

১২১

কবীর হেসে বল্‌লে সহজে সহজে সব গিয়েছে—সুত-বিত্ত-কামিনী-কাম সব। রামের সঙ্গে এক হয়ে মিলে রয়েছি। সহজ সহজ সবাই বলে কিন্তু সহজ কি, তা কেউ চিনে না। যে সহজের দ্বারা হরিকে পাওয়া যায় তাকেই সহজ বলে।

১২১

সহজৈ সহজৈ সব গয়ে সুত-ৱিত-কামিণি-কাম।
একমেক হ্বৈ মিলি রহ্যা হাসি কবীরা রাম॥
সহজ সহজ সব কোঈ কহৈ সহজ ন চীন্হে কোই॥
জিন্‌হ সহজৈ হরিজী মিলৈ, সহজ কহীজৈ সোই।

১২২

সন্ত কা'কে বলব ধোকার কথা। গুণের মধ্যে নির্গুণ, নির্গুণের মধ্যে গুণ এই পথ ছেড়ে লোকে কেন বাইরে যায়। সবাই বলে তিনি অজন্ম অমর। কিন্তু তিনি যে আবার অলখ এবং অবর্ণনীয়। তাঁর জাতি নেই,

স্বরূপ নেই, বর্ণ নেই কিন্তু ঘটে ঘটে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সবাই বলে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কথা। কিন্তু তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই। যিনি পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে রয়েছেন কবীর বলছে তিনিই হরি।

১২২

সন্তো, ধোখা কাসূঁ কহিয়ে।
গুনমৈঁ নিরগুন, নিরগুনমৈঁ গুন, বাট ছাড়ি কূঁ্য বহিরে।
অজরা-অমর কথৈ সব কোঈ অলখ ন কথণা জাঈ।
নাতি-স্বরূপ-বরণ নহি জাকে ঘটি ঘটি রহ্যৌ সমাঈ।
প্যণ্ড-ব্রহ্মণ্ড কথৈ সব কোঈ রাকৈ আদি অরু অন্ত ন হোঈ।
প্যণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ছাঁড়িজে কহিয়ে কহৈ কবীর হরি সোঈ॥

১২৩

নয়নের মধ্যে তুমি এস। যেমনি আসবে আমি নয়ন বন্ধ করে দেব। আমি আর কাউকে দেখব না বা আর কাউকেও তোমায় দেখতে দেব না। আমার মধ্যে আমার কিছু নেই। যা কিছু আছে সে সব তোমার। তোমার জিনিষ তোমাকে দেব সঁপে, এতে আমার কি এসে যাবে।

১২৩

নৈনা অন্তর আব তূঁ জ্যোহী নৈন ঝঁপেউ।
নাঁ হৌ দেখোঁ ঔরকূঁ না তুঝ দেখন দেউঁ॥
মেরা মুঝমেঁ কুছ নহীঁ জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝকো সৌপঁতাঁ, ক্যা লগ্‌গৈ হৈ মেরা॥

১২৪

আমার নিরঞ্জন আর আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরুক দুই নয়। আমি ব্রত রাখি না, মহরম কি জানিনা, নিদানকালে যে থাকে তাকে স্মরণ করি। পূজা করি না, নমাজ পড়ি না, হৃদয়ে এক নিরাকারকে নমস্কার করি। হজ্জেও যাইনা, তীর্থব্রতও করিনা। এককে চিনলে আর দুই কিসের। কবীর বলছে সব ভ্রম দূর হয়েছে; এক নিরঞ্জনে মন নিবিষ্ট হয়েছে।

১২৪

এক নিরঞ্জন অল্হ মেরা, হিন্দু তুরুক দহূঁ নহীঁ মেরা।
রাখূঁ ব্রত ন মহরম জানা, তিস হী সুমিরঁূ জো রহে নিদানা।
পূজা করঁূ ন নিমাজ গুজারঁূ, এক নিরাকার হিরদৈ নমস্কারঁূ।
না হজ জাঁউ ন তীরথ-পূজা, এক পিছাণ্যা তৌ ক্যা দূজা।
কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন-সূ মন লাগা।

১২৫

পুঁথি পড়ে পড়ে জগৎ মরে গেল কিন্তু কেউই পণ্ডিত হল না! প্রিয়তমের একটি অক্ষর যে পড়তে পারে সেই পণ্ডিত হয়ে যায়।

১২৫

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুৱা, পণ্ডিত ভয়া ন কোই।
একৈ আখির পীৱকা, পঢ়ৈ সু পণ্ডিত হোই॥

১২৬

দেহধারণ করাটাই দুঃখ। এই দুঃখ সবাইকে ভোগ করতে হয়। জ্ঞানী ভোগ করে জ্ঞানে আর মূর্খ ভোগ করে কেঁদে কেঁদে। লক্ষ্যের দিকে সব তাকিয়ে থাকে কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না। সব তীর শেষ হয়ে গেলে তখন ধনু ফেলে দিয়ে চলে যায়।

১২৬

দেহ ধরেকা দণ্ড হৈ, সব কাহূকো হোয়।
জ্ঞানী ভুগতৈ জ্ঞান করি, মূরখ ভুগতৈ রোয়॥১॥
তকত তকাবত তকি রহে, সকে ন বেঝা মারি।
সবৈ তীর খালী পরে, চলে কমানী ডারি॥২॥

১২৭

আকাশে বেজে উঠল দামামা, নাকড়াতে পড়ল ঘা। বীরকে আহ্বান করছে রণক্ষেত্র, এখন লড়বার দাও মিলেছে। যে মরণকে জগৎ ভয় করে সেই মরণে আমার আনন্দ। কবে আমি মরব, কবে দেখব আমার পূর্ণ পরমানন্দস্বরূপকে।

১২৭

গগন দমামা বাজিয়া, পড়ত নিসানে ঘার।
খেত পুকারে স্রমা, অব লড়নেকা দাঁর ॥১॥
জা মরণেসে জগ ডরৈ, সো মেরে আনন্দ।
কব মরিহেঁৗ কব দেখিহোঁ পূরন পরমানন্দ ॥২॥

১২৮

আমার প্রিয়ের লালিমা সর্বত্র ব্যাপ্ত। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই সেই লাল। এই লালিমা দেখবার জন্য আমি গেলাম। গিয়ে আমিও লাল হয়ে গেলাম। যাঁকে পাবার জন্য দেশ বিদেশে বহু লোক ঘুরে বেড়ায় (সেই আমার) প্রিয়ের সঙ্গে যখন মিলন হয়ে যায় তখন আমার আঙ্গিনাটাই বিদেশ।

১২৮

লালী মেরে লালকী, জিত দেখোঁ তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ গঈ, মৈঁ ভী হো গই লাল ॥১॥
জিন পারন ভুঁই বহু ফিরে, ঘূমে দেস বিদেস।
পিয়া মিলন জব হোইয়া, আঁগন ভয়া বিদেশ ॥২॥

১২৯

মালিনীকে আসতে দেখে ফুলের কলিরা চেঁচিয়ে উঠল—ফোটা ফুলগুলো তুলে নিয়ে গেছে, কালই আস্ছে আমাদের পালা। ফাগুন মাস আসতে দেখে বনের মনে পৌছাল শূন্য হবার ডাক।

পাতায় ভরা উঁচু ডাল। পাতাগুলি দিন দিন হলদে হয়ে উঠ্ল। ঝরা পাতা বলল ওগো বনরাজি, ওগো তরুবর, শোন, এখন আমাদের যে বিচ্ছেদ হবে তারপর আর মিলন হবে না। কে জানে কোথায় কোন্ দূরে গিয়ে পড়ব।

১২৯

মাঁলন আৱত দেখ করি, কলিয়াঁ করী পুকার।
ফূলে ফূলে চুনি লিয়ে, কাল্হি হমারী বার ॥১॥

ফাগুন আৱত দেখি করি, বন স্থনা মন মাঁহি।
ঊচী ডালী-পাত হৈঁ, দিন দিন পীলে থাঁহি ॥২॥
পাত পঁড়তা যোঁ কহৈ, স্থন তরিবর বনরাই।
অবকৈ বিছুড়ে না মিলৈঁ, কহিঁ দূর পড়েঙ্গে জাই ॥৩॥

১৩০

কবীর বলছে আমি রামের কুকুর। মুতিয়া আমার নাম। আমার গলায় রামের দড়ি। তিনি যেদিকে টানেন সেইদিকে যাই। তু তু করে যদি ডাকেন ত ছুটে কাছে যাই আর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে দূরে পালাই। হরি যেমন রাখেন তেমনি থাকি আর যা দেন তাই খাই।

১৩০

কবীর কূতা রামকা, মুতিয়া মেরা নাঁউ।
গলৈ রামকী জেৱড়ী, জিত খৈঁচৈ তিত জাউঁ।
তো তো করৈ তো বাহুড়ৌ, ছুরি ছুরি করৈ তো জাউঁ।
জ্যুঁ হরি রাখৈ ত্যুঁ রহৌ, জো দেৱৈ সো খাউঁ ॥

সমাপ্ত

পদ-সূচী